সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১৫ শ্রাবণ ১৩৭১ সন

প্রকাশক
[redacted]মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

উৎসর্গ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ সভাপতি
বিবিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ

পূজনীয়েষু

ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বহু গান গেয়েছেন, বহু গান শুনেছেনও। শ্রীশ্রীমার ভাষায় তিনি গানে 'ভাসতেন।'

শোনা যায়, তাঁর গান স্বামীজীর গানকেও ছাপিয়ে যেতো। তা তান-লয়ে কিনা জানি না। তবে তা যে ভাবে, তা সহজেই অনুমান করতে পারি। তাঁর গান ভাব-প্রধান, তাই আরও হৃদয়স্পর্শী।

তিনি যখন বালক, তখন প্রতিবেশীরা বলাবলি করতো, 'গদাইয়ের গান শোনার পর আর কারও গান ভালো লাগে না।'

তা শুধু এইজন্যে যে তিনি যখন যে গান গাইতেন, তা প্রাণ ঢেলে গাইতেন।

কীর্তনে তাঁর আখর লক্ষণীয়। এই আখর, বা যে সব গান তিনি নিজে গাইতেন বা অন্যদের গাইতে বলতেন, তা থেকে তাঁর অনুরাগ কোন্ দিকে তা বোঝা যায়।

শ্রীঠাকুরের অনন্ত ভাব, অনন্ত রূপ। গানের ভেতর দিয়ে তাঁর এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত।

শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় এই বইটি লিখে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা বিশেষ দিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এজন্যে তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

ইতি

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

লেখকের নিবেদন

আমার 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু' বইখানিতে একটি অধ্যায় আছে—'শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে।' নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীঠাকুরের পারস্পরিক সাঙ্গীতিক সংযোগ তার বিষয়বস্তু। সেটি লেখবার সময়েই (১৯৬৩, স্বামীজীর জন্মশতবর্ষে) সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি—নরেন্দ্রনাথের অপেক্ষাও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীত প্রসঙ্গ অধিক এবং তিনিও রীতিমত গায়ক। তখন থেকেই সে বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে থাকি। কাযটি অভিনব এবং কোনো গবেষক সেভাবে তাতে হাত দেন নি, আমার আগ্রহের তাও অন্যতম কারণ। অবশ্য শ্রীঠাকুরের সম্পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত-জীবন অবলম্বনে এমন গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা ছিল না প্রথম দিকে। গত কয়েক বছরে বিষয়টি আমার মনে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

কিন্তু তখন কলমে লেখা আরম্ভ করতে পারি নি, সে কায চলছিল অন্তরে। কারণ, অবকাশের অভাব। বিগত এক যুগেরও বেশিদিন যাবত—বাংলায় রাগ-সঙ্গীত সাধনার আনুপূর্বিক বিবরণ, মধ্যযুগের সর্বভারতীয় সঙ্গীতধারার বিভিন্ন প্রাদেশিক কেন্দ্রে চর্চার ইতিহাস, সেকালের গুণীদের সঙ্গীতকৃতির পরিচয়-কথা সংবলিত কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়নে আমায় ব্যস্ত থাকতে হয়। সেগুলি অনেকাংশে সম্পন্ন করে, মনোনিবেশ করতে পারি বর্তমান রচনায়। ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সামগ্রিক সঙ্গীত-জীবনের চালচিত্রও রূপলাভ করে ব্যাপক পরিকল্পনায়। বছর দুয়েক আগে থেকে এই কর্মে যথাসাধ্য নিবিষ্ট হই, বিকট বাধা বিপত্তির মধ্যেও। সে সব ব্যক্তিগত দুর্ভোগের কথা, আমার লেখক জীবনের নিদারুণ বিরুদ্ধ পরি-বেশ, হীন স্বার্থসর্বস্ব অ-সাংস্কৃতিক বাস্তব অবস্থাদির কথা কহতব্য নয়। শুধু যে-পাঠকরা আমায় ভালবাসেন তাঁদের কানে কানে বলা রইল বিদীর্ণ সেই অন্তর-কথা।

শ্রীঠাকুরের সঙ্গীত সত্তার আশ্চর্য ও ঐশ্বর্যময় বিবরণ যথাসম্ভব সন্নিবিষ্ট করেছি। তাঁর গায়ন-গুণের বহু নিদর্শন গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে উদ্ধৃত। স্বভাবতই সে সমস্ত অধ্যায় প্রসঙ্গ। সেজন্যে তাঁর একটি বিশেষ দিনের কথা উল্লেখ করা হয় নি : আপন বিবাহ বাসরে শ্রীরামকৃষ্ণের গান গাইবার বিবরণ। হ্যাঁ, তিনি নিজের বাসর ঘরে গান শুনিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেছিলেন, যদিও তা শ্যামাসঙ্গীত। রঙ্গপ্রিয়, সদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অনতিপরিচিত প্রসঙ্গটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো, (তাঁর অন্যতম প্রামাণিক আকর গ্রন্থ অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'র 'বিবাহ' অধ্যায় থেকে) :—

বাসরে দেখিয়া প্রভু অনেক রমণী।
শুন কি হইল পরে অনেক কাহিনী॥
নানাবিধ রমণীর নানা রঙ্গ হেরে।
রঙ্গময়ী মার লীলা জাগিল অন্তরে॥

মা মা বলি হৈল প্রভু ভাবাবেশান্বিত।
কোকিল জিনিয়া কণ্ঠে ধরিলেন গীত ॥
যেমন কাঁদনি গানে মোহিত নাগিনী।
সেইমত স্তম্ভীভূত পুরুষ রমণী ॥
পাতে হাত মুখে ভাত খেতে যারা ছিল।
পুতুলের প্রায় গান শুনিতে লাগিল ॥
বাসরে রমণীগণ মোহিত অবাকে।
দেখে বরে নিরখিয়া অনিমিখ চোখে ॥
ছিল মনে কত মত রঙ্গ করিবারে।
দেখে রঙ্গে রঙ্গ করা সব গেল উড়ে ॥
শ্যামাগুণ গানে প্রভু এত মত্ততর।...

(সেই গান শুনে তাঁর শশ্রুমাতা রন্ধনশালা থেকে বাসর ঘরে উপনীতা হলেন)

শুনি মুরলীর গান যেমন গোপিনী।
বাসরে আইল ধেয়ে দিদি ঠাকুরাণী ॥...
ভুলিতে না পারে কিন্তু মুরতি সুন্দর।
পিক পাখী বীণা জিনি শ্রীকণ্ঠের স্বর ॥...

সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণের যত প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছি গায়ক-রূপে, শ্রোতা-রূপে, সমালোচক-রূপে, গুণগ্রাহী-রূপে, তাত্ত্বিক-রূপে, ভাবুক-রূপে—সকলের উৎস-গ্রন্থাদিরও সন্ধান দিয়েছি যথাস্থানে। তেমনি তাঁর ঘনিষ্ঠ পার্ষদদের সাঙ্গীতিক বিবরণও নির্ভরযোগ্য পুস্তকাবলীর সাক্ষ্য অনুসারে বিবৃত।

কেবল নব বিধান সামাজের সুবিখ্যাত গায়ক তথা গীতরচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল বা চিরঞ্জীব শর্মার কথা স্বতন্ত্র। কারণ তাঁর সম্পর্কে কোনো সূত্র দেওয়া হয় নি। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ-ধন্য এই সঙ্গীত-সাধকের সঙ্গীতকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্ভবত এ গ্রন্থেই প্রথম প্রকাশিত হলো, অন্য কোনো পুস্তকের সহায়তা ব্যতীতই। তা সম্ভব হয়েছে, বর্তমান নববিধান সমাজের নেতৃস্থানীয়, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ও সহযোগিতায়। ত্রৈলোক্যনাথ সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত উপকরণই তাঁর সংগৃহীত এবং প্রদত্ত। একনিষ্ঠ কেশব-সাধক চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়কে সেজন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ্রন্থের বিষয়ে আর একটি নিবেদন আছে পাঠক পাঠিকাদের কাছে। দেখা যাবে কোনো কোনো গান একাধিকবার উদ্ধৃত করা হয়েছে। যেমন গানটি শ্রীরামকৃষ্ণ গাইবার কথা হয়ত আছে একস্থানে। আবার তাঁর একাধিক শিষ্য বা পার্ষদের সঙ্গীত প্রসঙ্গেও তা উল্লিখিত। এই পুনরুক্তি অনিবার্য। কারণ পৃথক ব্যক্তিদের গানের বিবরণ বাদ দেওয়া যায় না, তাহলে তাঁদের সঙ্গীতজ্ঞ-পরিচিতি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও গানগুলির প্রসঙ্গ বিবৃত করতে হলো।

বইখানি লেখাকালীন, তন্নিষ্ঠ বিবেকানন্দ নিবেদিতা গবেষক শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু প্রমুখের শুভকামনাও আজ সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

প্রকাশক শ্রীসুনীল মণ্ডল মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই সুরুচিশোভন ভাবে, বহু অসুবিধার মধ্যেও অতিশয় তৎপরতায় গ্রন্থটি প্রকাশের জন্যে। তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তিও এবিষয়ে কার্যকর হয়েছে, লক্ষ্য করেছি।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপাখানার ভূতকে একেবারে বিতাড়িত করা যায় নি, দেখছি। শুদ্ধিপত্র আর তালিকাবদ্ধ করা গেল না সময়াভাবে। কিন্তু একটি মুদ্রণ প্রমাদ সুধী পাঠক-পাঠিকাদের সংশোধন করে নিতে হবে : প্রথম পৃষ্ঠাতেই, ওপরের দিকে, 'বৈরাগী সন্তানরা'-র স্থলে শুদ্ধ পাঠ 'সন্তরা' পঠিতব্য।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজকে পুস্তকটি উৎসর্গ করে কৃতার্থ হয়েছি। শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ তাঁর নিরবকাশ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ভূমিকাটি লিখে দিয়ে গ্রন্থের গৌরব বর্ধন করেছেন। এটি নগণ্য লেখকের প্রতি তাঁর আশীর্বাদও। তাঁদের উভয়ের সঙ্গে পুস্তকের সংযোগ আরেক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। কালের অগ্রগতির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারাও নিত্য বর্ধমান। বর্তমানকালে সেই জাতীয় ঐতিহ্যের দুই মহান প্রবক্তার নামের সঙ্গে গ্রন্থটি যুক্ত হওয়ায় একটি বিচিত্র তৃপ্তিলাভ করছি।

যতদিন এই লেখা ও তার প্রস্তুতির কার্য চলেছে, আমি যেন শ্রীঠাকুরের কৃপাসঙ্গ অনুভব করেছি, তাঁর বাণী ও সঙ্গীত আমার কানে প্রাণে নিরন্তর ধ্বনিত হয়েছে। আমি অকিঞ্চন। কিন্তু সেই আমার পরম প্রাপ্তি।

ইতি

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

১.	শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁদের গান শুনিয়েছেন	...	১
২.	কত প্রসঙ্গে তিনি গান গেয়েছেন	...	৩০
৩.	কি ধরনের গান তিনি গাইতেন	...	৬৩
৪.	কত গান তিনি গেয়েছিলেন	...	৮৯
৫.	তাঁর গান 'শিক্ষা'র কথা, তথা শিল্পী সত্তা	...	৯৯
৬.	শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রোতারূপে	...	১২৩
৭.	সঙ্গীতে পার্ষদবৃন্দ	...	১৬৬
৮.	শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ গান	...	২৫১
৯.	শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক গীত গানের তালিকা	...	২৫৭
১০.	সঙ্গীতের ভাবুক শ্রীরামকৃষ্ণ	...	২৬৫
১১.	পরিশিষ্ট	....	২৭১

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁদের গান শুনিয়েছেন

সেদিন মাইকেল মধুসূদন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। তবে পরমহংসকে দেখবার জন্যে নয়। তাঁর কথা মাইকেল কিংবা কলকাতার মান্য-গণ্য শিক্ষিত বহু ব্যক্তিই জানতেন না তখনো। তা হলো ১৮৬৯।৭০ অব্দের কথা।

শুধু মধুসূদন কেন, কলকাতার জন-সমাজে বিশেষ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শোনে নি। কেশবচন্দ্র সেন তখনো দেখেন নি তাঁকে। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কিংবা 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকাও এই আশ্চর্য সাধুর কথা প্রচার করে নি। শুধু যে বৈরাগী সন্তানরা আসতেন দক্ষিণেশ্বরে তাঁরাই পরিচয় পেয়েছেন রামকৃষ্ণের। আর বর্ধমান মহারাজার সভাপণ্ডিত পদ্ম-লোচনের তুল্য কোনো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা রাণী রাসমণি বা মথুরবাবুর পারিবারিক সূত্রে জানা কোনো কোনো লোক।

মাইকেল দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন ব্যারিস্টার হিসেবে। কালীবাড়ি চত্বরের উত্তরদিকে ইংরেজদের বারুদের গুদোম। সেই সরকারী বারুদখানা নিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষের মামলা বাধবে। তারই ভার পেয়েছেন মাইকেল। তাঁর বয়স তখন ৪৫/৪৬ বছর হতে পারে। মৃত্যুর বছর তিনেক আগেকার কথা। আর রামকৃষ্ণ হয়তো ৩৩।৩৪ বছর বয়সী। রাণী রাসমণির দৌহিত্র দ্বারিকানাথ মাইকেলকে এনেছেন। ব্যারিস্টার সরেজমিনে জেনে নিচ্ছেন মোকদ্দমার বিষয়। রাসমণির মৃত্যু হয়েছে প্রায় আট বছর আগে। দফতরখানার পাশে বড় ঘর। সেইখানে মাইকেল রয়েছেন তখন। মামলার পরামর্শ শেষ হয়েছে।

এমন সময় রামকৃষ্ণের নাম করলেন কে যেন। বোধহয় দ্বারিকানাথ, কথাপ্রসঙ্গেই। শুনে মাইকেল দ্বারিকানাথকে বললেন, 'তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

তখন রামকৃষ্ণকে খবর দেয়া হলো। তিনি প্রথমে নারায়ণ স্বামীকে পাঠালেন মাইকেলের সঙ্গে কথা বলতে। তারপর নিজেও এলেন।

নারায়ণ শাস্ত্রীকে পাঠাবার কারণ হয়তো তিনি মহাপণ্ডিত। কাশীতে পঁচিশ বছর ন্যায়শাস্ত্র চর্চা করেছেন। তারপর নবদ্বীপে সাত বছর। নামী কবি, ব্যারিস্টারের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন ভালোভাবে।

শাস্ত্রীজী প্রথমে আরম্ভ করেছিলেন সংস্কৃতে। কিন্তু মধুসূদনের দিকে সুবিধা হচ্ছিল না দেখে 'ভায়া'য় অর্থাৎ বাংলায় বলতে লাগলেন।

মাইকেলের সঙ্গে নারায়ণ স্বামী আলাপ করতে লাগলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি নিজের ধর্ম ছাড়লেন কেন?'

'পেটের দায়ে', মধুসূদন নিজের শরীরের দিকে দেখিয়ে উত্তর দিলেন।

শুনেই সরল-হৃদয় পণ্ডিত জ্বলে উঠলেন, 'কি! এই দুদিনের সংসারে পেটের জন্যে নিজের ধর্ম ছাড়া? এ কি হীন বুদ্ধি? যে পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে আবার কথা কইব কি?'

ক্রুদ্ধ নারায়ণ স্বামী আরো অনেক কিছু বলে গেলেন—এমন লোককে আবার বিদ্বান বলে? ইত্যাদি…

আর বাক্যালাপ না করে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তবে কথাটি মাইকেল বোধহয় হালকা ভাবেই বলেছিলেন। কিংবা ব্যারিস্টারোচিত আত্মপক্ষ সমর্থনে। অর্থকরী জীবনের অসাফল্যও বিগত কালের ঘটনায় আরোপ করতে পারেন অযথা। কারণ এই যুক্তি তথা উক্তিটি সঠিকও নয় তো। তিনি কি ভুলে গিয়েছিলেন, সাতাশ আটাশ বছর আগেকার সেই খৃষ্টান হওয়ার ঘটনা? মাত্র আঠার বছর তখন বয়স তাঁর। হিন্দু কলেজের (আসলে স্কুল) ছাত্র। মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র, ধনীর দুলাল। অবাধ প্রাচুর্যের ভোগাধিকারী। সেই বয়সে যে খৃষ্ট-ধর্ম নিলেন, অন্নচিন্তার প্রশ্ন তখন কোথায়? ধর্ম জিজ্ঞাসারও কোনো বালাই ছিল না। ছিল আপাত-চিকন পাশ্চাত্য সভ্যতার পীঠস্থান ইংলণ্ডে যাবার স্বপ্ন। আর ইংরেজীতে বড় কবি হবার, ইঙ্গ সমাজে মেলামেশার সাধ।

সেই তরুণ বয়সে কোনো ভোগ বিলাস বাসনা সংযত করবার শিক্ষা তো পান নি— 'দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।' হাইকোর্টের তৎকালীন রূপ সদর দিওয়ানী ও সদর নিজামৎ আদালতের (অবস্থান রেসকোর্সের দক্ষিণে, এখনকার মিলিটারি হস্‌পিটাল চত্বরে) বহু-বিখ্যাত ব্যবহারজীবী রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রকে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়-সুলভ তরল জীবনযাপনের সুযোগ দিয়েছিলেন। বিরুদ্ধধর্মী, বিদেশী শিক্ষা-ক্রমে গঠিত মধুসূদন আপন ধর্মসংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন তার কোনো পরিচয় লাভ না করেই। নব্যদের চোখে তখন নতুন ফ্যাশনের তুল্য চিত্তাকর্ষক খৃষ্টধর্ম। আর কাল-জর্জর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্বর হিন্দুধর্ম। তা ছাড়া, প্রবল প্রতাপ পৃথ্বীপতি বৃটিশ রাজাদের ধর্ম খৃষ্টান ধর্ম। আধুনিক জীবনে উন্নতির সোপান স্বরূপ। সুসভ্য ইউরোপীয় সমাজে প্রবেশের চাবিকাঠি। হিতাহিত বোধ আর পরিণাম দৃষ্টি বর্জিত তরুণ ঝাঁপ দিলেন পেশাদার মিশনারী চালিত হয়ে। অপরিণত চিত্তে অনেক আশার আলো ঝলকানি দিয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে, বিলাত যাত্রা কিংবা অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হল না মাইকেলের খৃষ্টধর্ম শিরোধার্য করে।…

এত কথা এতকাল পরে কি তাঁর মনে পড়েছিল? আর মনে হলেও, এক অপরিচিত ব্যক্তির কাছে দক্ষিণেশ্বরের এই পরিবেশে জানাবার কি প্রয়োজন!

কিন্তু এই উগ্র পণ্ডিত যে ধর্ম নিয়ে এমন আঘাত করলেন? তার কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটল কি মাইকেলের মনে, বিপর্যস্ত জীবনে? হতাশ্বাসে মৃত্যুর সে তো মাত্র তিন চার বছর আগেকার কথা। হাঁ, এমন প্রতিভাধর কবি মনীষীর পক্ষে সে জীবনচর্যা বিধ্বস্ত, অপ্রকৃতিস্থ বৈকি! কি বিপুল সফল সুস্থ স্বাভাবিক সম্ভাবনার পরিবর্তে কি পাণ্ডুর পরিণতি। 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি, পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ'...ইত্যাকার অনুশোচনা তাব কত আগেই তো তাঁকে করতে হয় মাতৃভাষা সম্পর্কে। তেমনি স্বধর্ম-প্রসঙ্গে এই আকস্মিক ঘায়ে তাঁর সংক্ষুব্ধ চিত্তে কোনো আত্মিক আলোড়ন কিংবা আকুলতা জাগল কি?

কারণ, বিবরণীকার জানিয়েছেন, 'অতঃপর মাইকেল ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে কিছু ধর্মোপদেশ শুনিবার বাসনা প্রকাশ করেন।'

কিমাশ্চর্যম্! যিনি সুদীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর খৃষ্টান জীবন যাপন করেও একটি দিনের জন্যে 'ধর্মকথা' শুনতে যান নি বা চান নি কোনো গীর্জায়—তিনি ধর্ম বিষয়ে এক তথাকথিত 'অশিক্ষিত' ব্যক্তিব কাছে উপদেশ শুনতে চাইলেন।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ নিযে নিয়ত বাঙ্ময় থাকেন—এখন অনুরুদ্ধ হয়েও মৌন রইলেন, যা তাঁর পক্ষে অ-স্বাভাবিক।

তারপর বললেন, 'কে জানে কেন, আমার কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না। আমাব মুখ যেন কে চেপে ধরেছে।'

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সে ভাব চলে গেল।

তিনি অধিষ্ঠান করতে লাগলেন আপনজ্ঞানের স্বাভাবিক সত্তায়। পূর্ণজ্ঞানী মুক্তকণ্ঠ হলেন। তবে তাঁর বাণী উৎসারিত হতে লাগল সঙ্গীতে। 'মধুর স্বরে' তিনি গান ধরলেন। পর পর গেয়ে শোনালেন সাধক কমলাকান্ত আর রামপ্রসাদের ক'খানি পদাবলী। '...গাহিয়া মধুসূদনের মন মোহিত করিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যপদেশে তাঁহাকে ভগবদ্‌ভক্তিই যে সংসারে একমাত্র সার পদার্থ, তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন।' (স্বামী সারদানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, উত্তরার্ধ, পৃঃ ৯৩-৯৫)। মাইকেলের 'মন মোহিত' হওয়া ভিন্ন অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া তাঁর অন্তবে হয়েছিল কিনা, জানা যায় নি সে সংবাদ। অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে, শ্রীমধুসূদন জীবনের এমন গুরুত্ব-পূর্ণ প্রসঙ্গে কোনো উল্লেখ নেই তাঁর দুই নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থে—নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' ও যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত'। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্ কোন্ গান মাইকেলকে শুনিয়েছিলেন তাও জানা গেল না, দুর্ভাগ্য-

বশত।...

তার প্রায় ছ বছর পরের কথা :

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তখন সদলে বেলঘরিয়ায় রয়েছেন। আপন সম্প্রদায় নিয়ে সাধন ভজন করছেন অনুগামী জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে। ১৮৭৫ সালের মার্চ মাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ খবর পেয়ে সেখানে এলেন। আলাপ পরিচয় করতে চান কেশবচন্দ্রের সঙ্গে। তাঁর বিষয়ে তিনি অনেক শুনেছেন। তাঁর ঈশ্বর-ভক্তি আর বক্তৃতা-শক্তির কথা। ব্রহ্ম সঙ্কীর্তনে তাঁর মত্ত হওয়াব কথা। তাই দেখা করতে গিয়েছিলেন রাজা-বাজারে, কেশবের 'কমল কুটিরে।' কিন্তু সেখানে তখন কেশবচন্দ্র ছিলেন না। বেলঘরিয়া গেছেন শুনে, এখানে এলেন রামকৃষ্ণ।

অবশ্য আরেকবারও তিনি কেশবকে দেখেছিলেন। বেলঘরিয়ায় অন্তত এগার বছর আগে, ১৮৬৪ সালে। কলকাতায় আদি ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরের বেদীতে ছাব্বিশ বছরের যুবক কেশবচন্দ্র সেদিন উপাসনা করছিলেন। সমবেত ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে একমাত্র তাঁর দিকে লক্ষ্য করেই মুখর হন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'কেবল এরই দেখছি ফাৎনা নড়েছে।'...

এত বছর পরে, সেই একটি দিনের কথা তাঁর মনে ছিল কিনা কে জানে!

যাই হোক, এখন বেলঘরিয়া বাগানে কেশবচন্দ্র সেনের সামনে এসেই বললেন, 'বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন কর। ঐ ঈশ্বর দর্শন কেমন জানতে ইচ্ছে। তাই তোমাদের কাছে এসেছি।'

এইভাবে আলাপের সূচনা করলেন। আর দু চার কথার মধ্যেই আরম্ভ করে দিলেন গান, তন্ময় হয়ে—

কে জানে কালী কেমন,
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর কর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না ধরতে শশী হয়ে বামন॥

রামপ্রসাদী সঙ্গীত গাইতে গাইতেই সমাধিস্থ হলেন তিনি। অবশেষে ভাবভঙ্গের পর

ঈশ্বরীয় বিষয়ে বলতে লাগলেন। গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শোনালেন অতি সহজ কথায়। তেমনি সরল, কিন্তু অসামান্য উপমা যোগে। শুনে সকলে চমৎকৃত হলেন। তখন থেকেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আত্মিক ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। তারপর দীর্ঘ ন বছর, কেশবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।...

কেশব সম্প্রদায়ের মুখপত্র তাঁদের সেই সাক্ষাতকারের বিবরণ প্রকাশ করে এইভাবে, —'তখন ওই সমাধির ভাব দেখিয়া কেহই উচ্চভাব বসিয়া মনে করেন নাই', কিন্তু 'কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংস কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া গভীর কথা সকল বলিতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রচারকগণ স্তম্ভিত হইলেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে রামকৃষ্ণ একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন।'...পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য মহাশয় মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন হইতে উভয়ের আত্মায় আত্মায় গূঢ় যোগ হয়।......' (ধর্মতত্ত্ব, ১৮৮৬ সেপ্টেম্বর ১৬)।

বিদ্যাসাগরের নানা সদ্গুণের কথা কত শুনেছেন রামকৃষ্ণ। তাই সেদিন তাঁকে দেখতে এসেছেন। তাঁর বাদুড়বাগানের বাড়িতে, যে পথের বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর স্ট্রীট। ১৮৮২ সালের ৫ই অগস্ট বিকালে। বিদ্যাসাগর তখন ৬২।৬৩ বছরের প্রবীণ। রামকৃষ্ণের বয়স হবে ৪৬। কেশবচন্দ্রের সামনে গান গাইবার সাত বছর পরের কথা।

বিদ্যাসাগর যত বড় বিদ্বান, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত বাকপটু, সুরসিক। 'অশিক্ষিত' রামকৃষ্ণেরও বাগিন্দ্রিয় কতখানি সক্ষম ও রসসঞ্চারী, 'কথামৃত'র ছত্রে ছত্রে আছে তার নিদর্শন। কোনো সুশিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে বার্তা-বিনিময়ে অপ্রতিভ হন না তিনি। সুতরাং দুজনের প্রথম সাক্ষাতেই কিছু ঝলকিত কথোপকথন হয়ে গেল। আর তা পরম উপভোগ্য হলো ঘরে উপস্থিত শ্রোতাদের।

'এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।'

'তাহলে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।'

'না গো। নোনা জল কেন? তুমি ত অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর।'

.. ইত্যাদি।

তবে পরমহংসের বাচন বুদ্ধির চর্চা মাত্র নয়। তাঁর সব প্রসঙ্গ মিলিত হয় ঈশ্বরীয় সঙ্গমে। আর মহাপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ও ঈশ্বরেই অনীহ।

তবু রামকৃষ্ণের কণ্ঠে বাগ্‌দেবী ভর করলেন। যে কোনো ব্যক্তির সামনে আপন বক্তব্য যেমন সুস্পষ্ট আর যুক্তিপূর্ণ ভাবে তিনি জানাতে পারতেন, এখানেও দেখা গেল তেমনি। বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয়ে তাঁর অন্তরের রশ্মি বাণী-নির্ঝরে বিকীর্ণ

হলো। সেই প্রসঙ্গেই ধ্বনিত হলো ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। তার আশ্চর্য সহজ ব্যাখ্যা করলেন প্রাকৃত ভাষায়, 'বেদ পুরাণ তন্ত্র ষড়দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে। কিন্তু ব্রহ্ম যে কি তা কেউ মুখে বোঝাতে পারেনি।'

বিদ্যাসাগর বন্ধুদের দিকে ফিরে বললেন, 'বা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।'

উপমার রাজা রামকৃষ্ণ অমনি সেই শিষ্য দুভাইয়ের গল্পটি শোনালেন। গুরুর কাছে ক বছর বিদ্যালাভের পর ঘরে এসেছে দুজনে। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্রহ্ম কি?' বড় ছেলে বিস্তর ব্যাখ্যা আর বিশেষণে বোঝাতে লাগল। আর ছোট মৌন রইল প্রশ্নের উত্তরে। বাবা বললেন তাকে, 'তুমিই বুঝেছ।'

সেই সূত্রেই রামকৃষ্ণ 'সহাস্যে' বললেন, 'তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জানা যায় না।'

বলে, 'প্রেমোমত্ত' হয়ে গান ধরলেন—

'কে জানে কালী কেমন? ষড়দর্শনে না পায় দরশন...'

গানখানি গেয়ে, বললেন, 'বিশ্বাসের কি শক্তি।'

এবার হনুমানের বিশ্বাসের জোরে সমুদ্র পার হওয়ার সেই গল্পও শুনিয়ে দিলেন। আর বেশি কথা নয়, আরম্ভ হয়ে গেল সঙ্গীত।

এখন বিশ্বাসের মহিমা গান করতে লাগলেন ভক্তিভাবে মত্ত হয়ে—

আমি 'দুর্গা দুর্গা' বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে
জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশী নারী।
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক ব্রহ্মপদ নিতে পারি।'

সঙ্গীতের ধারায় ব্যাখ্যা এগিয়ে যায়। সুর ও কাব্যে মূর্ত হয়ে ওঠে বাণী। শ্রোতাদের মর্মে অনুরণন জাগায়।

নিরন্তর নাম-মাহাত্ম্য কীর্তন করে সর্ব পাপ থেকে মুক্তি লাভ। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত শরণাগতি থেকে মোক্ষপ্রাপ্তি। এমনি ভাবের গানখানি গাইবার পর তিনি আবার একটি সূত্র দেন, 'তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়।'

বলতে বলতেই আরেকটি গান আরম্ভ করলেন—

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে॥
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি সারে।

ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠরি ভোর হলে সে লুকাবে রে ॥
ষড়দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥
সে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে সে যুগান্তরে।
হলো ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে ॥'

গাইতে গাইতেই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। 'হাত অঞ্জলিবদ্ধ। দেহ উন্নত ও স্থির। নয়নদ্বয় স্পন্দনহীন।'...'সকলে উদ্‌গ্রীব' হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 'এই অদ্ভুৎ অবস্থা' দেখছেন। 'পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ' হয়ে 'একদৃষ্টে' চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। খানিক পরে তিনি 'প্রকৃতিস্থ' হলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার 'সহাস্যে' বললেন, 'ভাব ভক্তি, এর মানে—ভালোবাসা। যিনি ব্রহ্ম তাঁকেই 'মা' বলে ডাকছে।

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে ভাঙ্‌ব হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে ॥

মা বড় ভালোবাসার জিনিস কিনা। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি, ভালোবাসা আর বিশ্বাস। আর একটা গান শোন—

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
(ও সে) যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয় ॥
যে জন কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।
কালিপদ সুধা হ্রদে চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)
তবে পূজা হোম যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয় ॥'

গানের পরে বিদ্যাসাগরকে বললেন আরেকটি কথা—যা হয়ত শ্রোতার মনঃপূত হলো না—'তুমি যে সব কর্ম করছো, এসব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করতে পারো, তাহলে খুব ভালো। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালোবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।...তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি।' (সকলে নিঃশব্দ)।'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৫-১৬)।

এই চারখানি গান তিনি সেদিন বিদ্যাসাগরকে শোনালেন। যেমন মুখের বাণীতে তেমনি সঙ্গীতে প্রকাশ করলেন আপনার জ্বলন্ত ধর্মাদর্শ।...

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সেই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। সেদিনেই তিনি

ঠাকুরকে বলেছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে একদিন যাবেন। কিন্তু সে যাওয়া আর ঘটে নি কোনোদিন। শ্রীরামকৃষ্ণের একথা মনে ছিল এবং এ বিষয়ে তিনি মন্তব্যও করেছিলেন ভক্তদের সামনে।

তারপর আরো প্রায় আড়াই বছর পরের কথা। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রসঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে অধরলাল সেনের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপ হলো। শোভা-বাজারে, ১৮৮৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধরলাল ঠাকুরের অতি নিষ্ঠাবান গৃহীভক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র অধরলালের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও বন্ধু। তাঁর সঙ্গে আরো কজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে অধর সেনের গৃহে এসেছেন। রামকৃষ্ণের চেয়ে দু বছর বয়োকনিষ্ঠ বঙ্কিম।

তাঁর দিকে দেখিয়ে অধরলাল রামকৃষ্ণকে বললেন, 'মহাশয়, ইনি ভারি পণ্ডিত, অনেক বইটই লিখেছেন। আপনাকে দেখতে এসেছেন। এঁর নাম বঙ্কিমবাবু।'

অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো।'

বঙ্কিম হেসে উত্তর দিলেন, 'আর মশায় সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।'

এই রসিকতাকে রামকৃষ্ণ উচ্চ পর্যায়ে তুলে দিলেন এক কথায়। দিব্য ভাবের দ্যোতনায় পার্থিব প্রসঙ্গটিকে রাধাকৃষ্ণ যুগল রূপের তত্ত্বে উন্নীত করলেন। বলতে লাগলেন, 'না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন।··· কালো কেন জানো?···যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে, ততক্ষণ কালো দেখায়; যেমন সমুদ্রের জল। দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়। সমুদ্রের জলের কাছে গেলে ও হাতে করে তুললে আর কালো থাকে না, তখন খুব পরিষ্কার, শাদা।···ঈশ্বরের স্বরূপ ঠিক জানতে পারলে আর কালো থাকে না।'

তারপর আরো প্রসঙ্গ করলেন। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ না পেলে প্রচার সফল হয় না। ঈশ্বর দর্শন হলেই জ্ঞান আর মুক্তি। শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে, যদি কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে? কামিনী কাঞ্চনই সংসার—এরই নাম মায়া। সংসারী লোক শুদ্ধ ভক্ত হলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে। কর্মের ফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করে। আগে ঈশ্বর পরে সৃষ্টি। তাঁকে লাভ করলে, দরকার হয়ত সবই জানতে পারবে।' ইত্যাদি কথার পর বললেন, 'তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। ডুব দিতে হবে, তা না হলে রত্ন পাওয়া যাবে না। একটা গান শোন—

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্ন ধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।

দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্‌জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

'তাঁর সেই দেবদুর্লভ মধুর কণ্ঠে এই গানটি গাইলেন। সভাশুদ্ধ লোক আকৃষ্ট' হয়ে 'একমনে এই গান' শুনতে লাগলেন।

গানের পরে আবার আরম্ভ হলো তাঁর কথা। তিনি বঙ্কিমকে বললেন, 'কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। তারা বলে, ঈশ্বর ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব? যারা ঈশ্বর প্রেমে মত্ত, তাদের তারা বলে, বেহেড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এইসব লোক এটি বোঝে না যে, সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর।'...

বিদায় নেবার সময় অন্যমনস্ক দেখায় বঙ্কিমচন্দ্রকে। তিনি চাদরটি ফেলে যাচ্ছিলেন।

(কথামৃত, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৯৬-২০৮)।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তখন শ্রীরামকৃষ্ণের খুবই অন্তরঙ্গতা, মাঝে মাঝেই দেখা-সাক্ষাৎ করেন পরস্পরে। রামকৃষ্ণ কলকাতায় আসেন কেশবের কমল কুটিরে, তাঁদের ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবাদিতে। কেশবচন্দ্রও দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। কখনো রামকৃষ্ণকে নিয়ে যান জলভ্রমণে, স্টীমারে। বহুক্ষণ আনন্দ সম্মেলনে অতিবাহিত হয়ে যায়। ভগবৎ প্রসঙ্গে, ভক্তিগীতিতে।

এমনি একদিন কেশবচন্দ্র জাহাজে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন ১৮৮২-র ২৭ অক্টোবর। সঙ্গে একদল ব্রাহ্ম ভক্ত। এখান থেকে সহযাত্রী করে নিলেন রামকৃষ্ণকে। তাঁর সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও এলেন। তিনি তখন কেশবের সমাজ ত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত। কিন্তু তাঁদের সহাবস্থান দেখা যেত রামকৃষ্ণ সন্নিধানে। সেদিন জাহাজেও তেমনি।

ক্যাবিনে কেশব আর সকলে তাঁকে ঘিরে বসলেন। ঈশ্বর কথায় সূচনা করলেন রামকৃষ্ণ, 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।'

তারপর বললেন, 'জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা * বলে, আর ভক্তরা তাঁকেই ভগবান বলে। একই বস্তু। নাম ভেদ মাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান।'...'তিনি নানাভাবে লীলা করছেন।'

সহাস্যমুখ। অনর্গল বলে চলেছেন, কথায় কথায় চিত্তাকর্ষী ব্যাখ্যা করে।

'কালী কি কালো? দূরে তাই কালো। জানতে পারলে কালো নয়...'

বলতে বলতে তন্ময় হয়ে গান ধরলেন—

শ্যামা মা কি আমার কালো রে।

---

* 'কথামৃত' গ্রন্থে এটি সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ। প্রকৃত কথা হবে—'পরমাত্মা'। 'আত্মা' নয়।

কালো রূপ দিগম্বরী হৃদ্‌পদ্ম করে আলো রে ॥

লোকে বলে কালী কালো আমার মন ত বলে না কালোরে।

কখনো শ্বেত কখনো পীত কখনো নীল লোহিত রে।

আমি আগে নাহি জানি কেমন জননী,

ভাবিয়ে জনম তোল রে ॥

কখনো পুরুষ কখনো প্রকৃতি কখনো শূন্য রূপ রে।

মায়ের এ ভাব ভাবিয়ে কমলাকান্ত সহজে পাগল হল রে ॥

গানখানি শেষ করে কেশবকে বললেন, 'বন্ধন আর মুক্তি ; দুয়ের কর্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনি 'ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী।'

এই বলে, 'গন্ধর্ব-নিন্দিত' কণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাইলেন—

শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)।

(ঐ যে) আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥

কাক গণ্ডি মণ্ডি গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ি।

ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥

বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।

ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত চাপড়ি ॥

প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে দড়ি যাবে উড়ি।

ভব সংসার সমুদ্র পারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি ॥

তারপর একটু ব্যাখ্যা করলেন, 'তিনি লীলাময়ী। এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।...তাই 'লক্ষের মধ্যে দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।'

চলন্ত জাহাজে বসে সকলে সানন্দে শুনছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বললেন, 'তিনি আঁখি ঠেরে ইসারা করে বলে দিয়েছেন, 'যা এখন সংসার করগে যা। মনের কি দোস ? তিনি যদি আবার দয়া করে মনকে ফিরিয়ে নেন, তাহলে বিষয়-বুদ্ধির হাত থেকে মুক্তি হয়। তখন আবার তাঁর পাদপদ্মে মন হয়।'

এবার এইভাব নিয়ে গান ধরলেন, সংসারী যেমন মাদের কাছে অভিমান জানায়—

আমি ঐ খেলে খেদ করি।

তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি ॥

মনে করি তোমার নাম করি কিন্তু সময়ে পাসরি।

আমি বুঝেছি জেনেছি আশয় পেয়েছি এসব তোমারি চাতুরী ॥
কিছু দিলে না পেলে না নিলে না খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি ॥
যশ অপযশ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়েছ মনেরে আঁখি ঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি ॥

গানের পরে বললেন, 'তাঁরই মায়াতে ভুলে মানুষ সংসারী হয়েছে। প্রসাদ বলে মন দিয়েছে মনেরে আঁখি ঠারি।'

একজন ব্রাহ্ম ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না ?'

রামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'না গো। তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন ? তোমরা রসে বশে বেশ আছ। সারে মাতে।' (শুনে সকলে হাসলেন)···নক্স খেলা জান ? আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছ, কেউ পাঁচে আছ। বেশি কাটাওনি ; তাই আমার মত জ্বলে যাওনি। খেলা চলছে—এ তো বেশ।'

সকলে হাসতে লাগলেন।

রামকৃষ্ণ আবার বললেন, 'সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছ, এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম কর আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম শেষ হলে ঈশ্বরকে দুই হাতে ধরবে।'

ব্রাহ্ম ভক্তদের আরো বলতে লাগলেন, 'মন নিয়েই সব। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—'কি, আমি তাঁর নাম করিছি, আমার এখনও পাপ থাকবে ? আমার আবার পাপ কি। আমার আবার বন্ধন কি ?'

বলে, আবার সেই নাম-মাহাত্ম্য গেয়ে শোনালেন—

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী ॥···

'আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম।

ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম ; বলেছিলাম, 'মা', এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও ; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও···

একটি রামপ্রসাদের গান শোন—',

বলে, গাইতে লাগলেন—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে রে (মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পীরিত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্তে টেনে লয় ধৈর্য খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্যার দুটি সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হবি॥

গানের পরে আবার বললেন, 'সংসারে ঈশ্বরলাভ হবে না কেন? জনক রাজার হয়েছিল। এ সংসার 'ধোঁকার টাটি' প্রসাদ বলেছিল। তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি লাভ করলে—

এই সংসারই মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহা তেজা তার বা কিসের কিসের ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।'

শুনে সবাই হাসতে লাগলেন।

'কিন্তু', রামকৃষ্ণ সবিস্তারে বললেন, 'ফস্ করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক একবার নির্জনে বাস করতে হয়।...নির্জনে থেকে মাঝে ভগবানের জন্যে সাধন করতে হয়।..বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার সমুদ্রে কাম ক্রোধাদি কুমীর আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্য বস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য; দু দিনের জন্য।-এইটি বোধ। আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর ওপর টান—ভালোবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের ওপর যে রকম টান ছিল। একটা গান শোন—'

বলে, ঈশ্বরে অনুরাগের গান গাইলেন—

বাঁশি বাজিল ওই বিপিনে।
(আমার ত না গেলে নয়) (শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)
তোরা যাবি কি না যাবি বল্ গো ॥
তোদের কথা শ্যামের কথা।
আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা (সই) ॥
তোদের বাজে বাঁশি কানের কাছে।
বাঁশি আমার বাজে হৃদয় মাঝে ॥
শ্যামের বাঁশি বাজে বেরাও রাই।
তোমা বিনা কুঞ্জের শোভা নাই ॥

ভাবাবেগে তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠল। কেশব প্রমুখকে তিনি বললেন, 'রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও ; ভগবানের জন্যে কিসে এমন ব্যাকুলতা হয়, তারই চেষ্টা কর। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।'

এমনিভাবে সেদিন ছ খানি গান কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহযাত্রী অনুগামীদের শোনালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। গঙ্গাভ্রমণ কালে, জাহাজের ক্যাবিনে বসে।

তাঁদের স্টীমার এতক্ষণে কলকাতায় ফিরল, কয়লাঘাটে।…(কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৪৩-৪৮)।…

তখন গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটক অভিনয় হচ্ছে স্টার থিয়েটারে। সে বীডন স্ট্রীটের পুরনো স্টার। যে রঙ্গমঞ্চ স্টার নাম থেকে এমারেল্ড্, ক্লাসিক, মনমোহন, মিত্র থিয়েটার ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হতে হতে অবশেষে সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউর উত্তরমুখী অভিযানে বিলীন হয়ে যায়।

সেই পুরনো স্টার থিয়েটারে রামকৃষ্ণকে অভিনয় দেখতে নিমন্ত্রণ করেছেন গিরিশচন্দ্র। কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে তিনি সেদিন (১৮৮৪, ডিসেম্বর ১৪) 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' ভক্তি নাটিকাটি দেখলেন।

অভিনয়ের পর ঠাকুর এসে বসলেন ম্যানেজার গিরিশচন্দ্রের ঘরে। সঙ্গে নাট্যকার প্রমুখ অনেকেই আছেন।

গিরিশ জিজ্ঞেস করলেন, 'মহাশয়, কিরকম দেখলেন ?'

'দেখলাম সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন।'

কথায় কথায় নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হতে লাগল।

একসময় আবেদন করলেন গিরিশচন্দ্র, 'একটি সাধ, অহেতুকী ভক্তি।'

রামকৃষ্ণ বললেন, অহেতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটিতে হয়। জীবকোটির হয় না।'

বলে, আপনভাবে গান ধরলেন। 'দৃষ্টি ঊর্ধ্বদিকে—'

শ্যামাধন কি সবাই পায় (কালীধন কি সবাই পায়)
অবোধ মন বোঝেনা এ কি দায়।
শিবেরি অসাধ্য সাধন মন জড়ানো রাঙা পায় ॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায় ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়।
নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায় ॥

গান শেষ হতে, গিরিশচন্দ্র সমাপ্তি পঙ্‌ক্তিটি পুনরাবৃত্তি করলেন, নিজের ভাব যুক্ত করে—নির্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়।

তারপর—তীব্র বৈরাগ্য, কলিতে নারদীয় ভক্তি, জ্ঞান যোগ, প্রহ্লাদের স্বরূপ ও ভক্তিভাব, হনুমানের ভাব ইত্যাদি প্রসঙ্গ করে রামকৃষ্ণ বললেন, 'উপর উপর ভাসলে হবে না, ডুব দিতে হবে।'

বলে, তাঁর সেই প্রিয় গানখানি গাইলেন—

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন…

বিবেক বৈরাগ্যের কথার পরে গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'এ পাপীর কি হবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন সঙ্গীতে, গীতকার দাশরথী রায়ের সেই নিদান কালের বাণীতে—

'ঠাকুর ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া করুণস্বরে গান ধরিলেন—

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে।
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি ॥
ভাবিলে ভব ভাবনা যায় রে—
তরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।
এলি কি তত্ত্বে, এ মর্তে কুচিত্ত কুবৃত্ত করিলে কি হবে রে—
উচিত ত নয়, দাশরথীরে ডুবাবি রে—
কর এ চিত্ত প্রাচিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে ॥

বিশেষ করে গিরিশের দিকে চেয়ে শোনালেন—

তরে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।

তারপর মহামায়া, বীর ভাব, ভগবানকে আমমোক্তারী দেয়া, তরুণ ভক্তদের কথা ইত্যাদি বলবার পর 'আনন্দময়ী!' 'আনন্দময়ী!' উচ্চারণ করে সমাধিস্থ হলেন।

অনেকক্ষণ সমাধির পর 'বাবুরাম ও অন্যান্য ভক্তদের দিকে চাহিয়া প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া…গান ধরিলেন—

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি ॥
ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥
সোহাগ গন্ধক দিয়ে খাসা রং চড়ায়েছি।
মণি মন্দির মেজে ল'ব অক্ষ দুটি করে কুঁচ ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি।
(আমি) কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি ॥'

এ গান শেষ হতেই আবার একটি গান আরম্ভ করলেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায় ॥
কালী নামের কত গুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায় ॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মচারীর রাঙ্গা পায় ॥

'গিরিশের শান্ত ভাব' দেখে তিনি প্রসন্ন হয়েছেন। বলছেন, 'তোমার এই অবস্থাই ভাল, সহজ অবস্থাই উত্তম অবস্থা।'…

'এইবার ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। গিরিশাদি ভক্তেরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিলেন।

গাড়িতে উঠিতে উঠিতেই ঠাকুর গভীর সমাধি মধ্যে মগ্ন হইলেন!

গাড়ির ভিতরে নারাণাদি ভক্তেরা উঠিলেন। গাড়ি দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাইতেছে।'

(কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১০৯-১১৪)।

সেদিন তিনি পাঁচটি গান এইভাবে শুনিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র প্রমুখকে।

কিন্তু আরেকদিন তিনি গেয়েছিলেন দশখানি গান-এটিই তাঁর সর্বাধিক গান গাইবার দৃষ্টান্ত একটি দিনে।

সেদিনের গীতস্থল—দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরে তাঁর কক্ষটি। আর উপলক্ষ হন—শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৩৫-১৯২৮)। তারিখ ১৮৮৪, জুন ৩০। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মণিমোহন মল্লিক, বাবুরাম, লাটু, হরিশ প্রভৃতিও ঘরে রয়েছেন। বিকাল প্রায় চারটা।

তর্কচূড়ামণি হলেন পণ্ডিত, বাগ্মী, লেখক এবং হিন্দু ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রয়াসী। তখনকার খৃষ্টান মিশনারী জেহাদের সামনে তিনি স্বধর্মের পক্ষে অক্লান্ত প্রচারক ও লেখক হয়ে দেখা দেন।

দক্ষিণেশ্বরে সেই দিনটির সপ্তাহ আগে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে বলরাম বসুর বাড়িতে। প্রথম দিনেই রামকৃষ্ণকে দেখে ও তাঁর কথাবার্তা শুনে শশধর গভীর প্রভাবিত হন।

তারপর এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। জ্ঞানমার্গী তর্কচূড়ামণির সঙ্গে রামকৃষ্ণ ঈশ্বর প্রসঙ্গ করছেন। বলছেন, 'যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই লীলার জন্যে নানা রূপ ধরেছেন।' 'ঈশ্বরের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর বেহুঁশ হইতেছেন। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কথা কহিতেছেন। পণ্ডিতকে বলিতেছেন, 'বাপু, ব্রহ্ম অটল, অচল সুমেরুবৎ। কিন্তু 'অচল' যার আছে তার 'চল'ও আছে।'

ঠাকুর প্রেমানন্দে মত্ত হইয়াছেন। যেই গন্ধর্ববিনিন্দিত কণ্ঠে গান গাহিতেছেন। গানের পর গান গাহিতেছেন—'

কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন……

গানখানি শেষপর্যন্ত গেয়ে দ্বিতীয় গান ধরলেন—

মা কি এমনি মায়ের মেয়ে।
যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাইয়ে ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যার কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে ॥
যে চরণে শরণ লয়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লুটায়ে ॥

এই গান সম্পূর্ণ শুনিয়ে, তারপর গাইলেন—

মা কি শুধুই শিবের সতী।
যাঁরে কালের কাল করে প্রণতি ॥
ন্যাংটা বেশে শত্রু নাশে মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
বল দেখি মন সে যে কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি ॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা সকলি জেনো ডাকাতি।

সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধ মতি॥

আবার গাইতে লাগলেন—

আমি সুরাপান করিনা সুধা খাই জয় কালী বলে,
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরু দত্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে,
জ্ঞান শুঁড়িয়ে চোয়ার ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মিলে।

তারপরের গানখানি হলো—

শ্যামাধন কি সবাই পায়।
অবোধ মন বোঝেনা একি দায়।
শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজানো রাঙ্গা পায়…

পাঁচখানি গান উপর্যুপরি গাইবার পর 'ঠাকুরের ভাবাবস্থা একটু কম পড়িয়াছে।… ছোট খাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন।

পণ্ডিত গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছেন। তিনি অতি বিনীতভাবে ঠাকুরকে বলিতেছেন, 'আবার গান হবে কি ?'

ঠাকুর একটু পরেই আবার গান গাহিতেছেন—

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়িতেছিল,
কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল।…
মায়াকান্না হল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি,
দারা সুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।
জ্ঞানমুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে
মাথা নাই সে আর কি উড়ে সঙ্গের ছজন জয়ী হল।
ভক্তিডোরে ছিল বাঁধা, খেলতে এসে লাগল ধাঁধা,
নরেশচন্দ্রের হাসা কাঁদা, না আসা এক ছিল ভাল।

তারপর আরেকখানি গান ধরলেন—

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি।…

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গান শোনালেন—

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ॥
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় বেঁধেছি।
(আমি) দেহ বেচে ভবের হাটে, শ্রীদুর্গানাম কিনে এনেছি ॥
দেহের মধ্যে সুজন কুজন তাদের ঘরে দূর করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে, দেখাব তাই বসে আছি ॥
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি ॥

'দুর্গানাম কিনে এনেছি' এই অংশটি শুনে শশধরের চোখে অশ্রু ঝরতে দেখা গেল। তার পরের গানটি হলো—

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি (ওরে) খোঁজ নিলে অন্তঃপুরে ॥
পরমধন সেই পরশমণি যা চাবি তা দিতে পারে।
ওরে কত মণি পড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির নাচদুয়ারে ॥
তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ মন উচাটন হইও না রে।
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে শীতল হও মূলাধারে ॥
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে
ওরে বাজীকরে চিনলে না সে তোমার ঘরে বিরাজ করে ॥

ভক্তির স্থান সবার ওপরে। মুক্তির চেয়েও ভক্তি বড়। এই ভাব নিয়ে ঠাকুর এবার গাইলেন—

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো।
আমার ভক্তি যে বা পায় সে যে সেবা পায়,
তারে কেবা পায় সে যে ত্রিলোকজয়ী ॥
শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে,
গোপ গোপী ভিন্ন অন্যে নাহি জানে।
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে
পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই ॥

এতক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ গান বন্ধ করলেন। এবার আরম্ভ হলো কথোপকথনে ঈশ্বর প্রসঙ্গ। অতি সহজবোধ্য কথায়, আটপৌরে ভাষায় গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি উপলক্ষ হলেন বটে। কিন্তু উৎকর্ণ

ভক্ত শ্রোতায় পরিপূর্ণ কক্ষ। এখন…(পৃঃ ১৫, পঙ্ক্তি ১৭) শশধরকে বললেন, 'বেদাদি অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধন না করলে তপস্যা না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।'……'শাস্ত্রাদি বিচার নিয়ে কতদিন? যতদিন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। ভ্রমর গুণগুণ করে কতক্ষণ? যতক্ষণ ফুলে না বসে। ফুলে বসে মধুপান করতে আরম্ভ করলে আর শব্দ নাই।'……

'জ্ঞানী 'নেতি নেতি' বিচার করে। এই বিচার করতে করতে যেখানে আনন্দ পায় সেই ব্রহ্ম।'……

গানে গানে আর কথায় বহুক্ষণ কেটে গেছে। আরম্ভ হয়েছিল বিকাল চারটের আগে। এখন সন্ধ্যের দেরি নেই।

এমন নিবিড় ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গের মধ্যেও সব বাস্তব বিষয়ে সজাগ রামকৃষ্ণ। শশধরকে বললেন, 'এখন তামাক খেয়ে এস।'

দক্ষিণ পুবের বারান্দা থেকে তিনি তামাক খেয়ে এলেন। তারপর রামকৃষ্ণ আরো কিছু প্রসঙ্গ করলেন—তিন রকমের আনন্দ। বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ। সমাধি কাকে বলে। ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর রেখে দেন—'ভক্তের আমি', 'বিদ্যার আমি'কে। ঈশ্বর কল্পতরু—যে যা চায় সে তা পায়। যেমন ভাব তেমনি লাভ। নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎ বড় কঠিন। সংসারীর জ্ঞান আর সর্বত্যাগীর জ্ঞান। অভাব-মুখ চৈতন্য আর ভাব-মুখ চৈতন্য। জড়ভেদ আর আধারভেদ, ইত্যাদি।

তারপর পণ্ডিতকে বললেন, 'একবার ঠাকুর দর্শন করে এস। আর বাগানে বেড়াও।' একটু পরে নিজেও বেরুলেন গঙ্গার ধারে। সেখানে শশধরের সঙ্গে আবার দেখা। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কালী ঘরে যাবে না?'

'আজ্ঞে চলুন দর্শন করি গিয়ে।'

চাঁদনীর মধ্যে দিয়ে মন্দিরের দিকে যেতে, রামকৃষ্ণ বললেন, 'একটা গানে আছে', বলে 'মধুর সুর করে' গাইতে লাগলেন—

মা কি আমার কালো রে।
কালো রূপ দিগম্বরী হৃদপদ্ম করে আলো রে॥

আবার চাঁদনী থেকে উঠোনে এসে বললেন, 'একটা গানে আছে—

'জ্ঞানাগ্নি জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।'

মন্দিরে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীধরের দাদা বললেন, 'শুনেছি নবীন ভাস্করের গড়া।'

তিনি উত্তর দিলেন, 'তা জানি না—জানি ইনি চিন্ময়ী।'

যখন ঘরে এলেন, তার আগেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসলেন, অর্ধ-বাহ্য অবস্থায়।
তর্কচূড়ামণিও ফিরলেন রামকৃষ্ণের ঘরে।
তাঁকে ঠাকুর বারান্দা থেকে বললেন, 'তুমি একটু জল খাও।'
পণ্ডিত বললেন, 'আমি সন্ধ্যা করি নাই।'
শুনেই রামকৃষ্ণ ভাবে মত্ত হয়ে গান আরম্ভ করলেন। দাঁড়িয়ে উঠলেন গাইতে গাইতে—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥···
গানটি শেষ পর্যন্ত গাইলেন।

তারপর সেইভাবে বিভোর হয়ে বললেন, 'কতদিন সন্ধ্যা? যতদিন ওঁ বলতে মন লীন না হয়।'
ভাবস্থ অবস্থায় খানিকক্ষণ গেল।
তারপর আরো কিছু অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ শুনে, বিদায় নিলেন পণ্ডিত শশধর।
'আবার আসবেন।' রামকৃষ্ণ রহস্য করে বললেন, 'গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্লাদ করে। হয়ত তার সঙ্গে কোলাকুলি করে। অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয় গরু আপনার জনকে দেখলে গা চাটে, অপরকে গুঁতোয়।'
শুনে সকলে হাসতে লাগলেন।
দশখানি গানে আর বিচিত্র কথা প্রসঙ্গে গভীর তত্ত্বকথা শোনাবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটি লৌকিক কিন্তু অব্যর্থ উপমা প্রয়োগ করলেন সকৌতুকে।
তারপর পণ্ডিত চলে যেতে, অপূর্ব প্রজ্ঞায় মন্তব্য করলেন, 'ডাইলিউট হয়ে গেছে এক দিনেই।' (কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১২-২০)
ইংরেজী শব্দটিতে উপরন্তু রসিকতা এবং তা অত্যন্ত সার্থক।
এমনি কখনো এক আধটি ইংরেজী কথা ঠাকুর বলতেন। যেমন—কুইন (ভিক্টোরিয়া-কে), রেফাইন, বিল্ডিং, লাইক, পেনসান, সায়েন্স, ফ্যালজফি (ফিলসফি), বিউটিফুল, স্টিক (ছড়ি), ফ্লোর, ইয়ং বেঙ্গল ইত্যাদি। কখনো রসিকতার ভাবে—থ্যাঙ্ক ইউ, অনরারি, ইংলিশম্যান (যে বাঙালী ইংরেজী জানে, যেমন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) প্রভৃতি।···
নববিধান সমাজের সুপরিচিত গায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। তিনি শুধু সুকণ্ঠ গায়ন শিল্পী নন। উৎকৃষ্ট গীত রচয়িতা। নিজের রচনা গান গেয়ে থাকেন আপন সুর-সংযোগে। বাংলা গানের জগতে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে, গীত-রচনাকার

হিসাবে। চিরঞ্জীব শর্মা লেখনী-নামে তাঁর গানগুলি প্রচারিত আছে। কেশবসেনের নববিধান সমাজের এক নিষ্ঠাবান প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ।

রামকৃষ্ণের প্রতি তিনি যেমন শ্রদ্ধাবান, তিনিও তেমনি সান্ন্যাল মশায়ের গানের অনুরাগী।

সেদিন সিঁথির ব্রাহ্ম সমাজে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন রামকৃষ্ণ। ১৮৮৪, অক্টোবর ১৯। শরৎ মহোৎসবে ব্রাহ্ম ভক্তরা এখানে মিলিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্যনাথ প্রমুখ।

সেখানে তখন ত্রৈলোক্যনাথ গান গাইছিলেন।

রামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'হ্যাগা, ঐ গানটি তোমার বেশ — দে মা পাগল ক'রে, ঐটি গাওনা।'

সান্ন্যাল মশায় আরম্ভ করলেন—

আমায় দে মা পাগল করে (ব্রহ্মময়ী)।
আর কায নাই জ্ঞান বিচারে॥
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ও মা ভক্ত চিত্তহরা ডুবাও প্রেমসাগরে॥…

'গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। একেবারে সমাধিস্থ —'

কিছুক্ষণ পরে সহজাবস্থা পেয়ে বলতে লাগলেন — সাধক, সিদ্ধি, সিদ্ধের সিদ্ধ প্রভৃতি প্রসঙ্গে।

তারপর 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে গানে কেশবাদি ভক্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, সেই গান —সেই মধুর কণ্ঠে —গাইতেছেন। সকলের বোধ হইতেছে, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন।

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন…

গানখানি সম্পূর্ণ গেয়ে, পুনরায় অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ করতে লাগলেন।

তারপর 'ত্রৈলোক্য আবার গান গাহিতেছেন। সঙ্গে খোল-করতালি বাজিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে বারবার সমাধিস্থ হইতেছেন।… বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গানের আখর দিতেছেন,—

'নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে,
আপনি নেচে নাচাও গো মা,
(আবার বলি) হৃদপদ্মে একবার নাচ মা,

নাচ গো ব্রহ্মময়ী সেই ভুবনমোহন রূপে।'

'সে অপূর্ব দৃশ্য। মাতৃগত প্রাণ, প্রেমে মাতোয়ারা সেই স্বর্গীয় বালকের নৃত্য। ব্রাহ্ম ভক্তেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন, যেন লোহাকে চুম্বকে ধরিয়াছে।

(কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৫৮-১৫৯)।...

ত্রৈলোক্যনাথের তুল্য আরেকজন সুকণ্ঠ গায়ক শ্যামাদাস গোস্বামী। তবে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের নন। কীর্তনীয়া রূপেই শ্যামাদাস পরিচিত।

একদিন তাঁর সামনেও রামকৃষ্ণ গাইলেন সাতখানি গান।

শ্যামাদাস সেদিন (১৮৮৭, সেপ্টেম্বর ৭) দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। মহেন্দ্রনাথ ও প্রিয় নাথ মুখোপাধ্যায় দুই ভাই রামকৃষ্ণের বড় ভক্ত। তাঁরাই নামী শ্যামাদাস কীর্তনিয়াকে এনেছেন কীর্তন প্রিয় ঠাকুরকে গান শোনাতে।

তাঁর অনেক ভক্তরাও এসেছেন, শ্যামাদাসের কীর্তন শুনতে আর রামকৃষ্ণের কীর্তনানন্দ দেখতে।

স-সম্প্রদায় শ্যামদাস মাথুর গাইতে লাগলেন। 'নাথ দরশ সুখে' ইত্যাদির মধ্যে যখন তিনি গাইছেন—

সুখময় সায়র মরুভূমি ভেল।

জলদ নেহারই চাতকী মরি গেল।...

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ভাবে আবিষ্ট হচ্ছেন শ্রীমতীর এই বিরহদশা বর্ণনায়।

কিন্তু ভালো গায়কের গানও সবদিন উৎরায় না। তেমনি এখানেও দেখা গেল, বিশেষ জমছে না শ্যামাদাসের কীর্তন।

পরমহংসও তা লক্ষ্য করলেন।

আসরে বসে শুনছিলেন নবাই চৈতন্য। তিনিও সখের কীর্তন গায়ক। কোন্নগরে তাঁর বাড়ি। গান শুনতেই সেদিন এসেছিলেন।

শ্যামাদাসের গান শেষ হতে, নবাই চৈতন্যকে বললেন রামকৃষ্ণ, 'এবার তুমি গাও।' নবাই প্রস্তুত হয়ে, গান ধরলেন। সঙ্কীর্তন আরম্ভ করলেন উচ্চকণ্ঠে।

আর আসন ছেড়ে রামকৃষ্ণ নৃত্য করতে লাগলেন। অমনি নবাই আর ভক্তেরা কীর্তন গাইতে লাগলেন তাঁকে ঘিরে ঘিরে। আর সেই সঙ্গে নৃত্য। এবার কীর্তন রীতিমত জমে উঠল।

নবাইয়ের গানের পরে রামকৃষ্ণ নিজের আসনে এলেন।

তারপর নিজে গান আরম্ভ করলেন আপন মনে। দেখতে দেখতে ভাবে মত্ত হয়ে গেলেন।

শ্যামাদাস আর নবাই চৈতন্য অবারিত করে দিয়েছেন তার গীতি নির্ঝর। তিনি

তন্ময় হয়ে একটির পর একটি গান গাইতে লাগলেন। 'ঊর্ধ্বদৃষ্টি।' সবই তাঁর প্রিয় মায়ের নাম গান—শ্যামাসঙ্গীত।

প্রথমেই ধরলেন—

—গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ ক'রো না।
ও মা ও দুটি চরণ বিনে আমায় মন অন্য কিছু আর জানেনা॥
তপন তনয় আমায় মন্দ কয়, কি বলিব তায় বলনা।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা॥
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে (ও মা) স্বপনেও তা তো জানিনা।
আমি অহর্নিশি শ্রীদুর্গানামে ভাসি তবু দুঃখ রাশি গেল না।
এবার যদি মরি ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর লবে না॥

তারপর গাইলেন—

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূলে সে প্রত্যয়…

আদ্যোপান্ত এখানি গেয়ে, তৃতীয় গান শোনালেন—

তোদের খেপার হাট বাজার মা (তারা)।
কব গুণের কথা কার মা তোদের॥
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস কদাচার।
মণিমুক্তা ফেলে পরিস গলে নরশির হার॥
শ্মশানে মশানে ফিরিস কার বা ধারিস ধার।
রামপ্রসাদকে ভবঘোরে করতে হবে পার॥

তারপর এই প্রিয় গানটি শেষ পর্যন্ত গাইলেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়…

ভাবে মাতোয়ারা হয়ে পরের গান ধরলেন—

আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥…

গানখানি সম্পূর্ণ গেয়ে ভাবে বিভোর হয়ে আবার ধরলেন—(সাধক কমলাকান্তের এটিই হয়ত শ্রেষ্ঠ রচনা)—

মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালোয় মিশে গেল,

দেখ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এতদিনে।
দেখ সুখ দুঃখ সমান হল আনন্দ সাগরে উথলে ॥

তাঁর গানের ধারা তখনো অবিরাম। পরের গানটি আরম্ভ করে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন প্রমত্ত আবেগে। কি গভীর সুরে এবার তাঁর শ্যামা মাকে সাদরে বরণ করলেন—

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দেখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাই দেখে ॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে ॥
(মাঝে মাঝে সে যেন মা বলে ডাকে)।
কুরুচি কুমন্ত্রী যত নিকট হতে দিও নাকো,
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে ॥

আবার নৃত্যের সঙ্গে গান ধরলেন—কালী রূপের ব্যাখ্যা করে—

শ্যামা মা কি আমার কালো রে।
কালো রূপ দিগম্বরী হৃদ্‌পদ্ম করে আলো রে…

গান শেষ করে যখন নিজের আসনে এসে বসলেন, তখনো 'ভাবে গর্গর মাতোয়ারা।' তারপর ভাবের কিঞ্চিৎ উপসম হলে, বলছেন—ওং ওং ওং ওং ওং ওং কালী! শেষে মহেন্দ্র গুপ্তকে বললেন, 'আজ খুব আনন্দ হল। হরিনামে কেমন আনন্দ দেখলে!'…… (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৩৭-১৩৯)

কিন্তু নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—ত্রৈলোক্যনাথ শ্যামাদাসদের চেয়ে অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক। রীতিমত সঙ্গীত ব্যবসায়ী তিনি। পেশাদার যাত্রা পালার গায়ক শুধু নন, নায়কও। সারা বাংলায় তাঁর নাম ডাক। এমন কি, কাশী বৃন্দাবন পর্যন্ত পেশাদার নীলকণ্ঠ গান শুনিয়ে আসেন। কাশীর পণ্ডিত মণ্ডলী অতিশয় প্রীতি হন তাঁর গান শুনে। একটি সভা করে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

বাংলাদেশে এমন কোনো শহর নেই, এমন বড় গ্রামও নেই যেখানে যাত্রাগান শোনান নি নীলকণ্ঠ (১৮৪০-১৯৩১)। লক্ষ লক্ষ শ্রোতা আনন্দ পায়, শিক্ষা পায় তাঁর যাত্রায়। তিনি 'মান' পালা গা'ন দু তিন দিন। 'মাথুর' সাত দিন গাইতে পারেন। নিজে দুটি পালারও লেখক নীলকণ্ঠ। তাঁর 'কালীয় দমন' পালার জন্যেই নাম সব চেয়ে বেশি। স্বভাবদত্ত সুকণ্ঠ তিনি। আবার যৌবনে নিজের চেষ্টায় রাগ সঙ্গীত ভালো ভাবে শিখেছেন। কত বড় বড় আসর যে তিনি মাৎ করেছেন পালা গানে। শুধু সুধাকণ্ঠ গায়ক বলেই নয়, শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানীগুণী বলেও নীলকণ্ঠের যথেষ্ট সম্মান।

এ হেন পালা গায়ক সেদিন (১৮৮৪, অক্টোবর ৫) দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। এখানে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে তাঁর যাত্রাগান হলো সকালবেলা। রামকৃষ্ণ সে আসরে শুনতে গিয়েছিলেন।

তারপর দুপুরে নীলকণ্ঠ এলেন তাঁর ঘরে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরে। নীলকণ্ঠের সঙ্গী পাঁচ সাত জন এসেছেন। তা ছাড়া আছেন মহেন্দ্র গুপ্ত, বাবুরাম প্রমুখ ভক্তরা। নীলকণ্ঠের দল আসবার পর আরো অনেকে আসায় রামকৃষ্ণের ঘর ভরে গেল।

প্রাথমিক আলাপের মধ্যেই কৃষ্ণ প্রসঙ্গ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার বললেন, 'তিনি এক দুয়ের পার—বাক্য মনের অতীত। লীলা থেকে নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলায় আসা,—এর নাম পাকা ভক্তি।'

তারপর নীলকণ্ঠের সভক্তি গানের সুখ্যাতি করে বললেন, 'তোমার ও গানটি বেশ —শ্যামাপদে আশ নদীর তীরে বাস।'

আবার কিছু ঈশ্বরীয় কথার পর বললেন, 'তুমি সকালে অত গাইলে, আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে।'

অত প্রসিদ্ধ পেশাদার পালা-গায়ক নীলকণ্ঠ। তাই বাস্তব অবস্থার ইঙ্গিতে রামকৃষ্ণ রসিকতা করলেন ইংরেজী শব্দ যোগে—'এখানে কিন্তু অনারারী।'...

জ্ঞানী নীলকণ্ঠ জানালেন, 'অমূল্য রতন নিয়ে যাব।'

সুবিনয় সুভাষিত রামকৃষ্ণ প্রত্যুত্তর দিলেন, 'সে অমূল্য রতন আপনার কাছে। আবার 'ক'য়ে আকার কি দিয়ে হবে? না হলে তোমার গান অত ভালো লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তাঁর গান ভালো লাগে।'

তারপর তক্তাপোশে বসে নীলকণ্ঠকে বললেন, 'একটু মায়ের নাম শুনব।'

নীলকণ্ঠ তাঁর দল নিয়ে গান আরম্ভ করলেন—

শ্যামাপদে আশ নদীর তীরে বাস

গান শুনতে শুনতে রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে উঠলেন। সেই অবস্থাতেই সমাধিস্থ।

নীলকণ্ঠ যখন গানের মধ্যে বলছেন—'যাঁর জটায় গঙ্গা, তিনি রাজরাজেশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করে আছেন'—

তখন সমাধিভঙ্গে নৃত্য করছেন রামকৃষ্ণ। নীলকণ্ঠ আর ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে গাইছেন আর নাচছেন।

নীলকণ্ঠ তারপর আরেকটি গান ধরলেন—'শিব শিব' সূচনায়।

এ গানটির পরে রামকৃষ্ণের অনুরোধে গাইতে লাগলেন স্বরচিত—

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব নটবর তপতকাঞ্চনকায়
করে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায়...

নীলকণ্ঠের গানের সঙ্গে এবার রামকৃষ্ণ ধুয়া ধরলেন—'প্রেমের বন্যা ভেসে যায়' গানের ধুয়ার সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন।

'সে অপূর্ব নৃত্য যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা কখনই ভুলিবেন না। ঘর লোকে পরিপূর্ণ, সকলেই উন্মত্তপ্রায়। ঘরটি যেন শ্রীবাসে আঙ্গিনা হইয়াছে।'

এবার রামকৃষ্ণ আরেকখানি গান গাইলেন—

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে,
ঐ তারা তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়,
তারা তারা দু ভাই এসেছে রে।
(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়)
(যাবা মার খেয়ে প্রেম যাচে)
নদে টলমল টলমল করে
গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে।

কীর্তন করতে তিনি নৃত্য করতে লাগলেন নীলকণ্ঠ প্রমুখেব সঙ্গে।

আবার আখর দিচ্ছেন—

রাধার প্রেমে মাতোয়ারা,
তারা তারা দুভাই এসেছে রে।

'উচ্চ সঙ্কীর্তন শুনিয়া চতুর্দিকের লোক আসিয়া জমিয়াছে। দক্ষিণের, উত্তরের ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় সব লোক দাঁড়াইয়া। যাঁহারা নৌকা করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও এই মধুর সঙ্কীর্তনের শব্দ শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন।

কীর্তন সমাপ্ত হইল। ঠাকুর জগন্মাতাকে নমস্কার করিতেছেন ও বলিতেছেন—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—জ্ঞানীদের নমস্কার, যোগীদের নমস্কার, ভক্তদের নমস্কার।'

এবার তিনি পশ্চিমের গোল বারান্দায় এসে বসলেন। সঙ্গে নীলকণ্ঠ ও অন্যান্যরা।

নীলকণ্ঠ বললেন, 'আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ।'

রামকৃষ্ণ জানালেন, 'আমি সকলের দাসের দাস। গঙ্গারই ঢেউ। ঢেউয়ের কখনো গঙ্গা হয়?'

নীলকণ্ঠ বললেন, 'আপনি যা বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি।'

আরো কিছু কথার পর রামকৃষ্ণ বললেন, 'তোমার এখানে আসা! যাকে অনেক সাধ্য সাধনা করে তবে পাওয়া যায়! তবে একটা গান শোন'—

বলে, এতবড় সঙ্গীত ব্যবসায়ীকে শোনাতে লাগলেন দ্বিতীয় গান—

গিরি ! গণেশ আমার শুভকারী।

পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী

যাও হে গিরিরাজ আন গিয়ে গৌরী ॥

বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,

গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।

ঘরে আনবো চণ্ডী শুনবো কত চণ্ডী,

কত আসবেন চণ্ডী, যোগী জটাধারী ॥

কিছুক্ষণ পরে তিনি হেসে হেসে বললেন, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বাবুরামদের দিকে চেয়ে, 'আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি—এঁদের (যাত্রাওয়ালাদের) আবার আমি গান শোনাচ্ছি।'

নীলকণ্ঠ উত্তর দিলেন, 'আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই, তার পুরস্কার আজ হলো।

(কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২০৮-২১১)।

সেদিন রামকৃষ্ণের কাছে ছিলেন যে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, তিনি ওই বিবরণটিও দিয়েছেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', পাঁচ ভাগ গ্রন্থাবলীর লেখক তিনি 'শ্রীম' নামে। মহেন্দ্রনাথ হলেন বিদ্যাসাগরের শ্যামপুকুর মেট্রোপলিটান স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সেই পরিচয়ে রামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন 'মাস্টার'। তার আগে মহেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনাও করে-ছেন। অর্থনীতি আর মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক থেকেছেন রিপন, সিটি ও মেট্রো-পলিটান কলেজে।

ধর্মজিজ্ঞাসু মহেন্দ্রনাথ প্রথমে কেশব সেনের কাছে যাতায়াত করতেন, তখনকার অনেক যুবকের মতন। কেশবচন্দ্রের সমাজমন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতেন। কেশবের সঙ্গে তাঁর কুটুম্বিতাও ছিল বিবাহসূত্রে।

মহেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেন ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারীতে। দক্ষিণেশ্বরে। আর সেই প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই গভীরভাবে প্রভাবিত হন। পরে নিয়মিত পরমহংসের কাছে যেতেন ছুটির দিনে। অর্থাৎ রবিবার ও অন্যান্য যেদিন স্কুল বন্ধ থাকত। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণত্ব। আর দিন-লিপির আকারে তাঁর ঠাকুরকে দেখা শোনা প্রসঙ্গ লিখে রাখতেন। পরে সেইসব বিবরণ থেকে প্রকাশ করেন তাঁর প্রামাণিক 'কথামৃত' গ্রন্থাবলী।

এই পাঁচ ভাগে বিস্তারিত পুস্তকের পরিসরে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত নিজেকে যথাসাধ্য গুপ্ত রেখেছেন। পরমহংসদেবের উল্লিখিত প্রায় যাবতীয় কথাবার্তা ও গানের প্রত্যক্ষ শ্রোতা হয়েও সবিনয়ে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার প্রয়াসী তিনি। গ্রন্থকার-রূপে মাত্র শ্রীম নাম মুদ্রিত করেছেন। আর গ্রন্থের মধ্যে আত্মগোপন করে আছেন বেশির

ভাগই 'মাস্টার' নামে। কোথাও বা 'মণি' পরিচয়ে (শ্রীরামকৃষ্ণ সেই যে 'যোগীর চক্ষু'র কথা বলেন মণি'কে,—'যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে,—সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্‌ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখি ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, 'আমায় সেই ছবি দেখাতে পার ?' আর মণি উত্তর দেন, 'যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই ?' মহেন্দ্রনাথই সেই মণি। আর পাখির ডিমে তা দেয়াব সেই ছবি 'কথামৃত' প্রত্যেক ভাগেই মুদ্রিত আছে—প্রচ্ছদপটে এবং প্রথম পৃষ্ঠার বিপরীতে।) কোথাও 'একজন ভক্ত' কোথাও বা 'ইংলিশম্যান' (তিনি ইংরেজী জানা লোক বলে রামকৃষ্ণ কথিত) নামে নিজেকে উহ্য রেখেছেন।

গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ নিজেও গায়ক। স্বামীজীর অনুজ দত্ত মহেন্দ্রনাথ তার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'মাস্টার মহাশয়ের অনুধ্যান' বইখানিতে। 'কথামৃত' ও অন্য কোনো কোনো পুস্তকেও এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। সেসব কথা থাকবে রামকৃষ্ণ পার্ষদদের প্রসঙ্গে। এখানে কথা এই, গায়ক এবং গানপ্রিয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিন থেকেই রামকৃষ্ণদেবের গানে মুগ্ধ হন। তাঁর দিনলিপিগুলি পরমহংসের সঙ্গীত-স্মৃতিতে ভরা। এক অলৌকিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর চিত্তাকর্ষক সঙ্গীত-গুণের পরিচয় পেলেন মহেন্দ্রনাথ।

ভগবৎ প্রসঙ্গের অঙ্গাঙ্গী তাঁর গান, তা তখন থেকেই মাস্টারমশায় লক্ষ্য করেন। এখন বিশেষ করে শ্রীম-কেই শ্রীরামকৃষ্ণের গান শোনাবার ক'টি বিবরণ দেওয়া হলো এখানে। তাঁদের পারস্পরিক সাক্ষাতকারের দ্বিতীয় দিন থেকে।

মহেন্দ্র সেই যে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায় ?'

আর তিনি উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস, তাঁর নাম গুণগান গান, বস্তুবিচার, এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।'

'কি অবস্থাতে তাঁর দর্শন হয় ?'

'খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়।...ডাকার মত ডাকতে হয়।'

বলে, শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরেছিলেন—

ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে॥
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
ভক্তি-চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও॥

(কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৩)

তখন থেকেই গুপ্ত মহেন্দ্রনাথের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ গীত-আস্বাদনের শুভ সূচনা। এ

পর্যন্ত ঠাকুরের যত সঙ্গীতপ্রসঙ্গ উদ্ধৃত করা হয়েছে তা প্রায় সবই শ্রীম.-র প্রত্যক্ষীভূত। আরো ক'টি এখানে যুক্ত হলো—

আরেক দিন শ্রীম. জানতে চান, 'সংসারী জীবের কি কোন উপায় নেই ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ জোর দিয়ে বলেন, 'অবশ্য উপায় আছে।…সাধুসঙ্গ, মাঝে মাঝে নির্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা। বিচার। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।'

তারপর হনুমান আর বিভীষণের গল্প বললেন, বিশ্বাসের কত শক্তি তা দেখাবার জন্যে।

এমনি কথার পরেই ঠাকুর গাইতে লাগলেন—

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ॥…

(কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৩)

পরের দিনও মহেন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনলেন। ভক্ত হনুমানের কথা বলতে বলতে রামকৃষ্ণ গেয়ে উঠলেন সেইভাবে—

আমার কি ফলের অভাব।
পেয়েছি যে ফল জনম সফল,
মোক্ষ ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে ॥
শ্রীরাম কল্পতরু মূলে বসে রই—
যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই ॥
ফলের কথা কই (ধনী গো) ও ফল গ্রাহক নই।
যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে ॥

গানের পর আবার সেই সমাধি। আবার নিস্পন্দ দেহ, স্তিমিত লোচন, চক্ষু স্থির।'… 'সন্ধ্যা হইল।…আরতি হইয়া গেল।…রাত হইয়াছে—মাস্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না।…শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয়, মন মুগ্ধ হইয়াছে; বড় সাধ যে আবার তাঁর শ্রীমুখে গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে একাকী ঠাকুর পাদচারণা করিতেছেন …মাস্টার ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্প। এক্ষণে সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ আর গান কি হবে ?'

ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'না, আজ আর হবে না।'

এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনি বলিলেন, 'তবে এক কর্ম কোরো। আমি

বলরামের বাড়ি কলকাতায় যাবো, তুমি যেও, সেখানে গান হবে।'...

(প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৩-৩৫)

এমনিভাবে, গানের মধ্যে দিয়ে রামকৃষ্ণের প্রথম পরিচয় পেলেন, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন মহেন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কত প্রসঙ্গে তিনি গান গেয়েছেন

মাইকেল মধুসূদন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শশধর তর্কচূড়ামণি, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবি ধর্মনেতা সাহিত্যিক পণ্ডিত মনীষী পালাগায়ককে শ্রীরামকৃষ্ণের গান শোনাবার নানা বৃত্তান্ত প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত করা হয়েছে। আরো কিছু বিবরণও দেওয়া হবে পরবর্তী নানা অধ্যায়ে। কারণ তাঁর গান শোনাবার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। তার মধ্যে বর্তমান অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে প্রকাশ্য—কত বিভিন্ন প্রসঙ্গে গান গেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

অনেক সময়েই দেখা গেছে যে-ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ নিয়ে কথোপকথন করছেন, সেই ভাবের গান গাইছেন। আবার কারুর কোনো বিশিষ্ট অধ্যাত্ম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন গানের মাধ্যমে। যে কোনো ঈশ্বরীয় বিষয় হোক শ্রীরামকৃষ্ণ তার উপযোগী সঙ্গীত সেই স্থলেই শুনিয়ে দেন—এ এক পরমাশ্চর্য। গীত নির্ঝর চির প্রবহমান তাঁর চিত্ত তটে। গত অধ্যায়ে শ্রীম-কে ঠাকুরের গান শোনাবার বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। এখানেও তাঁকে উপলক্ষ করে সূচনা করা হবে, বিবিধ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের গান গাইবার ধারা।

শ্রীম বিভিন্ন দিনে ঠাকুরের বাণী পেয়েছেন গানের মাধ্যমে। গুরুর নানা নির্দেশ তিনি সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই লাভ করেছেন। তেমনি একদিনের কথা (১৮৮৪ সালের ১৩ নভেম্বর)। তাঁদের প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের প্রায় তিন বছর পরে।

এখন গুপ্ত মহেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদে পরিণত হয়েছেন। তাঁর এক প্রধান ভক্ত এবং প্রিয় গৃহী শিষ্য সেবক। মহেন্দ্রনাথের একান্ত নিষ্ঠা ভক্তি ও সাত্ত্বিক স্বভাবের জন্যে ঠাকুর তাঁকে অতি নিকট জ্ঞান করেন। তাঁকে সেবার অধিকারও দিয়েছেন পরম স্নেহে।

শ্রীম এসময় মাঝে মাঝে দিন কয়েক যাপন করে যান দক্ষিণেশ্বরে। গুরুর সান্নিধ্যে ও প্রত্যক্ষ উপদেশ নির্দেশে সাধন ভজনে রত থাকেন। এমনি একদিন সকাল বেলা,

দক্ষিণেশ্বরে।

মহেন্দ্রনাথ গত রাত্রি থেকে রয়েছেন এখানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে এলেন কালী মন্দির থেকে।

ঘরে আর তৃতীয় ব্যক্তি নেই। তিনি পরপর পাঁচখানি গান গাইলেন ভাবে বিভোর হয়ে। আর কোনো কথা নয়।

মহেন্দ্রনাথের মনে হলো, 'গানের ছলে' কি শেখাচ্ছেন 'যে কালীই ব্রহ্ম, কালী নির্গুণা, আবার সগুণা, অরূপ আবার অনন্তরূপিণী।'

ঠাকুর তাই বুঝি প্রথমেই শোনালেন—

কে জানে কালী কেমন,
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।...

আপন মনে গানখানি সম্পূর্ণ গেয়ে, তারপর গাইতে লাগলেন আরেকখানি রাম-প্রসাদী—

এসব ক্ষ্যাপা মেয়ের খেলা।
(যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা) (আপ্তভাবে গুপ্তলীলা)
সে যে আপনি ক্ষ্যাপা কর্তা ক্ষ্যাপা, ক্ষ্যাপা দুটা চেলা।
কি রূপ কি গুণ ভঙ্গী, কি ভাব কিছুই যায় না বলা।
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে কণ্ঠে বিষের জ্বালা॥
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙছে ঢ্যালা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী নারাজ কেবল কাযের বেলা॥
প্রসাদ বলে থাকো বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার লো॥

এবার ভাবে মত্ত হয়ে ধরলেন—

কালী কে জানে তোমায় মা
(তুমি অনন্ত রূপিণী)।
তুমি মহা বিদ্যা অনাদি অনাদ্যা
ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী।
গিরিজা, গোপজা, গোবিন্দ মোহিনী
শারদে বরদে নগেন্দ্র নন্দিনী
জ্ঞানদে মোক্ষদে, কামাখ্য কামদে,
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণহৃদিবিলাসিনী॥

আবার গাইলেন—

তার তারিণী ! এবার ত্বরিত করিয়ে,
তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিতে প্রাণ যায় ॥
জগৎ অম্বে জনপালিনী, জগমোহিনী জগৎ জননী,
যশোদা জঠরে জনম লইয়ে, সহায় হরি লীলায় ॥
বৃন্দাবনে রাধা বিনোদিনী, ব্রজবল্লভ বিহার কারিণী,
রাসরঙ্গিণী রসময়ী হয়ে রাস করিলে লীলাপ্রকাশ ॥
গিরিজা গোপজা গোবিন্দ মোহিনী, তুমি মা গঙ্গে গতিদায়িনী,
গান্ধর্বিকে গৌরবরণী গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার ॥
শিব সনাতনী সর্বাণী ঈশানী সর্বানন্দময়ী সর্বস্বরূপিণী ।
সগুণা নির্গুণা সদাশিব প্রিয়া কে জানে মহিমা তোমার ॥

এতগুলি গান শোনবার পর মহেন্দ্রনাথ ভাবছেন, 'ঠাকুর যদি একবার এই গানটি গান—

আর ভুলালে ভুলবো না মা, দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ ।'

'কি আশ্চর্য', একথা মনে হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতে লাগলেন—

আর ভুলালে ভুলবো না মা,
দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ…

'ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—
আচ্ছা, আমায এখন কি রকম অবস্থা তোমার (বোধ) হয় ।'
—আপনার সহজাবস্থা।
ঠাকুর গানের ধুয়া ধরিলেন—'সহজ মানুষ না হলে সহজকে যায় না চেনা ।' (তৃতীয ভাগ, পৃঃ ১০৫)।

মহেন্দ্রনাথ যখন আড়াই বছরেরও বেশিদিন যাতায়াত করছেন তাঁর কাছে, ওই বিবরণী তখনকার।

তার বছর খানেক আগেকার (১৮৮৩, নভেম্বর ২৮) একদিনের কথাও মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন।

এদিনেও যেমন অনর্গল ভাগবতী কথা, তেমনি প্রসঙ্গের মধ্যেই গানের ধারা। তার আনুপূর্বিক প্রতিবেদন দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ। কেমন সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা রামকৃষ্ণ করেছেন। কত জিজ্ঞাসু জনের সংশয় চিরনিরশন করে দিয়েছেন গানে গানে। জীবনের কত মৌল প্রশ্নের সমাধান সরলতম ভাষায়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গীতে সেই বাণীকে শ্রোতার হৃদয়ে মুদ্রিত করেছেন। সদাসপ্রতিভ তিনি। সব প্রশ্নের সদুত্তর মেলে তাঁর কাছে।

জয়গোপাল সেনের বাড়িতে সেদিন তিনি এসেছেন। পাথুরিয়াঘাটার পাশের গলি। তখনকার নাম মাথা-ঘষা গলি। কেশ পরিচর্যার সুগন্ধী ইত্যাদি জিনিষপত্র সেখানে পাওয়া যায় বলে পথটির এই প্রাকৃত নামকরণ। এই অঞ্চলটি সেকালে অবিদ্যাদের বাসের জন্যে কুখ্যাত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করে জয়গোপাল বসালেন তাঁর বৈঠকখানায়। তাঁকে দেখবার জন্যে অনেকেই সেখানে উপস্থিত।

জয়গোপালের ভাই বৈকুণ্ঠ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহাশয়, সংসার কি মিথ্যা?'

'যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায় ততক্ষণ মিথ্যা। ততক্ষণ তাঁকে ভুলে মানুষ 'আমার আমার' করে; মায়ায় বদ্ধ হয়ে কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়ে আরও ভোগে। মায়াতে মানুষ এমনই অজ্ঞান হয় যে, পালাবার পথ থাকলেও পালাতে পারে না।'

তারপরই গান শোনালেন—

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে!
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥
বিল করে ঘুনী পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে॥
গুটীপোকায় গুটী করে পালালেও পালাতে পারে।
মহামায়ার বদ্ধ গুটী আপনার নালে আপনি মরে॥

আবার বললেন, 'তোমরা তো নিজে নিজে দেখছো, সংসার অনিত্য। এই বাড়িই দেখো না কেন? কতলোক এল গেল। কত জন্মাল কত দেহত্যাগ করলে। সংসারে এই আছে এই নেই। অনিত্য। যাদের এত 'আমার আমার' করছ, চোখ বুজলেই নাই।...'গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে।' এরূপ সংসার মিথ্যা, অনিত্য।'

আরেকজন প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়, এক হাতে ঈশ্বরে আর এক হাত সংসারে রাখব কেন? যদি সংসার অনিত্য, এক হাতই বা সংসারে দিব কেন?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তাঁকে জেনে সংসার করলে অনিত্য নয়। একটা গান শোন—' বলে, সেই অপূর্ব রামপ্রসাদীটি গাইলেন—

মন রে কৃষি-কায জান না।
এমন মানব জমিন রইল পড়ে আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালী বলে দাও রে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্ত-কেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না॥
অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে বাজাপ্ত হবে জান না।

এখন আপন এক তারে (মন রে) চুটিয়ে কেটে নে না ॥
গুরু-দত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তি-বারি সেঁচে দে না।
একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না ॥

গান শেষ করে, বললেন—গান শুনলে ? 'কালী নামে দাও রে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।' ঈশ্বরের শরণাগত হও, সব পাবে। 'সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া। তাঁকে যদি লাভ করতে পারো, সংসার অসার বলে বোধ হবে না। যে তাঁকে জেনেছে, সে দেখে যে জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন।'...

একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'বিবেক কাকে বলে ?'

তিনি বললেন, 'ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ এই বিচার। সৎ মানে নিত্য। অসৎ—অনিত্য। যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। অসৎকে ভালবাসলে—যেমন দেহ সুখ, লোকমান্য, টাকা, এই সব ভালবাসলে—ঈশ্বর যিনি সৎস্বরূপ তাঁকে জানতে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজতে ইচ্ছা করে।'

আবার তাঁর ব্যাখ্যা করতে ভালো লাগল সঙ্গীত দিয়ে। কাব্য আর সুরের সংযোগে জীবনের এক গভীর কথনীয়তা। রামপ্রসাদের সরল হৃদয়স্পর্শী সুরে, সহজ বাণীতে অতি দুরূহ তত্ত্বের ভাষ্য রচনা।

'একটা গান শোন—' বলে গাইতে লাগলেন—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরু মূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।...

গানখানি গাইবার পর বুঝিয়ে বলছেন, 'মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়, বিবেক হলে তবে তত্ত্বকথা মনে ওঠে। তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ হয়, কালীকল্পতরু-মূলে। সেই গাছতলায় গেলে, চার ফল অনায়াসে কুড়িয়ে পাবে—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। তাঁকে পেলে ধর্ম অর্থ কাম যা সংসারীর দরকার তাও হয়—যদি কেউ চায়।'...

(প্রথম ভাগ, পৃঃ ১১২-১১৫)

শ্রীরামকৃষ্ণের গান ও কথাপ্রসঙ্গে এমনি কত বিবরণই দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সব নদী সমুদ্র সামনে আসে। তেমনি পরমহংসদেবের সমস্ত প্রসঙ্গ উপনীত হয় ঈশ্বরীয় কথাসরিৎ সাগরে।

আর তিনি তো শুষ্ক নীরস সাধু নন। 'আমাকে রসে বশে রাখিস, মা। আমায় শুকনো সন্ন্যাসী করিসনে।'

এই তো তাঁর মর্ম-প্রার্থনা ছিল। ঈশ্বরকে তিনি জেনেছিলেন রসস্বরূপ বলে। তাই তাঁর সুন্দর নেহারি নয়ন। নন্দন-দৃষ্টি। চিত্র দেখে তিনি আনন্দ পান। সঙ্গীত তাঁর পরম

প্রিয়। নাটক অভিনয় দেখতে তাঁর ভালো লাগে। পুলক জাগে পিয়ানো বাজনা দেখে। চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে তিনি বাইরের দিকে চান হঠাৎ ফুল্ল চোখে। সমস্ত জীব-জগতকে আনন্দময় সত্তার প্রকাশ দেখেন। সদানন্দপুরুষ। সব আনন্দ দৃশ্যের দর্শক। সেবার উইলসনের সার্কাস এসেছে গড়ের মাঠে। ভক্তেরা তাঁকে সেই সার্কাস দেখাতে এনেছেন। ১৮৮২-র ১৫ই নভেম্বর।

বালকের তুল্য সানন্দে তিনি কটি খেলা দেখলেন। বিশেষ করে ভালো লাগল, চলন্ত ঘোড়ার পিঠে মেমসাহেবের খেলাটি। ঘোড়া পুরো দমে ছুটছে। তার ওপর মেম-সাহেব এক পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে। আবার মাঝে মাঝে লোহার চাকার (রিঙ্) দিয়ে টপ্কে যাচ্ছে বিবি। লাফিয়ে এসে আবার চলন্ত ঘোড়ার পিঠে এসে ঠিক এক পায়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সঙ্গীদের কাছে কিভাবে সেই গল্প করছেন। সেই খেলা থেকে বলছেন ঈশ্বরসাধনের কথা। সাধন ভজনের প্রয়োজনীয়তা।

পার্ষদদের সঙ্গে তখন আসছেন ঘোড়ার গাড়ির দিকে। এখান থেকে বলরাম বসুর বাড়ি যাবেন।

যাবার পথে মহেন্দ্রনাথকে বলছেন, 'দেখলে, বিবি কেমন একপায়ে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বন্‌বন্ করে দৌড়াচ্ছে। কত কঠিন, অনেকদিন ধরে অভ্যাস করেছে, তবে ত হয়েছে। একটু অসাবধান হলেই হাত পা ভেঙে পড়ে যাবে, আবার মৃত্যুও হতে পারে। সংসার করা ঐরূপ কঠিন। অনেক সাধন ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে। অধিকাংশ লোক পারেনা।...তাই সাধন ভজন খুব দরকার...'

তাঁদের ঘোড়ার গাড়ি চলছে বলরামের বাড়ির দিকে। সার্কাসের থেকে তিনি এই তত্ত্বকথা বলছেন। অভ্যাস যোগ। সাধনের পরে সংসার করার প্রসঙ্গ।

বলরামের বাড়িতে এসেও সার্কাসের গল্প করছেন ভক্তদের সঙ্গে। এবার সংসারী বদ্ধজীবের কথা বলছেন। তারা সব যেন সংসারের গুটিপোকা। নিজেদের তৈরি করা গুটি ছেড়ে বেরুতে পারে না।

আবার সেই গানখানি গাইলেন—

> এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
> ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥...

গানটি শেষ পর্যন্ত শুনিয়ে, জাঁতাকলের উপমা দিলেন। বললেন, 'জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতরে পড়েছে, পিষে যাবে। তবে যে কটি ডাল খুঁটি ধরে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটি অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হতে হয়। তাঁকে ডাক, তাঁর নাম কর, তবে মুক্তি। তা না হলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।'

এই ভাব নিয়ে গান ধরলেন—

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া ঝড় মোহ তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥
একে মাঝি আনাড়ি, তাহে ছজন গোঁয়ার দাঁড়ি;
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি॥
ভেসে গেল ভক্তির হাল; ছিঁড়ে পড়ল শ্রদ্ধার পাল।
তরী হল বানচাল উপায় কি করি॥
উপায় না দেখি আর অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, শ্রীদুর্গা নামের ভেলা ধরি॥

তারপর কথাবার্তা অন্য প্রসঙ্গে গেল।

'সাধুই কেবল সঞ্চয় করবে না।' এই ভাব নিয়ে বললেন উপমা দিয়ে…(পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৫-১৭)।……

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন তাঁর আলাপ পরিচয় বেশ হয়েছে। তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের ক মাস পরের কথা।

নরেন্দ্রকে ঠাকুর সাধন-পথে যাত্রা করিয়ে দিয়েছেন। নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসেন মাঝে মাঝেই। শুধু রামকৃষ্ণের বাণী শোনা নয়, জপধ্যানও আরম্ভ করেছেন। এমন একদিনের কথা।

সেদিন নরেন্দ্র এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সঙ্গে কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধু।

তাঁদের স্নান করা হলে, রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বললেন, 'যাও বটতলায় ধ্যান করগে।' তখন সকাল প্রায় সাড়ে দশটা।

তাঁরা পঞ্চবটীতে ধ্যান করছেন। এমন সময় সেখানে এলেন রামকৃষ্ণ। সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রামকৃষ্ণ কথা আরম্ভ করলেন।

ব্রাহ্ম ভক্তদের বললেন, 'ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়। উপর উপর ভাসলে কি জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায়?'

বলতে বলতেই এই ভাবের সঙ্গীত তাঁর কণ্ঠে এসে গেল। তিনি 'মধুর স্বরে' গান ধরলেন—

ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম সামর্থে একডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শান্তিরূপা মুক্তা ফলে।

তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মত চাইলে।
কামাদি ছয় কুমীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক হলদি গায়ে মেখে নাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রতন মানিক কত, পড়ে আছে সেই জলে,
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে।

তারপর বললেন, 'পাণ্ডিত্য আর লেকচারের কি হবে যদি বিবেক বৈরাগ্য না আসে।'…

(কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৯)

আর একদিন কজন ব্রাহ্মভক্ত দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন তাঁর কাছে। তাঁরা কলকাতার পুরণো ব্রাহ্ম। তাঁদের মধ্যে ঠাকুরদাস সেনও আছেন। আগে থেকে রামকৃষ্ণের ঘরে ছিলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সিঁদুরিয়াপটির মণি মল্লিক, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় ও আরো কজন ভক্ত।

তখন ঘরের ছোট খাটটিতে তিনি বসেছিলেন।

অতিথিদের সঙ্গে সানন্দে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন, 'তোমরা 'প্যাম্' 'প্যাম্' কর ; কিন্তু প্রেম কি সামান্য জিনিস গা ? চৈতন্যদেবের 'প্রেম' হয়েছিল। প্রেমের দুটি লক্ষণ। প্রথম—জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরের ভালোবাসা যে বাহ্যশূন্য। চৈতন্যদেব 'বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।' দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না, দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে। ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না।…'

একজন ভক্ত বললেন, 'তাঁকে ভালোবাসতে পারছি কই ?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তাঁর নাম কল্লে সব পাপ কেটে যায়। কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ ইচ্ছা, এসব পালিয়ে যায়।'

একজন বললেন, 'তাঁর নাম কর্তে ভালো কই লাগে ?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।'

বলে, 'দেবদুর্লভ কণ্ঠে' গান আরম্ভ করলেন—তার বিষয়বস্তু : 'জীবের দুঃখে কাতর' হয়ে 'মার কাছে হৃদয়ের বেদনা জানানো'—

দোষ কারু নয় গো মা, অমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল মনোরমা॥
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী—বিগুণ করেছে স্বগুণে।
কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে ;

ছিল বারি কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে,
আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তিভিক্ষে, কটাক্ষেতে কর পার ॥

সেই প্রসঙ্গে আর একটি গান গাইলেন—যার ভাব : 'জীবের বিকার রোগ ! তাঁর নামে রুচি হলে বিকার কাটবে'—

এ কি বিকার শঙ্করী, কৃপা চরণতরী পেলে ধন্বন্তরী !
অনিত্য গৌরব হল অঙ্গদাহ, আমার আমার একি হল পাপ মোহ ,
(তায়) ধনজন তৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি ॥
অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ, সতত সর্বমঙ্গলে ,
মায়া কাকনিদ্রা তাহে দাশরথী নয়নযুগলে ;
হিংসারূপ তাহে সে উদরে কৃমি, মিছে কাজে ভ্রমি সেই হয় ভূমি
রোগে বাঁচি কি না বাঁচি তন্নামে অরুচি দিবা শর্বরী ॥

(কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৮-২৯)

একেকটি ভাব নিয়ে গান শোনাতেন একেক সময় । সেই ভাব, কথায় আর গানে এমন গভীর ভাবে, এমন আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন যে শ্রোতাব মনে তা মুদ্রিত হয়ে যায় ।

এমনি একদিন বলরাম বসুর বাড়িতে ঠাকুর রয়েছেন । দোতলায় বাবান্দার ধারে সেই দক্ষিণমুখী বড ঘরখানিতে । প্রসঙ্গ হচ্ছে ঈশ্বরকৃপা ।

একজন জিজ্ঞাসুকে তিনি বুঝিয়ে বলছেন, 'জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের দয়া ছাডাহবারনয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে ? তার কতটুকু শক্তি ? সেই শক্তি দিয়ে সে কতটুকু চেষ্টা করতে পারে ?'

'এইরূপ কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল । কিছুক্ষণ পবে অর্ধবাহ্য দশায় বলিতে লাগিলেন, 'একটা ঠিক করতে পারে না, আবার আরেকটা চায় ।'

ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় গান ধরিলেন—

ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব
বাঁধা না দিলে কি পাবিস বাঁধিতে ?
ভব বন্ধন বারণ কারণ শুন হে জ্ঞানহীন
আমি অনেক দিন বাঁধা আছি
মা জননীর চরণ প্রান্তে ॥
ভব চিন্তাহারী প্রতি আমি রত,
প্রাণ দিয়েছি পদ প্রান্তে অবিরত,
আমি চিন্তামণির প্রিয় সুত

ওরে চিন্তামণি—সুত পার না চিনতে ॥

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল।

সে ব্যক্তি বলিতেন, 'সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে আঁকা রয়েছে। সেদিন থেকেই বুঝলাম ঈশ্বর কৃপা ছাড়া কিছু হবার নয়।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ, ভাবমুখে, পৃঃ ৭১-৭২। স্বামী সারদানন্দ।)

এমনিভাবে একদিন বলছিলেন ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার কথা। মণিলাল মল্লিকের সিঁদুরিয়াপটির বাড়িতে। সেখানে সেদিন ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব। ১৮৮৩ সালের ২৬শে নভেম্বরে।

রামকৃষ্ণ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত। বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে ঈশ্বরপ্রেমের কথা প্রসঙ্গে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় মাধুর্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাহিলেন—

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে…

শেষ পর্যন্ত গেয়ে, বিজয়কৃষ্ণকে বললেন, 'ভগবানের শরণাগত হয়ে এখন লজ্জা ভয় এসব ত্যাগ কর।…প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল।… এমনি কথার পর তিনি আবার গান ধরলেন—

সেদিন কবে বা হবে ?
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে (সেদিন কবে বা হবে ?)।
সংসার বাসনা যাবে (সেদিন কবে বা হবে ?)।
অঙ্গে পুলক হবে (সেদিন কবে বা হবে ?)।

এমন সময় আরো কজন ব্রাহ্ম ভক্ত এলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি আর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।

তারপর তিনি ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ বর্ণনা করলেন। আবার নতুন প্রসঙ্গ।

বললেন, 'যারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই তাদের কথা গোলমেলে।…'

এবার বললেন, 'কেউ ঐশ্বর্যের—বিভব, মান, পদ এই সবের অহঙ্কার করে। এসব দুদিনের জন্য ; কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গান আছে—

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়া জালে ॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, মিছে অমঙ্গল হবে বলে ॥
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্তা বলে সবাই মানে।

সেই কর্তাকে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে ॥

'আর টাকার অহঙ্কার করতে নাই', বলে, সেই জোনাকি, নক্ষত্র, চাঁদ আর সূর্যের উপমাটি শোনালেন। বড়র বড়, তারও বড় আছে যে।...

(কথামৃত প্রথম ভাগ, পৃঃ ১০৯-১১০)

...ঈশ্বরই কর্তা, মানুষ অকর্তা। তিনি রথী, মানুষ রথ। তিনি যন্ত্রী, মানুষ যন্ত্র। তিনিই ঘরণী, মানুষ ঘর মাত্র।

এই প্রসঙ্গ সেদিন করছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাঁকুড়গাছি বাগান বাড়িতে। তাঁর ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেখানে মহোৎসবের আয়োজন করেছেন। তাঁর বহু বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত।

কীর্তনিয়ারা অনেকক্ষণ সংকীর্তন শুনিয়েছেন, মাথুর প্রভৃতি পালা। রামকৃষ্ণও তাঁদের গানে আখর দিয়েছেন। নানা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করেছেন অনেকক্ষণ।

তারপর প্রতাপ মজুমদারের সঙ্গে কথা বলছেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে তার কমাস আগে। প্রতাপ কেশবের প্রধান অনুগামী। তাঁর সব কাজে দক্ষিণ হস্ত।

তাই প্রতাপচন্দ্রকে বলছেন, 'দেখ, তোমায় বলি, তুমি লেখাপড়া জান, বুদ্ধিমান, গম্ভীরাত্মা। কেশব আর তুমি ছিলে, যেন গৌর নিতাই দুভাই। লেকচার দেওয়া, তর্ক, ঝগড়া, বাদ বিসম্বাদ এসব অনেক তো হলো। আর কি এসব তোমার ভালো লাগে? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও। ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দাও।'

প্রতাপ বললেন, 'আজ্ঞা হাঁ, তার সন্দেহ নাই, তাই করা কর্তব্য। তবে এসব করা তাঁর নামটা যাতে থাকে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে শোনালেন, পাহাড়ের ওপরে সেই কুঁড়েঘরের গল্পটি। তারপর বললেন, 'কেশবের নাম তোমায় রক্ষা করতে হবে না। যা কিছু হয়েছে, জানবে—ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হলো আবার তার ইচ্ছাতে যাচ্ছে; তুকি কি করবে? তোমার এখন কর্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।'

'এই কথা বলিয়া ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাহিতে লাগিলেন—

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্ন ধন...

গানখানি সম্পূর্ণ গেয়ে, প্রতাপকে বললেন, 'গান শুনলে? লেকচার ঝগড়া ওসব তো অনেক হলো, এখন ডুব দাও। আর এ সমুদ্রে ডুব দিলে মরবার ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর।...   (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১১৮-১৩০)।

একদিন এমনিভাবে ঈশ্বরের লীলার প্রসঙ্গ করলেন, গানে আর কথায়। বাগবাজারে নন্দ বসুদের বাড়িতে। ১৮৮৫-র ২৮ জুলাই।

সেদিন রামকৃষ্ণ প্রথমে দক্ষিণেশ্বর থেকে বলরামের বাড়ি এসেছেন। সকাল থেকে রয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে। সেখানে নারায়ণ আর কে যেন বললেন, নন্দ বসুর বাড়ির কথা। সেখানে অনেক ঈশ্বরীয় বিষয়ের ছবি আছে।

বিকালে রামকৃষ্ণ তাই চলেছেন পাল্কী চড়ে, বাগবাজারে নন্দ বসুর বাড়িতে। সেখানে পৌঁছলে, তাঁকে অভ্যর্থনা করে দোতলার হলঘরে আনা হলো। নন্দবসু পশুপতি বসু ভ্রাতারা, গিরিশ ঘোষের অনুজ অতুলকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণের মহেন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ পার্ষদ এবং আরো অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন তাঁর সঙ্গে।

বিরাট কক্ষ। তার চারিদিকে দেবদেবীর চিত্র।

পশুপতি বসু সঙ্গে থেকে তাঁকে ছবিগুলি দেখাচ্ছেন। তিনি দেখছেন ভাবে বিভোর হয়ে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। হনুমানের মাথায় হাত দিয়ে রামচন্দ্রের আশীর্বাদ। কদম-তলায় বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ। বামনাবতার। নৃসিংহ অবতারের মূর্তি। গোষ্ঠে রাখালদের সঙ্গে কৃষ্ণের গোচারণ। বৃন্দাবনের যমুনাপুলিন-'ধূমাবতী'—সপ্তম চিত্রটি দেখে রামকৃষ্ণ বললেন। তার পরের ছবি—ষোড়শী। তারপর—তারা। পরেরটি—কালী। ওই চিত্র কখানি দেখে তিনি বললেন, 'এসব উগ্রমূর্তি। এসব মূর্তি বাড়িতে রাখতে নাই। এ মূর্তি বাড়িতে রাখলে পূজা দিতে হয়। তবে আপনাদের অদৃষ্টের জোর আছে। আপনারা রেখেছেন।'

তারপর অন্নপূর্ণার চিত্র দেখে বলে উঠলেন, 'বা! বা!'

তারপর রাই রাজা। পরের ছবিখানি দোললীলার।

'ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এর পরের মূর্তি দেখিতেছেন। গ্লাসকেসের ভিতর বীণা-পাণির মূর্তি; দেবী বীণা হস্তে…রাগ-রাগিণী আলাপ করিতেছেন।'

চিত্রদর্শন শেষ করে, নন্দবাবুকে বললেন, 'আজ খুব আনন্দ হলো। বা! আপনি তো খুব হিন্দু! ইংরাজী ছবি না রেখে যে এই ছবি রেখেছেন—খুব আশ্চর্য।…এ পট-গুলো খুব বড় বড়। তুমি বেশ হিন্দু।'

নন্দ বসু বললেন, 'ইংরাজী ছবিও আছে।'

তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক রামকৃষ্ণ। সহাস্যে উত্তর দিলেন, 'সে সব অমন নয়। ইংরাজীর দিকে তোমার তেমন নজর নাই।'

ঘরের দেওয়ালে কেশবচন্দ্রের সেই নব-বিধানের ছবিটিও ছিল। 'ঐ ছবিতে পরম-হংসদেব কেশবকে দেখাইয়া দিতেছেন, ভিন্ন পথ দিয়া সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাইতেছেন। গন্তব্য স্থান এক, শুধু পথ আলাদা।'

প্রসন্নের পিতা রামকৃষ্ণকে বললেন, 'আপনিও ওর ভিতর আছেন।'

তারপর ঈশ্বর প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ যখন বললেন, 'তিনি নিজেই সব, ঈশ্বর নিজেই জীব,

জগৎ সব হয়েছেন। যখন পূর্ণ জ্ঞান হবে তখন ঐ বোধ। তিনি সব, বুদ্ধি, দেহ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন।...'

তখন নন্দ বসু তর্ক করলেন, 'তিনি নানা রূপ কেন হয়েছেন? কোনখানে জ্ঞান, কোন খানে অজ্ঞান?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তাঁর খুশি।'

এই বলেই গান ধরলেন—

সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী॥
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি ঘর তুমি ঘরণী।
আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি॥

গান শেষ করে বললেন, 'তিনি আনন্দময়ী! এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলা করছেন। অসংখ্য জীব, তার মধ্যে দুই-একটি মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। তাতেও আনন্দ। ঘুড়ির লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।' কেউ সংসারে বদ্ধ হচ্ছে, কেউ মুক্ত হচ্ছে।'

'ভবসিন্ধু মাঝে মন উঠছে কত তরী।'...

(কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৯৬-২০০)

সংসারে মানুষ অষ্টপাশ দিয়ে বাঁধা রয়েছে। কত রকমের বাঁধন। সেই কথাই সেদিন বলছেন দক্ষিণেশ্বরে।

পঞ্চবটী তলায় পুরনো বটগাছের চাতালে বসে রয়েছেন। তাঁর কথা শুনছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেদার চাটুজ্যে, রাখাল ঘোষ, ভবনাথ, সুরেন্দ্র মিত্র, মহেন্দ্র গুপ্ত আরো কজন। প্রসিদ্ধা এবং প্রবীণা কীর্তনগায়িকা সহচরী সেদিন তাঁকে গান শোনাতে এসেছেন। তাঁর কীর্তন হবে কিছুক্ষণ পরে।

রামকৃষ্ণ বলছেন, 'অষ্টপাশ দিয়ে বন্ধন। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি অভিমান, সঙ্কোচ, গোপনের ইচ্ছা—এই সব।'

বলে, তিনখানি গান শোনালেন পর পর।

প্রথমে গাইলেন—

আমি ঐ খেদে খেদ করি (শ্যামা)।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি॥...

এখানি শেষ পর্যন্ত গেয়ে, আরম্ভ করলেন—

শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভবসংসার বাজার মাঝে)
ঘুড়ি আশা-বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥···

গানটি শুনিয়ে একটু ব্যাখ্যা করলেন, মায়া দড়ি কিনা মাগ ছেলে। বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কশা হয়েছে দড়ি। বিষয়—কামিনী কাঞ্চন।'

আবার গাইলেন—

ভবে আসা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম।
আশার আশা ভাঙা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম।
প'বার আঠার ষোল যুগে যুগে এলাম ভাল,
(শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলাম!
ছ' দুই আট ছ' চার দশ, কেউ নয় মা আমার বশ;
খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজী ভোর হইল।

তারপর ভাষ্য করে দিলেন, 'পঞ্জুড়ি অর্থাৎ পঞ্চ ভূত। পঞ্জা ছক্কায় বন্দী হওয়া অর্থাৎ পঞ্চ ভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া। 'ছ তিন নয়ে ফাঁকি দিব।' ছয়কে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া। 'তিনকে ফাঁকি দেওয়া' অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হওয়া।'··· (চতুর্থ ভাগ, পৃ: ৯১)

সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণের এমনি দিব্য পরিচয়। দেখা যায়, যত প্রকার অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ তিনি করেন, অনুরূপ ভাবের গানও শোনান। কখনো ব্যাখ্যা, কখনো বর্ণনা, কখনো টীকা স্বরূপ! বিষয়বস্তুর বিস্তারে তাঁর প্রাণ স্ফূর্তিলাভ করে—গানে। তাঁর নন্দনসত্তার এই এক পরমপ্রকাশ। কথার তুল্য অনর্গল উৎসারিত গীতধারা। সুর ও বাণীর সম্মিলনে তাঁর বক্তব্যের পূর্ণতা।

ঈশ্বরীয় কথাকে, নানামুখীন ভাবধারাকে কত অন্তরঙ্গ করে দেন গানে গানে। তাঁর চির সহৃদয়, কারুণিক ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে কত মানুষ দক্ষিণেশ্বরের সেই ঘরখানিতে উপস্থিত হন। কত তৃষিত তাপিত প্রাণে সেখানে শান্তিধারা নামে জীবন্ত বাণীতে। শোকে দুঃখে দগ্ধ মন অমৃতে সঞ্জীবিত করে দেন। মহানুভব সান্ত্বনার মূর্ত বিগ্রহ যেন। তাঁর সর্বস্বরূপে ঝংকৃত হয়ে ওঠে—সঙ্গীত। কত তার বৈচিত্র্য আর অভিনবত্ব।

একদিন মণিলাল মল্লিকের সঙ্গে তাঁর সে প্রসঙ্গটিও বলবার মতন। আর তা একেবারে ভিন্ন ধরনের।

সিঁদুরিয়াপটির মণিলাল রামকৃষ্ণের একজন প্রিয় ভক্ত। তাঁর বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে অনুষ্ঠানে কতবার গেছেন ঠাকুর। কত ঈশ্বরীয় কথা বলেছেন। উৎসবাদিতে কত গীত নৃত্য করেছেন ভাবে মত্ত হয়ে, ভক্তজন সঙ্গে। কিন্তু এদিনের পরিস্থিতি কি গুরুতর পার্থক্য। কি অভাবিত অভিজ্ঞতা। ঠাকুরের এই প্রিয় ভক্তের কি দুর্দিন।

আর সেই উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আরেক অভিনব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।
মণিলাল দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। কিন্তু মহাশোকে বিপর্যস্ত সেদিন। তাঁর উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। শ্মশানে সৎকার করে একেবারে চলে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। গৃহে ফিবে যান নি। শান্তি আর সান্ত্বনার আশায় ঠাকুরের ঘরটিতে উপস্থিত হয়েছেন।
এসব কিছুই জানতেন না পবমহংসদেব।
মণিলাল এসে দেখেন, কক্ষে অনেক জিজ্ঞাসু লোক। ঠাকুর কথা বলছেন তাঁদেব দিকে চেয়ে। মণিলাল দূর থেকেই তাঁকে অভিবাদন করে ঘরের একদিকে বসলেন। একটু পরেই রামকৃষ্ণের দৃষ্টি পড়ল তাঁর দিকে।
তিনি শির সঞ্চালনে মণিলালকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি গো? আজ তোমাকে এমন শুকনো দেখছি কেন?'
তিনি এতক্ষণ আত্মসংবরণ করেছিলেন অতি কষ্টে। এখন শ্রীবামকৃষ্ণেব সস্নেহ প্রশ্নে অভিভূত হয়ে পড়লেন।
উত্তর দিতে গিয়ে হুহু শব্দে ক্রন্দন করে উঠলেন মণিলাল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কোনো-রকমে জানালেন, পুত্রের নাম কবে—'আজ সে মারা গেছে।'
শুনে ঘরের সবাই মর্মাহত হলেন। স্তব্ধ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। আব বর্ষীয়ান মণিলালের বিলাপ উচ্ছ্বসিত হতে লাগল মর্মন্তুদভাবে।
তখন মৌন ভঙ্গ করে অনেকেই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সহ্য করুন, সংসাবের এই নিয়তি, শোক করে কি করবেন? ইত্যাদি কথায় বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই প্রশমিত হলো না মণিলালের শোকবহ্নি। তাঁর আকুলিত খেদোক্তিতে পূর্ণ হয়ে রইল কক্ষের বায়ুমণ্ডল।
আর সকলে লক্ষ্য করলেন এবং আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, রামকৃষ্ণ নির্বাক রয়েছেন। মণিলাল তাঁরই কাছে এসেছেন সান্ত্বনার জন্যে!
পরম কারুণিক তিনি। ভক্তজনের প্রতি যেমন তার আন্তরিক কৃপা আর সমব্যথিত্ব, তেমনি তাঁদের সঙ্কটে বিপদে নির্ভরতার স্থল। সর্বদা যিনি প্রাণবন্ত মুখর থাকেন, ভক্তের এই মহাশোকেও তাঁর হৃদয়ে সহানুভূতি জাগল না! তাই তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদরা হলেন বিস্মিত, হতবাক্। আর যাঁরা দক্ষিণেশ্বরে নবাগত, যাঁরা তাঁর সঠিক পরিচয় পান নি, এমন কেউ কেউ ঠাকুরকে উদাসীন সাব্যস্ত করলেন। তিনি কি করুণাহীন? তাঁর মন কি এত কঠিন? তিনি কোনো কথা বলছেন না কেন?
কিন্তু, না। দেখা গেল, কেউই ধারণা করতে পারেন নি ঠাকুরের অন্তর্নিহিত ভাব। তিনি উপবেশন করেছিলেন নিশ্চলভাবে। মণিলালের কথা শুনতে শুনতে রামকৃষ্ণের অর্ধবাহ্য দশা হলো। তারপর—

তিনি 'সহসা তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্ত মণিলালকে লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব তেজের সহিত গান ধরলেন—

জীব সাজ সমরে।
ঐ দেখ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে ॥
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান তূণ,
রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেম গুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে ॥
আর এক যুক্তি রণে, চাই মা রথরথী,
শত্রু নাশে জীব হবে সুসঙ্গতি,
রণভূমি যদি করে দাশরথী ভাগীরথীর তীরে ॥'

শোকাভিভূত মণিলালের প্রতি এই হলো তাঁর বাণী, দাশরথীরায়ের গানখানির মাধ্যমে। মুখ চোখের হাবভাবে এবং অঙ্গভঙ্গিমায় অভিনয়ের দ্যোতনায়। সেই সঙ্গে সুরের অমোঘ প্রভাবে তিনি মূর্ত করে তুললেন শোকোত্তীর্ণ লোকোত্তীর্ণ অভয় মন্ত্রের বক্তব্য। নাট্য-সঙ্গীতেব মতন আবেদনে কি গভীর প্রভাব দেখা গেল। কক্ষের সেই শোকাকুল আবহ একেবারেই পরিবর্তিত হলো তাঁর এই অভিনব ভাবাভিব্যক্তিতে। তাঁর সুরছন্দে উপস্থাপিত বরদানে।

'গানের বীরত্বব্যঞ্জক সুর ও তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী, ঠাকুরের নয়ন হইতে নিঃসৃত বৈরাগ্য ও তেজের সঙ্গে মিলিত হইয়া সকলের প্রাণে এক অপূর্ব আশা ও উদ্যমের স্রোত প্রবাহিত করিল। সকলের মন তখন মোহের রাজ্য হইতে উত্থিত হইয়া অপূর্ব এক ইন্দ্রিয়াতীত সংশয়াতীত বিমল ঈশ্বরীয় আনন্দে পূর্ণ হইল। মণিলালও তা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া শোক তাপ ভুলিয়া স্থির গম্ভীর শান্ত হইলেন।

'গীত সাঙ্গ হইল। কিন্তু গীতোক্ত কয়েকটি বাক্যের সহায়ে ঠাকুর যে দিব্য ভাবতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে অনেকক্ষণ অবধি ঘর জম্‌জম্ করিতে লাগিল। ঈশ্বরই একমাত্র আপনার, মনপ্রাণ তাঁহাকে অর্পণ করিলাম—তিনি কৃপা করুন। দর্শন দিন —এইভাবে আত্মহারা হইয়া সকলে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, ভাবমুখে, পৃঃ ২১-২২)।

এমনি কত বিচিত্র প্রসঙ্গে কত বিভিন্ন গানের বিবরণ সমুজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর জীবন বৃত্তান্তে। সঙ্গীতে সঙ্গীতে মূর্তিবন্ত কত নাট্যক্ষণ। পরে তাঁর কীর্তন গানের কথায় আরো কটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করা হবে। এ সমস্তই নানা জনকে তাঁর গান শোনাবার দৃষ্টান্ত। ঈশ্বরীয় কথায়, তত্ত্ব আলোচনায়, কিংবা আপন ভাবে বিভোর হয়ে নানা জনকে গান শোনানো।

আবার অপরের অনুরোধে তিনি গান গেয়েছেন, এমনও হয়েছে। তখনো দেখা গেছে কোনো প্রসঙ্গ বা ভাবের ধারাবাহিকতা।

একদিন অধরলাল সেনের বাড়িতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দোতলার বৈঠকখানায় ভক্তদের সঙ্গে রয়েছেন। তাঁকে গান শোনাবেন নরেন্দ্রনাথ এবং কীর্তনিয়া বৈষ্ণবচরণ।

তবলা তানপুরা বাঁধার পর নরেন্দ্র প্রথমে গাইলেন। তিনি শোনালেন—সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে···।' তারপর—'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে···।'

এই গানটি যখন নরেন্দ্র গাইছেন, রামকৃষ্ণ সহাস্যে হাজরাকে বললেন, 'প্রথম এই গান করে।' (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনে নরেন্দ্র এই গানটি গেয়েছিলেন)।

তারপর আরো দুখানি গান নরেন্দ্র গাইবার পর বৈষ্ণবচরণ গান ধরলেন—'চিনিব কেমনে হে তোমায় হরি। ওহে বঙ্কুরায় ভুলে আছ মথুরায়···।'

গানটি শেষ করলে, রামকৃষ্ণ বললেন বৈষ্ণবচরণকে, 'হরি হরি বল রে বীণে ঐটে একবার হোক না।'

বৈষ্ণবচরণ গাইতে লাগলেন—

হরি হরি বল রে বীণে !
শ্রীহরির চরণ বিনে পরম তত্ত্ব আর পাবি নে ॥···

গান শুনতে শুনতে রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে বললেন, 'আহা! আহা! হরি হরি বল।'

বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।···

কীর্তনিয়া বৈষ্ণবচরণ ওই গানখানি শেষ করে আরেকটি গান ধরলেন—

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়···

তারপর আরো দু'খানি গান গাইলেন—'হরি বিনে আর কি ধন আছে সংসারে' ও 'হরি বলে আমার গৌর নাচে'।

এইসব গানের মধ্যেই রামকৃষ্ণ কখনো অর্ধবাহ্য দশায় নৃত্য করছেন। কখনো আখর দিচ্ছেন গানের সঙ্গে।

তারপর ভাবাবেশের মধ্যে আবার নরেন্দ্রকে বললেন, 'সেই গানটি—আমায় দে মা পাগল করে।'

তখন নরেন্দ্র গানটি শোনালেন।

রামকৃষ্ণ আবার বললেন, 'আর ঐটি—চিদানন্দ সিন্ধু নীরে।··

নরেন্দ্র অমনি গাইলেন—

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী ··

এ গানখানিও শেষ পর্যন্ত শুনে ঠাকুর বললেন,'আর চিদাকাশে।'

সেটিও শুনে আবার বললেন, 'আর ঐটে—হরিরস মদিরা ?'

নরেন্দ্র গাইলেন—'হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে···'।

এই চারখানি গানই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের রচনা। এতগুলি গানের পর খানিক বিরতি। সকলে বিশ্রাম করছেন।

একটু পরে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, 'আপনি সেই গানটি একবার গাইবেন ?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আমার গলাটা একটু ধরে গেছে—'

কিন্তু গানের অনুরোধ রাখবেন না তা কি হয় ? তাই কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্‌টি ?'

নরেন্দ্র বললেন, 'ভুবনরঞ্জন রূপ।'

তিনি আস্তে আস্তে গাইতে লাগলেন—

ভুবনরঞ্জন রূপ নদে গৌর কে আনিল রে।
(অলকা আবৃত মুখ) (মেঘের গায়ে বিজলী)
(আন হেরিতে শ্যাম হেরি)······

গানখানি শেষ করে আবার একটি শোনালেন অনেকক্ষণ ধরে—

শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই।
আমি কি সুখে আর ঘরে রই ॥
শ্যাম যদি মোর হ'তো মাথার চুল।
যতন করে বাঁধতুম বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল ॥
(কেশব কেশ যতনে বাঁধতুম সই) (কেউ নকতে পারত না সই)
(শ্যাম কালো আর কেশ কালো)
(কালোয় কালোয় মিশে যেত গো)
শ্যাম যদি মোর বেশর হইত নাসা মাঝে সতত রহিত,
(অধরচাঁদ অধরে র'ত সই)। (যা হবার নয় তা মনে হয় গো)
(শ্যাম কেন বেশর হবে সই ?)।
শ্যাম যদি মোর কঙ্কণ হতো, বাহু মাঝে সতত রহিত
(কঙ্কণ নাড়া দিয়ে চলে যেতুম সই) (বাহু নাড়া দিয়ে)
শ্যাম কঙ্কণ হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই) (রাজপথে)।······'

(কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১২৬-১২৯)

আরেকদিনের কথা, বলরাম বসুর বাড়িতে। দোতলার বৈঠকখানায় তখন ঠাকুরের

কাছে রয়েছেন গিরিশ ঘোষ, সুরেন্দ্র মিত্র, মহেন্দ্র গুপ্ত, বলরাম, নারায়ণ, লাটু, গায়ক তারাপদ প্রভৃতি। 'এক ঘর লোক।'

রামকৃষ্ণ বলছেন, 'ঈশ্বর প্রেম ভক্তি শেখাবার জন্যে কখনো কখনো মানুষের দেহ ধারণ করে আসেন।...অগ্নি-তত্ত্ব কাঠে বেশি। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ, মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখবে উর্জিতা ভক্তি—প্রেম ভক্তি উথলে পড়েছে—ঈশ্বরের জন্যে পাগল—তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা—সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।'...

এই প্রসঙ্গের পর তিনি গান শুনতে চাইলেন। তখন তারাপদ গাইতে লাগলেন—

কেশব কুরু করুনা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী ॥...

গানখানি শেষ পর্যন্ত শুনে রামকৃষ্ণ গিরিশকে বললেন, 'আহা, বেশ গানটি। তুমিই কি সব গান বেঁধেছ ?'

একজন ভক্ত বললেন, 'হাঁ, উনিই চৈতন্যলীলার সব গান বেঁধেছেন।'

রামকৃষ্ণ গিরিশের দিকে ফিরে বললেন,—'এ গানটি খুব উৎরেছে।'

তাবপর গায়ককে জিজ্ঞেস করলেন, 'নিতাইয়ের গান গাইতে পারো ?'

তারাপদ তখন নিতাইয়ের গান, তারপর গৌরাঙ্গের গানও ('কার ভাবে গৌর বেশে জুড়ালে হে প্রাণ') শোনালেন।

আবার রামকৃষ্ণ ঈশ্বরীয় কথা খানিক বললেন—তাঁর কাছে পৌঁছবার পথ বা উপায় নিয়ে।

তারপর গিরিশকে বললেন, 'নরেন্দ্র খুব ভাল, গাইতে বাজাতে, লেখাপড়ায়, এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। অনেক গুণ।'

এমনি কথার মধ্যে তাঁর আরেক প্রিয় শিষ্য নারায়ণ জিজ্ঞেস করলেন, 'মহাশয়। আপনার গান হবে না ?'

অমনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মধুর কণ্ঠে মায়ের নাম গুণ গান' আরম্ভ করলেন। পর পর গাইলেন তাঁর অতি প্রিয় তিনখানি শ্যামাসঙ্গীত।

'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে'।...
'গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরোনা।'...
ও 'শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দ মগনা।'...

গান শেষ করবার একটু পরে বললেন, 'আমার আজ গান ভালো হলো না—সর্দি হয়েছে।' (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৯০-১৯৬)

কিন্তু শ্লেষ্মাকণ্ঠ সত্ত্বেও তো তিনখানি বড় গান শুনিয়েছিলেন, অনুরোধে।

আরেকদিনের কথা, দক্ষিণেশ্বরে। সেদিন অদ্বৈত বংশের রাধিকা গোস্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর, গোস্বামী গান গাইতে অনুরোধ করলেন তাঁকে ('অতি বিনীতভাবে'), 'একটু মহাপ্রভুর গুণানুকীর্তন—'

নাম গুণ গানে আর কখন অসম্মত তিনি ?

তখনি রামকৃষ্ণ কীর্তনানন্দ গান আরম্ভ করলেন—

আমার অঙ্গ কেন গৌর হ'ল

তার পরেও আরেকটি কীর্তন শোনালেন—

গোরা চাহে বৃন্দাবন পানে,
আর ধারা বহে দু নয়নে।
(ভাব হবে বৈ কি রে) (ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের)
(যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ গৌর) (ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়)
(বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে) (সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে)
(গোরা আপনার পা আপনি ধরে)……

গানের পরে বললেন, 'এ ত আপনাদের (অর্থাৎ বৈষ্ণবদের) হ'লো।…(কিন্তু) এখানে সব ভাবই আছে—এখানে সব রকম লোক আসবে বলে, বৈষ্ণব, শক্তি, কর্তাভজা, বেদান্তবাদী, আবার ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী।'…

(কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৯৬)

…অনুরোধ রক্ষায় গান গাওয়া আর আগেকার উদ্ধৃত গানের প্রসঙ্গগুলি একই পর্যায়ের। অর্থাৎ এইসব দিনে তিনি গান গেয়েছেন অন্যদের শোনাবার জন্যে। অপরের সাক্ষাতে, বহুজনের সামনে তাঁর এইসব গান গাওয়া।

কিন্তু আরেকভাবে তাঁর গাইবার কথা জানা যায়। তখন কোনো তত্ত্ব ব্যাখ্যাতা নন তিনি। কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে শোনাবার জন্যেও সেসব গান নয়। একেবারে ভিন্ন তার পরিমণ্ডল। এইসব গান কখনো তিনি গেয়েছেন একলা ঘরে। আর কখনো দেবী প্রতিমার সামনে। চিন্ময়ীর সঙ্গে অন্তরাত্মার সংযোগে সে গানের উৎসার। রানী রাসমণির অনুরোধে একেকদিন যে বিগ্রহের সামনে গান গেয়েছেন, তেমনও নয়। এক্ষেত্রে আর দ্বিতীয় কারুর উপস্থিতি নেই গানের সময়।

সেদিন দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে রয়েছেন রামকৃষ্ণ। 'ঐ রাত্রে কাত্যায়নী পূজা। 'ঠাকুর প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাটমন্দিরে মার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বলিতেছেন—

মা তুমিই ব্রজের কাত্যায়নী।
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত মা তুমি সে পাতাল।

তোমা হতে হরি ব্রহ্মা, দ্বাদশ গোপাল।

দশ মহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার।

এবার কোন রূপে আমায় করিতে হবে পার।

ঠাকুর গান করিতেছেন ও মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। প্রেমে একেবারে মাতোয়ারা।'...

এই বিবরণও দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

(কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪৭)।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরে গঙ্গার দিক থেকে প্রবেশ করলে, প্রথমেই দেখা যায় দ্বাদশ শিবমন্দির। সেই বারোটি শিবমন্দিরের মাঝখানে চাঁদনী। চাঁদনী ও শিবমন্দিরের সারি পার হলে, সামনে প্রকাণ্ড উঠান, পুবদিকে। তারপর দুই বিরাট মন্দির, দক্ষিণে ও উত্তরে।

দক্ষিণের মন্দিরই কালীবাড়ি। সেখানেই নাটমন্দিরসহ মূল মন্দিরে ভবতারিণী কালী প্রতিমা।

উত্তরে, রাধাকান্তের মন্দির। এখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। এই রাধাকান্ত মন্দিরেই রামকৃষ্ণ প্রথমে পূজারী হয়েছিলেন। ভবতারিণী কালী মন্দিরের পূজারী হন এক-বছর পরে, অগ্রজ রামকুমারের মৃত্যুতে। রাধাকান্ত মন্দিরের গোবিন্দমূর্তির ভগ্ন পদ তিনি নিপুণভাবে জুড়ে দেন, প্রসঙ্গত বলা যায়।

একদিন সেই রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে গান গেয়েছিলেন তিনি। তার উল্লেখ যে পুস্তকে আছে, সেটি রামকৃষ্ণের জীবনকালেই প্রকাশিত হয়—

'আর একদিন দোলের সময় তিনি রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে গেলে পর তাঁহার রাধার ভাব হয় এবং সে সময় তিনি কৃষ্ণের গায়ে ফাগ দিতে দিতে 'আজু ফাগ রণে, দেখি তুমি হার কি আমি হারি' গান করিতে করিতে এরূপভাবে ক্রীড়া করিয়াছিলেন যে, যাঁহারা সে দৃশ্য দেখিয়াছেন তাঁহারা মোহিত হইয়া গিয়াছেন।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ, পৃঃ ২৬—সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত)।

রামকৃষ্ণের অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ)—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় সভাপতি। বহরমপুর সারগাছি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। তারও প্রথম জীবনের একটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃতির যোগ্য। সে সময় তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথম যাতায়াত করছেন। তখন একদিন রামকৃষ্ণ কিভাবে গান গেয়েছিলেন আপন ভাবে, অন্য নিরপেক্ষ হয়ে, তা গঙ্গাধরের নিজেরই এক অলৌকিক উপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। তার উল্লেখ আছে স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনীতে :—

'আর একদিন গঙ্গাধর দক্ষিণেশ্বরে রহিয়াছে; পরদিন সকালে অন্তর্যামী ঠাকুর

সস্নেহে তাহাকে একেবারে ভবতারিণীর মন্দিরের ভিতর লইয়া গিয়া বলিতেছেন, 'এই ত্যাখ্ চৈতন্যময় শিব।' বালকের অমনি মনে হইল যেন চৈতন্যময় নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'ত্যাখ্ ত্যাখ্ এই চৈতন্যময় শিব কি করে শুয়ে আছেন!'

এ দিনের প্রসঙ্গে তিনি 'স্মৃতিকথায়' লিখিয়াছেন, 'এতদিন ভাবতাম যে সব জায়গায় যেমন শিব এও তেমনি। কিন্তু এ কি! এ যে জীবন্ত দর্শন করছি। সে যে কি আনন্দ ঠাকুর প্রাণে ঢেলে দিলেন, তা মুখে আর কি বল্‌ব!—অনুভূতির বিষয়।...

আমাকে যে কি দেখালেন ঠাকুর—এই ভাবতে ভাবতে দিনটা যে কোথা দিয়ে গেল, তা জানতেও পারলাম না। ঠাকুরও ভাবে কত গান গাইলেন।'

(স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৭ স্বামী অন্নদানন্দ)।

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরেই আরেকদিনের কথা। জগজ্জননীকে তাঁর গান শোনাবার একটি উদাহরণ।

তার আগের রাত্রে রামকৃষ্ণ বলরাম বসুর বাড়িতে ছিলেন। রথযাত্রার উৎসব হয়েছিল (১৮৮৫) বলরামের দোতলার বারান্দায়। সেখানেই পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রথম আলাপ। ধর্মপ্রচার করতে গেলে ঈশ্বরের 'চাপরাশ' নিতে হয়, নাহলে তা নিষ্ফল হয়ে থাকে, এইসব প্রসঙ্গ করেছিলেন সেদিন।

ঠাকুর পরের দিন নৌকোয় এসে পৌঁছলেন দক্ষিণেশ্বরে। আর নৌকো থেকেই কালীমন্দিরে চলে এলেন। প্রতিমা প্রণাম করে 'মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য বিনোদিনী॥
শরীরে শারীরী যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চারিণী।
আধারে ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর
মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃদ্‌প্রকাশনী॥
বিশুদ্ধে হিন্দোল সুরে কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে
তাল মান লয় সুরে ত্রিসপ্ত সুর ভেদিনী।
শ্রীনন্দকুমার কয় তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়
তব তত্ত্ব গুণত্রয় কাকীমুখ আচ্ছাদিনী॥

নাটমন্দিরের উত্তর প্রান্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার সামনে বসিয়া ঠাকুর এইরূপে গাহিতেছেন, সঙ্গী ভক্তেরা কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে ইহা শুনিয়া মোহিত হইয়া

রহিয়াছেন। গাহিতে গাহিতে, ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া উঠিলেন, গান থামিয়া গেল, মুখের অদৃষ্টপূর্ব হাসি যেন সেই স্থানে আনন্দ ছড়াইয়া দিল…'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ, উত্তরার্দ্ধ, পৃঃ ২৪৩—স্বামী সারদানন্দ)।…

দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরটিতে রামকৃষ্ণদেবের আপন মনে গান গাইবার আরেকটি বিবরণ পাওয়া যায়। স্বামী অখণ্ডানন্দের ওই 'স্মৃতিকথাতেই—

'একটু পরে এসে দেখি তিনি তাঁর সেই মধুর কণ্ঠে গোবিন্দ অধিকারীর 'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের—রাই আমাদের, আমরা রাইয়ের' এই কীর্তন করছেন। কীর্তনটি রঙ্গে ভঙ্গে সম্পূর্ণ করতে করতে অজস্র অশ্রুধারায় তাঁর বক্ষ প্লাবিত হলো এবং তিনি সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন।

আমি অবাক হয়ে বসে রইলাম। এ জীবনে তেমন অদ্ভুত ব্যাপার আর দেখিনি। ঐ কীর্তন কতভাবেই গাইলেন। সমস্ত বিকালটা কীর্তনেই কেটে গেল।'

(স্মৃতিকথা, পৃঃ ১৪—স্বামী অখণ্ডানন্দ)।

তাঁর একাকী গান গাইবার আরো এক বিশিষ্ট উদাহরণ আছে। তাও দক্ষিণেশ্বরে, তাঁর বাস কক্ষে।

সেদিন রামকৃষ্ণের সঙ্গে এমন একটি প্রসঙ্গ আছে যা অসাধারণ বললে সঠিক হবে না, বলা যায়—অলৌকিক। ঘটনাটি গৌরীমা'র অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তথা প্রথম সাক্ষাতের অতিপ্রাকৃত কাহিনী।

ভারতের এক উচ্চকোটির সাধিকা গৌরীমা (১৮৫৭-১৯৩৭)-গৌরদাসী বা গৌরী —রামকৃষ্ণের শিষ্যা তিনি। পরবর্তীকালে 'সারদেশ্বরী আশ্রম' প্রতিষ্ঠা আর পরিচালনা তাঁর এক স্মারক হয়ে থাকে। সাধন জীবনের সঙ্গে গঠন শক্তির অসামান্য সমন্বয়। রামকৃষ্ণের গানের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁকে গৌরীমার প্রথম দর্শনের দিনে। আর সঙ্গে এমন একটি সিদ্ধাই প্রসঙ্গ, যা রামকৃষ্ণ প্রচ্ছন্ন রেখে দিতেন। ক্বচিৎ তার পরিচয় পেয়েছেন মথুরবাবুর মতন কেউ মাত্র।

বালিকা বয়স থেকেই একান্ত ভক্তিমতী গৌরী। আর তেমনি তীব্র তাঁর বৈরাগ্য। কুমারী জীবনেই সংসার ত্যাগ করেন আধ্যাত্মিক আকুলতায়। উত্তর ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিক্রমা করেন, অধিকাংশই পদব্রজে। নানা সাধু মহাত্মার দর্শন পান। পরিচয় হয় ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু রামকৃষ্ণের কথা জানতেন না তখনো। এমন সময় (১৮৮০) বাগবাজারের রাজমোহন বসুর সঙ্গে পরিচিতা হলেন। মাঝে মাঝে থাকতেন রাজমোহনের কলকাতার বাড়িতে কিংবা তাঁদের বৃন্দাবনের কলাকুঞ্জে। তাঁরই পুত্র বলরাম। রামকৃষ্ণের কাছে তিনি তখন যাতায়াত আরম্ভ করেছেন। বলরামের সঙ্গে

হৃদ্যতা আছে গৌরীর অগ্রজ অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়ের।

সেবার গৌরী তাঁদের বাড়িতে রয়েছেন। গৃহদেবতা দামোদরের সেবা পূজা আর শাস্ত্র পাঠে অহোরাত্রি নিমগ্না। বলরাম তাঁকে শোনান দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের কথা। বলরাম জানেন, গৌরী এই বয়সেই বহু তীর্থ দর্শন, সাধুসঙ্গ, শাস্ত্র পাঠ করেছেন। বহু দূর অগ্রসর তিনি সাধন জীবনে।

তবু তাঁকে বলেন, 'দিদি, এমন এক সাধুর সন্ধান আমি জানি যাঁকে দেখলে তোমার জীবন ধন্য হবে। যাবে একদিন দক্ষিণেশ্বরে?'

এড়িয়ে যান গৌরী। হেসে বলেন, 'তোমার সাধুর যদি তেমন ক্ষমতা থাকে, আমায় টেনে নিয়ে যাবেন। তার আগে আমি যাচ্ছিনে।'

সেদিন গৌরী দামোদরের অভিষেক করছেন। স্নানের পর বিগ্রহকে সিংহাসনে রাখতে গিয়েই দেখেন—দুটি পা সেখানে।

প্রথমে ভাবলেন, চোখের ভুল। আবার লক্ষ্য করে দেখলেন—দুখানি পদ সিংহাসনে। দেহের অন্য অংশ দেখা যাচ্ছে না, সিংহাসনের ওপরে শুধু যুগল চরণ।

গৌরীর শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কাঁপতে লাগল তাঁর দুই হাত। যথাবিধি অভিষেক মন্ত্র পাঠ করে তুলসী দিলেন—পুনরায় সেই পা দুটি। তুলসী পড়ল সেই পায়ে।

এবার গৌরী সংজ্ঞা হারালেন। চৈতন্য হলো তিন ঘণ্টা পরে। বলরাম প্রভৃতি অনেক প্রশ্ন করেও জানতে পারলেন না, কি হয়েছে। কারণ গৌরী নির্বাক। আচ্ছন্ন অবস্থা। কারো কথার উত্তর দিতে অসমর্থা। কেবল বার বার নিজের বুকের দিকে চেয়ে কি ধরবার চেষ্টা করছেন। যেন কে তাঁকে টানছে, বুকে সুতো বেঁধে। জানা যায় না কার টান। আর সেই সুতোও ধরা যাচ্ছে না। বুকের মধ্যে কিসের যন্ত্রণা। বাড়ির কেউ আর কিছু বললেন না তাঁকে।

সেইভাবে রাতেও তিনি অর্ধচেতন হয়ে রইলেন। এক সময় তন্দ্রার মধ্যেই শুনলেন —কে বলছেন—'আমি না টানলে তুই আসবিনি?'

গৌরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি? তোমার গলা যেন চেনা মনে হচ্ছে?'

সেই আনন্দময় পুরুষ বললেন, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কাছে এলে তবে তো চিনবি?' তুই আয়না, শীগগীর আয়।'

তন্দ্রা ভেঙে গেল। জেগে উঠলেন গৌরী। কিন্তু ঘরে কেউ নেই তো। শুধু কানে বাজছে, 'আয় আয় আয়।'

তখনো ভোর হয় নি। দেউড়িতে এলেন গৌরী। তাঁকে দেখে দারোয়ানেরা খবর দিলে বলরামকে।

তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'দিদি, কোথায় যাবে?'
গৌরী নিরুত্তর।
'দক্ষিণেশ্বরে মহাপুরুষের কাছে যাবে?'
কোনো জবাব নেই। আর চোখ মুখের ঘোর ভাব দেখে বলরামের মনে হলো, মাহেন্দ্র-ক্ষণ উপস্থিত। ঠাকুরের কাছে তাঁকে এখনি নিয়ে যেতে হবে।
তিনি নিজের পত্নী, আরও দু তিন জন মহিলার সঙ্গে গৌরীকে নিয়ে গাড়িতে উঠ-লেন। তেমনি ঘোরের অবস্থায় রয়েছেন সাধিকা।—
দক্ষিণেশ্বরে যখন পৌছলেন, সকালের প্রথম আলো ফুটে উঠেছে। বলরাম সকলকে নিয়ে এলেন রামকৃষ্ণের ঘরে।
তিনি ছোট খাটটিতে বসে গান গাইছিলেন—

যশোদা নাচাত গো মা বলে নীলমণি
সে রূপ লুকালে কোথা করালবদনি···

আর একটি কাঠিতে সুতো জড়াচ্ছিলেন।
তাঁদের ঘরে আসতে দেখে, বন্ধ করলেন গান। সুতো জড়িয়ে কাঠিটা পাশে রাখলেন।
বলরাম আর সকলে তাঁকে প্রণাম করতে, গৌরীও প্রণাম করলেন। আর চমকে উঠ-লেন তাঁর পা দেখে।
একি! এই পা দুখানিই তো দামোদরের সিংহাসনে দেখেছিলেন। কোনো ভুল নেই! শিহরিতা হলেন গৌরী।
কিন্তু মহাপুরুষের সহাস্য মুখ।
গৌরী ভাবছেন—কে এই আনন্দময় পুরুষ? কোথায় যেন দেখেছি।
একটু পরে রামকৃষ্ণ বলরামকে বললেন, গৌরীকে দেখিয়ে, 'এ যে এখানকার থাকের লোক।'
বিদায় নেবার সময় গৌরীকে বললেন, 'আবার এস মা।'
গৌরীর আর সন্দেহ নেই—ইনিই সেই মহাপুরুষ, তাঁর দীক্ষাগুরু।
রামকৃষ্ণের একলা ঘরে গানের কথায় গৌরীমাব গুরু দর্শনের এই বৃত্তান্ত।
তাঁর একাকী গান গাওয়ার এমনি সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তেমনি, সমাধি ভঙ্গের পর প্রথম বাহ্য দশাতেও গান গেয়েছেন তিনি। কখনো গান গাইতে গাইতে সমাধিস্থ হয়েছেন। তারও বিভিন্ন উদাহরণ তাঁর জীবন বৃত্তান্তে বিকীর্ণ। এমনি কয়েকটি এখানে উল্লেখ্য।
একদিন দক্ষিণেশ্বরের সেই ঘরে নরেন্দ্র আসার পর হঠাৎ তাঁর সমাধি হলো। তারপর 'ভবনাথ গাহিতেছেন—

গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো'না,

ও দুটি চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানেনা

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি গাইতেছেন—

কখন্ কি রঙ্গে থাক মা সুধাতরঙ্গিণী

ঠাকুর আবার গাইতেছেন—

বল রে শ্রীদুর্গানাম।

ওরে আমার আমার আমার মন রে…'

(কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৩৯-১৪০)

আরেকদিন তিনি গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে 'আনন্দময়ী।' 'আনন্দময়ী।' এই কথা উচ্চারণ করিয়া সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধিস্থ হইয়া অনেকক্ষণ রহিলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া …গান ধরিলেন—

'এবার আমি ভাল ভেবেছি …'

গানখানি শেষ পর্যন্ত গেয়ে, আবার সম্পূর্ণ গাইলেন—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা যায় …'

(কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, ১১৩ ১১৪ পৃষ্ঠা)।

আবার একদিন অন্যান্য গানের পর—'শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে …এই গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।'…

(কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১১৭ ১১৮)

তেমনি আরেক রকমে তাঁর গানের কথা জানা যায়। তখন বাহ্য কোনো উপলক্ষ ঘটে নি। ছিল না সঙ্গীতের কোনো পরিবেশ বা প্রসঙ্গ কিংবা প্রেরণা। কিন্তু তিনি গান গেয়ে উঠেছেন। বলা যায়, অকস্মাৎ। এমন উদাহরণেরও অভাব নেই তাঁর জীবনে। সেসব যেন তাঁর অন্তরে বহমান সঙ্গীত সুধার আকস্মিক প্রকাশ। যেমন—

(১) ঠাকুর…ও কথায় সায় দিলেন না। কেবল রহস্য করিয়া উড়াইয়া দিলেন। হঠাৎ মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। গাহিতেছেন—আর ভুলালে ভুলবো না মা, দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ …' (কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ পৃ. ১৪১)

(২) 'শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন প্রাতঃকালে বলরাম ভবনে আসিয়াছেন। বহু ভক্ত তাঁহার চারিপার্শ্বে উপবিষ্ট। যথাসময়ে নরেন্দ্র আসিয়া তাঁহার খুব কাছে বসিয়াছেন। ইহার পরই ক্রমশ ভক্ত অভক্ত নানা শ্রেণীর লোক সমাগমে ঘরটি ভরিয়া গেল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই ঠাকুর হঠাৎ ভাবমুখে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন।'

(স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৬—স্বামী অন্নদানন্দ)।

(৩) একদিন তিনি এসেছেন রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর কণ্ঠে

বেলফুলের বড় মালা পরিয়ে দিতে,'পরমহংস মশাই দাঁড়াইয়া উঠিলেন।...পরমহংস মশাইয়ের সমাধি অবস্থা আসিতে লাগিল। কখনো বা তিনি ডান হাতের অঙ্গুলি দিয়া নিজের শরীরের দিকে দেখাইতে লাগিলেন, ও মৃদু স্বরে এই গানটি গাহিতে শুরু করিলেন :

আর কি সাজাবি আমায়,
জগৎ-চন্দ্র হার আমি পরেছি গলায়...

গানটি গাহিয়া নানা প্রকার হাতের ভঙ্গী করিয়া উপরের দিকে দেখাইতে লাগিলেন। —অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র দেহটির ভিতর এক বিরাট পুরুষ রহিয়াছেন ; চন্দ্রাদি গ্রহ সমূহ তাঁহার গলার হারের মতো ;...এই ক্ষুদ্র দেহটিতে একটি ক্ষুদ্র মালা পরাইয়া কী বা আশ্চর্য কার্য করিতেছ। গানটি তিনবার বলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া যাইলেন। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর এত করুণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, সেই কণ্ঠস্বর এখনো আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে।...মুখের ভাব, হাতের ভঙ্গী ও কণ্ঠের স্বর দিয়া তিনি এমন একটি ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, অসীম অনন্তের ভাবটি স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। 'শব্দ' হইতে মনকে 'শক্তি'-তে লইয়া যাওয়া, ইহাকেই বলে।...এই গানটি বা নাদ ব্রহ্ম শুনিয়া মন অন্য প্রকার হইয়া গিয়াছিল।'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, পৃঃ ৫৯-৬১—মহেন্দ্রনাথ দত্ত)।...

তাঁর আরেকভাবে গানের কথাও স্মরণীয়। এই দিনের ঘটনাস্থল দক্ষিণেশ্বর। তার আগের রাত্রে তাঁর কয়েকজন শিষ্য সেখানে ছিলেন। সেদিন তাঁদের সাধন প্রসঙ্গে জানা যায় রামকৃষ্ণের গান গাইবার কথা আর মহাসাধক পরিচয় : গান গেয়ে শক্তি সঞ্চারিত করে দেওয়া—

'এক ব্রাহ্ম মুহূর্তে সকলকে ধ্যানে বসাইয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী, তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী,
তুমি ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী। প্রসুপ্ত ভুজগাগারা আধার পদ্মবাসিনী ॥
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু।
মূলাধার ত্যজ শিবে স্বয়ম্ভু শিব বেষ্টিনী ॥
গচ্ছ সুষুম্নার পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপুর অনাহত, বিশুদ্ধাজ্ঞা সঞ্চারিণী ॥
শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে।
ক্রীড়া করে কুতূহলে সচ্চিদানন্দ-দায়িনী ॥

হঠাৎ লাটু 'উহু'-রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রবণ মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দুই স্কন্ধে হস্ত স্থাপন পূর্বক চাপিয়া ধরিলেন। লাটু যেন আসনে বসিয়া থাকিতে পারিতে-

ছিলেন না—শীঘ্রই বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন ; কিন্তু ঠাকুরের গান সমভাবেই চলিতে লাগিল।' (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মালিকা, অদ্ভুতানন্দ, পৃঃ ৫৩৭—স্বামী গম্ভীরানন্দ)।
আবার কখনো ঠাকুর কথায় কথায় গান শুনিয়ে দিয়েছেন। একদিন নরেন্দ্র এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁকে স্পর্শ করে রামকৃষ্ণ গেয়ে উঠলেন—

'কথা কইতে ডরাই,
না কইতেও ডরাই ;
পাছে হারাই হারা-ই ।'

বাবুরামের বিষয়ে বলতেন, 'ও আমার দরদী।' বলে, সুর করে গাইতেন—

'মনের কথা কইব কি সই ? কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচেনা।'...

রামকৃষ্ণের এক গৃহী ভক্ত হলেন দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ('মহিলা' কাব্য প্রণেতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনুজ)। দেবেন্দ্রনাথ একদিন সন্ন্যাসের অনুমতি চান তাঁর পদতলে বসে। কিন্তু তখন ঠাকুর তাঁকে সযত্নে তুলে, শচীমাতার ভাবে গান ধরলেন—

কেন নদে ছেড়ে সোনার গৌর দণ্ডধারী হরি ?
ও তোর ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া তার দশা কি করিবি ?
একে বিশ্বরূপের শোকে,
শক্তিশেল রয়েছে বুকে,
তুইও কি অভাগী মাকে অকূলে ডুবাবি ?...

ঠাকুরের আরো কদিন গান গাইবার বৃত্তান্ত এখানে দেওয়া হলো। সবই 'কথামৃত' থেকে উদ্ধৃত। কেবল শেষেরটি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে বিবৃত। প্রত্যেকটি উদাহরণ থেকে দেখা যাবে, কি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তিনি গেয়েছেন এক একটি প্রসঙ্গে। যেমন অনর্গল তাঁর ঈশ্বরীয় বিষয়ে ভাষণ—গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব অতি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া—তেমনি অবাধ তাঁর প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত নির্ঝর। কথোপকথনের মধ্যেই অবলীলায় সেই সেই ভাবানুসারী গান। এক এক বিষয়ে কথার আনুসঙ্গিক কিংবা পরিপূরক ব্যাখ্যাকারী সঙ্গীত তিনি শুনিয়ে দেন। বক্তব্য বুঝিয়ে দেন গানে। আবার গান শুনিয়ে তার তাৎপর্য জানান কথায়। কখনো ভাষণের উপসংহারে সঙ্গীত। কখনো গানের উপসংহারে কথা। তাঁর সঙ্গীত ও কথোপকথন অঙ্গাঙ্গী, পরস্পর-নির্ভর।

গানে গানে আত্মপ্রকাশের পরমাশ্চর্য দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ। কথার তুল্য সদা প্রস্তুত, তাৎক্ষণিক তাঁর সঙ্গীত ধারার উৎসার।

'একদিন ঠাকুর সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে এসেছেন, মণিলাল মল্লিকের বাড়িতে। সমা-

জের সাংবাৎসরিক উপলক্ষ্যে মহোৎসব। তাই অনেক ব্রাহ্ম ভক্তদের সমাগম হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ কথায় কথায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলছেন, 'দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুঁটলি-পাটলা, পনেরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড় বুচকি থাকে, তাহলে তাদের বিশ্বাস ক'রো না।...ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে আপনি কর্মত্যাগ হয়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এমন সময় হয়েছে।—সব ছেড়ে তুমি বলো, 'মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাই দেখে।'

এই বলিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাহিলেন—

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন তুই দেখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে॥
(মাঝে মাঝে সে যেন মা বলে ডাকে)।
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিও না ক',
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে॥
(খুব যেন সাবধানে থাকে)।'

পরে আরেকটি প্রসঙ্গ করলেন : 'প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হলে বাহিরের জিনিস ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস—তাও ভুল হয়ে যায়।

এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতেছেন—

'সেদিন কবে বা হবে?
হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে (সেদিন কবে বা হবে?)।
সংসার বাসনা যাবে (সেদিন কবে বা হবে?)।
অঙ্গে পুলক হবে (সেদিন কবে বা হবে?)।'...

এমন সময় নিমন্ত্রিত আর কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী।...

শ্রীরামকৃষ্ণ (অভ্যাগত ব্রাহ্ম ভক্ত দৃষ্টে)—আবার সময়োচিত প্রসঙ্গ করলেন সুস্পষ্ট ভাষায় এবং অনুরূপ ভাবের চূড়ান্ত বৈরাগ্যের গান শোনালেন উপসংহারে—'যারা শুধু পণ্ডিত কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা গোলমেলে।...কেউ ঐশ্বর্যের—বিভব, মান, পদ, এই সবের—অহঙ্কার করে। এসব দুইদিনের জন্য; কিছুই সঙ্গে যাবে না। একটা গানে আছে—

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজলে॥
যার জন্য মর ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥
দিন দুই-তিনের ভবে, কর্তা বলে সবাই জানে।
সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে॥'...

গানখানি গেয়ে, বললেন, 'টাকার অহঙ্কার করতে নেই।'
এই নীতিটি বুঝিয়ে দিলেন চমৎকার একটি ছোট গল্পের উপমা দিয়ে।...
সেদিন সিঁথির ব্রাহ্ম-সমাজে শিবনাথ শাস্ত্রীকে উদ্দেশ করে ঠাকুর বলছেন—'হ্যাগো, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য অত বর্ণনা কর কেন?...যারা নিজেরা ঐশ্বর্য ভালবাসে, তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে ভালবাসে।...ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে যাও! তাঁর অনন্ত সৃষ্টি অনন্ত ঐশ্বর্য। অত খবরে আমাদের কার্য কি!'
বলতে বলতে 'আবার সেই গন্ধর্ব নিন্দিত কণ্ঠে সেই মাধুরিমাপূর্ণ গান' ধরলেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥...'

এই গানখানি তিনি আরেকদিন শুনিয়েছিলেন, কেশব অনুগামী প্রতাপ মজুমদারকে। ঈশ্বরই কর্তা, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়—সেদিন ঠাকুরের এই বক্তব্য। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরের কথা। ঠাকুরের সঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের দেখা হয়েছে, সুরেন্দ্রনাথের বাগানে।
শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'লেকচার দেওয়া, তর্ক, ঝগড়া, বাদ-বিসম্বাদ এসব অনেক তো হলো আর কি এসব তোমায় ভালো লাগে? এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও। ঈশ্বরেতে এখন ঝাঁপ দাও।
প্রতাপ উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞা হাঁ, তায় সন্দেহ নাই, তাই করা কর্তব্য। তবে এসব করা তাঁর নামটা যাতে থাকে।'...
শ্রীরামকৃষ্ণ—উপমাচ্ছলে একটি গল্প (পাহাড়ের ওপর, ঝড়ের মুখে একটি ঘর) শুনিয়ে—বোঝালেন, 'কেশবের নাম তোমায় রক্ষা করতে হবে না। যা কিছু হয়েছে, জানবে—ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতে হলো আবার তাঁর ইচ্ছাতে যাচ্ছে; তুমি কি করবে? তোমার এখন কর্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ঝাঁপ দাও।
'এই বলিয়া ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাহিতে লাগিলেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।...'

গানখানি সম্পূর্ণ গেয়ে বললেন, 'গান শুনলে ?…এখন ডুব দাও। আর এ সমুদ্রে ডুব দিলে মরবার ভয় নাই। এ যে অমৃতের সাগর।'…

একদিন বলরাম মন্দিরে ঠাকুর উপস্থিত। ঘরে অনেক ভক্ত। তাঁদের 'শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী বদ্ধ জীবের কথা বলিতেছেন। তারা যেন গুটীপোকা, মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে ; কিন্তু অনেক যত্ন করে গুটী তৈয়ার করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না ; তাতেই মৃত্যু হয়। আবার যেন ঘূর্ণির মধ্যে মাছ ; যে পথে ঢুকেছে, সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু জলের মিষ্টি শব্দ আর অন্য অন্য মাছের সঙ্গে ক্রীড়া, তাই ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে না। ছেলেমেয়ের আধ আধ কথাবার্তা যেন জলকল্লোলের মধুর শব্দ। মাছ অর্থাৎ জীব, পরিবারবর্গ …

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর গান শোনালেন—

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানতে পারে॥
বিল করে ঘূণি পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে॥

ঠাকুর আবার বলিতেছেন, জীব যেন ডাল, যাঁতার ভিতর পড়েছে, পিষে যাবে। তবে যে কটি ডাল খুঁটা ধরে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটা অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হতে হয়। তাঁকে ডাক, তাঁর নাম কর তবে মুক্তি। তা না হলে কাল রূপ যাঁতায় পিষে যাবে।

বলেই অনুরূপ ভাবের গান ধরলেন—

পড়িয়ে ভব সাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥
একে মন মাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি।
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল ; ছিঁড়ে পড়ল শ্রদ্ধার পাল,
তরী হল বানচাল উপায় কি করি ;—
উপায় না দেখে আর, অকিঞ্চন ভেবে সার ;
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, শ্রীদুর্গা নামের ভেলা ধরি॥

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীবেণী পালের সিঁথির বাগানে এসেছেন।
তাঁকে একজন ব্রাহ্ম ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়, উপায় কি ?'
শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'উপায় অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে ভালবাসা। আর প্রার্থনা।'
এবার সুর করে এই গানটি গাইলেন—

ডাক দেখি মন ডাকার মতো, কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে ॥
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
ভক্তি চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও ॥

গানের পর, আরো ব্যাখা করে দিলেন, 'আর সর্বদাই তাঁর নাম গুণগান কীর্তন ও প্রার্থনা করতে হয়। পুরাতন ঘটি রোজ মাজতে হবে, একবার মাজলে কি হবে ? আর বিবেক, বৈরাগ্য। সংসার অনিত্য, এই বোধ।'…

একদিন দক্ষিণেশ্বরে সুরেন্দ্র মিত্রকে বলছেন, 'সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ ; তোমাদের পক্ষে তা নয়। তোমরা মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে আর তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে। তোমরা মনে ত্যাগ করবে। বীর ভক্ত না হলে দুদিক রাখতে পারে না ; জনক রাজা সাধন ভজনের পর সিদ্ধ হয়ে সংসারে ছিল। সে দুখানা তলোয়ার ঘুরাত : জ্ঞান আর কর্ম।'

এই ভাবটি রামপ্রসাদের গান গেয়ে বুঝিয়ে দিলেন—

এই সংসার মজার কুটি,
আমি খাই দাই আর মজা লুটি ॥
জনক রাজা মহা তেজা তার বা কিসে ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি ॥

কিন্তু সাধারণ সংসারী ব্যক্তির পক্ষে তা তো সম্ভব নয়। তাই ঠাকুর বললেন, 'তোমাদের পক্ষে চৈতন্যদেব যা বলেছিলেন, জীবে দয়া, ভক্তসেবা আর নাম সংকীর্তন। 'তোমায় বলছি কেন ? তোমায় হৌসে' (House, সদাগরের বাড়ির) কায , আর অনেক কায করতে হয়। তাই বল্‌ছি।'…

আরেকদিন গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন— এ পাপীর কি হবে ?'
শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন দাশরথির পদ গেয়ে।
'ঠাকুর ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া করুণ স্বরে গান ধরিলেন—

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে। নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি ॥
ভাবিলে ভব ভাবনা যায় রে—
তবে তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।
এলি কি তত্ত্বে, এ মর্তে কুচিত্ত কুবৃত্ত করিলে কি হবে রে
উচিত তো নয়, দাশরথিরে ডুবাবি রে—
কর এ চিত্ত প্রাচিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে ॥'

কি ভাবে ত্রাণ পাওয়া যায় তা গিরিশের মনে প্রোথিত করে দেবার জন্যে, গানের সেই

পঙ্‌ক্তিটি পুনরায় গাইলেন—

(গিরিশের প্রতি)—"তার তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেবা ভাবে।"

তারপর আরো বুঝিয়ে বললেন, 'মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। '

একদিন বলরাম মন্দিরে ঠাকুর একজনকে বোঝাচ্ছেন, 'জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল কিছুই ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া হবার নয়। মানুষের কতটুকু শক্তি ?'

এমনিভাবে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলতে বলতে ঠাকুরের সমাধি হলো। কিছুক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্যদশা পেয়ে বললেন, 'একটা ঠিক করতে পারে না, আবার আরেকটা চায়।' বলেই সেই ভাবাবস্থায় গান ধরলেন—

'ওবে কুশীলব   কবিস কি গৌরব

ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে ?

গাইতে গাইতে তাঁর অশ্রুধারা নামল। আর তাঁর বক্তব্য মুদ্রিত হয়ে গেল সেই শ্রোতার চিত্তপটে। 'সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে আঁকা রয়েছে। সেদিন থেকেই বুঝলাম ঈশ্বর কৃপা ছাড়া কিছু হবার নয়।'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে, পৃঃ ২১-২২—স্বামী সারদানন্দ)।

এমনি কত বিচিত্র পরিবেশে, কত ভাবেই যে তাঁর গান গাইবার বর্ণনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন অধ্যাত্ম বিষয়ে আলোচনার সময় গান। শিক্ষা ও উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে গান। একেক প্রকার ঈশ্বরীয় ভাবের অনুপ্রেরণায় বা উন্মাদনায় গান। শোকে দুঃখে সান্ত্বনাদানের জন্যে গান। মৃন্ময়ী চিন্ময়ীর উদ্দেশ্যে গান। মা কালীর সঙ্গে কথোপকথনে গান। একাকী আপন মনে গান-সঙ্গীতগুণী কিংবা অনুরাগী শ্রোতার অনুরোধে গান। আকস্মিক ভাবাবেগে গান। সমাধিভঙ্গে গান। গান গাইতে গাইতে সমাধি লাভ। শিষ্যদের সাধন প্রসঙ্গে গান—গান শুনিয়ে শক্তিসঞ্চার। কথায় কথায় গান।

সর্ব প্রকারে, সব অবস্থায় গান গেয়েছেন, গান শুনিয়েছেন তিনি।

এমন গায়ক দুর্লভ-দৃষ্টান্ত, সঙ্গীত-ব্যবসায়ী জগতেও। এমন সর্ব উপলক্ষ উপযোগী ধর্মগীতির সংগ্রহ এবং ইচ্ছামাত্রে অনুকূল ভাবের গান পরিবেশনা, লোকোত্তর সাঙ্গীতিক সত্তার পক্ষেই সম্ভব। তাঁর বাণীর তুল্যই তাঁর পূর্ণজ্ঞানের আরেক প্রকাশ। সঙ্গীত তাঁর সত্তায় যেন অঙ্গাঙ্গী। কথার মতন সহজ, অনায়াস। সাবলীল, স্বতঃ-উৎসারিত। তাঁর তাৎক্ষণিক ধ্বনিত হয়ে ওঠা, অন্তর-রশ্মিতে উদ্ভাসিত সুর বাণী। তাঁর ভাব-বার্তার বাহক, প্রকাশক, দ্যোতক—কাব্য আকারে, সুরে সুরে সঞ্জীবিত। শ্রীরামকৃষ্ণের গান তাঁর নন্দন-চিত্তের অন্যতম ব্যঞ্জনা। তাঁর কবি মনের এক বিশিষ্ট প্রকরণ।

তৃতীয় অধ্যায়

কি ধরনের গান তিনি গাইতেন

কোন্ রীতির কিংবা কি ধরনের গান শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতেন, এখন তার কিছু বিবরণ দেওয়া হবে। আর সেই সঙ্গে, তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠ কেমন সুরেলা ছিল, তাল লয় বোধ ইত্যাদি প্রসঙ্গও।

'আমায় রসে বশে রাখিস মা। আমায় শুকনো সন্ন্যাসী করিসনি'—এ প্রার্থনায় আপ্ত কাম তিনি। তাঁর গায়ন স্বভাব নেই রস স্বরূপের এক অভিব্যক্তি। সেই এক আনন্দ রূপের নামান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণ রসিক। তাঁর আন্তর সত্তা নান্দনিক।

সঙ্গীত তাঁর ভাবজীবনের অপরিহার্য বাহন।

গায়ক রূপেও রামকৃষ্ণ বৈচিত্র-বিলাসী। যেমন ধর্মজীবনে, অধ্যাত্ম সাধনে, তেমনি সঙ্গীতেও বিচিত্রের মাধ্যমে তিনি সেই অনন্তরূপী একের উপাসক। কত ভাবেই সে বহুত্ব আর একত্বের কথা বলেছেন তিনি।

তখন তাঁর কণ্ঠের ক্ষত খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্বল হয়ে এসেছে বাক্ শক্তি। গানের ধারা অবরুদ্ধ। তিনি চিকিৎসার জন্যে রয়েছেন শ্যামপুকুরের বাড়িতে।

সে সময় যে একদিন চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলেন দুঃখ করে, 'তাঁর নাম গুণ করতে পাইনা।'

নাম গুণ অর্থ গান করা। সঙ্গীতেই জগন্মাতার আরাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের পরম প্রীতি ও আগ্রহ। সেই প্রাণ প্রিয় গান-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মর্মান্তিক কাতর হয়েছেন।

কিন্তু মহেন্দ্রলাল বললেন, 'ধ্যান করলেই হল।'

বিচিত্রের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিবাদ করে ওঠেন, 'সে কি কথা! আমি একঘেয়ে কেন হব?'

অমনি উপমা দিয়ে বললেন, 'আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোলে, কখনো ঝালে, কখনো অম্বলে, কখনো বা ভাজায়।'

অর্থাৎ 'আমি কখনো পুজো, কখনো জপ, কখনো বা ধ্যান, কখনো বা তাঁর নাম গুণ গান করি, কখনো তাঁর নাম করে নাচি।' (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২২২)।

'তাঁর নাম গুণ গান-'ই রামকৃষ্ণের সঙ্গীত।

নিত্য তাঁর ভগবদ্ সান্নিধ্য। যেমন ধ্যানে ধারণায় মননে, তেমনি সঙ্গীতেও। গানের মধ্যে দিয়েও তাঁর আরাধনা আর ঈশ্বর চিন্তন। তাঁর সব গানই সাধন-সঙ্গীত। গীত-

রহিত থাকা তাই তাঁর পক্ষে অসহনীয়।
যতদিন সেই সঙ্গীতকণ্ঠ মুখর ছিল, বিবিধ বিষয়বস্তুর সমাবেশ হতো তাঁর গানে। অধ্যাত্ম ভাবের সর্ব প্রকার গান গেয়েই তাঁর পরিতৃপ্তি।
তবে তাঁর গানে শ্যামা বিষয়ক পদের প্রাধান্য। অর্থাৎ শ্যামা সঙ্গীত।
শ্রীরামকৃষ্ণের গীত তালিকা প্রস্তুত করলে দেখা যায়, শ্যামাসঙ্গীত তিনি সবচেয়ে বেশি গেয়েছেন। কারণ কালিকা তাঁর 'আদরিণী শ্যামা মা', ইষ্ট দেবী। তিনি সাকার আবার নিরাকার। মৃন্ময়ী হয়েও চিন্ময়ী। ঠাকুরের ধ্যান ধারণায় সাধনে ভজনে কালী ও ব্রহ্ম অভেদ। যখন তিনি নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম আর লীলাকালীন কালী। সেই শ্যামা মায়ের সন্তান বলেই কথিত হতেন নিজে। তাঁর 'মা' ডাকই ধ্বনিত হতো দক্ষিণেশ্বরের সেই ঘরে আর মন্দিরে। সেই কালীবাড়ির বিস্তীর্ণ চত্বর তাঁর প্রিয় 'মা কালীর কেল্লা।'
তাঁর কালী উপাসনার বিষয়ে একদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আর গুপ্ত মহেন্দ্রনাথের মধ্যে কথা হচ্ছিল। মহেন্দ্রলাল তখন প্রথম প্রথম আসছেন শ্যামপুকুরের বাড়িতে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাল-ব্যাধির চিকিৎসা করতে।
সরকার মহেন্দ্রলাল বললেন, 'ইনি (পরমহংসদেব) দেখছি কালীর উপাসক।'
তখন গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, 'তাঁর 'কালী' মানে আলাদা। বেদ যাঁকে পরমব্রহ্ম বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন।·· খৃষ্টান যাঁকে গড বলে, তিনি তাঁকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাঁকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁকে ভগবান বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন।' (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৩৬)
শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও সেকথা বুঝিয়ে বলেছিলেন, একাধিকবার। একদিন নরেন্দ্রকে— 'কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন শক্তি বলে কই। যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বলছ, তাঁকেই কালী বলছি।'
আরেকদিন শ্রীমকে বললেন, 'যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার। সাকাররূপও মানতে হয়। কালীরূপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তার পরে দেখতে পায় যে, সেই রূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। যিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই কালী।
(কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৮৬)
তাই তাঁর গানের মধ্যে কালী বিষয়ক পদাবলী বেশি। আবার শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে তাঁর বেশি প্রিয় রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের রচনা। তাঁরা দুজনেই কালীসাধক এবং সেই ভাবের গীতরচয়িতা। শ্যামাসঙ্গীত রচনাকার হিসাবে উচ্চ দার্শনিক ভাবের

দ্যোতনায় তদনুসারী বাণী ও সুরের সম্মিলনে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত উভয়েই অতুলনীয়। দুজনের মধ্যে হয়ত রামকৃষ্ণের প্রিয়তর পদকর্তা রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদী গান তিনি সবচেয়ে বেশি গেয়েছেন। একদিন গায়ক নীলকণ্ঠকে বলেও ছিলেন, 'রামপ্রসাদ সিদ্ধ। তাই তাঁর গান ভাল লাগে।' (প্রথম ভাগ, পৃঃ ২০৯) আবার আরেকদিন বলেছেন, 'গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়।' (প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫০)।

একদিন তিনি শ্রীম-কে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানেরই বই আনতে বলেছিলেন, ডাক্তার মহেন্দ্রলালকে দেবার জন্যে।

শ্রীম. বই দুখানি আনলে, রামকৃষ্ণ বললেন, 'এই সব ভাব ওর মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে।'

মনে রাখা যায়, মাইকেল মধুসূদনকে তিনি শুনিয়েছিলেন কেবল রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গান। সম্পূর্ণ অপরিচিত ও সুবিখ্যাত ব্যক্তিকে সেই তাঁর প্রথম গান শোনানো।

রামপ্রসাদী ও কমলাকান্তের গীতি রীতির কথা পরে আলোচনার প্রয়োজন হবে। এখানে তাঁর গীতিকারদের প্রসঙ্গ। অর্থাৎ যাঁদের রচনা গান গাইতেন রামকৃষ্ণ।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ভিন্ন আরো বহু রচয়িতার গান গেয়েছেন তিনি। অধ্যাত্ম বিষয়ে পদ রচনায় বিখ্যাত তাঁরা। বাংলা গানের ক্ষেত্রে তাঁদের রচিত গীত সেকালে রীতিমত প্রচলিত ছিল। তাঁরা অনেকেই শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা।

এমনি যাঁদের গান রামকৃষ্ণ গাইতেন, তাঁরা হলেন—দাশরথি রায় (স্বনামধন্য পাঁচালি-কার, গায়ক, গান রচয়িতা। তাঁর গান—'জীব সাজ সমরে', 'আমার কি ফলের অভাব, 'দোষ কারো নয় গো মা স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা', 'ভব শ্রীকান্ত নর-কান্তকারীরে'; 'এ কি বিকার শঙ্করী')। রাজা নরচন্দ্র রায় ('সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তাঁরা তুমি'; 'এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে')। নরেশ-চন্দ্র ('শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুঁড়িখান উড়িতেছিল'; 'নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা মা তোমার')। পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ('এস মা এস মা ও হৃদয়-রমা'; 'আনন্দ বদনে বল মধুর ব্রহ্ম নাম'; 'হরিরস মদিরা পিয়ে')। মহারাজা নন্দকুমার ('ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনী')। দেওয়ান রঘুনাথ রায় (বাংলার অন্যতম আদি খেয়াল গায়ক ও চার তুকের বাংলা খেয়ালাঙ্গ গান রচনাকার। বর্ধমান মহারাজার দেওয়ান। তাঁর জন্ম ১৭৫০ সালে ও মৃত্যু ১৮৩৬-এ অর্থাৎ ৮৬ বছর বয়সে। তিনি বহু শ্যামাসঙ্গীত ও কৃষ্ণ বিষয়ক গানের রচয়িতা। 'অকিঞ্চন' ভণিতায় তাঁর বহু গান রচনা। যথা—'পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী')। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। ত্রৈলোক্য

নাথ সান্যাল (তাঁর রচনায় উল্লেখ গানের প্রসঙ্গেই করা হয়েছে)। গোবিন্দ অধিকারী (তাঁর গানও উল্লিখিত) প্রভৃতি।

রামপ্রসাদের সমস্ত গানই রামপ্রসাদ বা প্রসাদ ভণিতাযুক্ত। সেজন্যে নাম করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কমলাকান্তের অনেক গানে ভণিতা না থাকায় জানিয়ে দেয়া হলো এখানে—তাঁর এই গানগুলি রামকৃষ্ণ গেয়েছেন, কোনো কোনোটি একাধিকবার—'শ্যামা মা কি আমার কালো রে', 'শ্যামাধন কি সবাই পায়', 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে'; 'সদানন্দময়ী কালী'; 'শ্যামা কি কল করেছে'; 'কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা', 'আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে')। তাঁর মজ্‌লো আমার মন ভ্রমরা'র উল্লেখ গানের প্রসঙ্গেই করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণের গাওয়া গানের বিবরণে দেখা যায়, অধিকাংশই শ্যামাসঙ্গীত। একটি কীর্তনাঙ্গ কালীগীতি। কিন্তু তিনি কীর্তন গানও অনেকদিন গেযেছেন। বহু কীর্তন, তাব মধ্যে অনেকগুলি অতি দীর্ঘাকার, জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর কৃষ্ণলীলাব রসাস্বাদন কীর্তন সঙ্গীতে। ভগবদ্ ভাবের উদ্দীপন জাগাবার এমন গীতিরীতি স্বভাবতই তাঁব প্রিয়। তিনিও শ্রীচৈতন্যের তুল্য কীর্তনে বিভোর। তবে চৈতন্যের নাম সংকীর্তনই বেশি। আর রামকৃষ্ণের যত কীর্তন প্রসঙ্গ পাওয়া গেছে, সবই লীলাকীর্তন। বিভিন্ন পদকর্তার কৃষ্ণলীলা বিষযে পদাবলী কিংবা গৌরাঙ্গ স্তুতির তিনি ভাবোন্মত্ত গায়ক। রাধাভাবে, গোপীভাবের কীর্তনে প্রেমোন্মাদ হন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ঈশ্বর নাম গুণ গানের এক বিশিষ্ট অঙ্গ—কীর্তন সঙ্গীত।

রামকৃষ্ণের কীর্তনের মূল্যবান আলোচনা তথা বিশ্লেষণ করেছেন দত্ত মহেন্দ্রনাথ। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম অনুজ তিনি। তাঁদের আত্মীয় এবং রামকৃষ্ণের পরম গৃহী ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে মহেন্দ্রনাথ বহুবার রামকৃষ্ণকে কীর্তন গাইতে দেখেছেন। লক্ষ্য করেছেন তাঁর কীর্তনের অঙ্গাঙ্গী নৃত্যও। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক, অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন মনীষী দত্ত মহেন্দ্রনাথ সেই কীর্তন ও নৃত্যের এইভাবে বর্ণনা করেছেন—আর সেই সঙ্গে দর্শক শ্রোতাদের ওপর তাঁর নৃত্য গীতের প্রভাবও—

'কিন্তু পরমহংস মশাইয়ের কীর্তনের মধ্যে অন্য এক প্রকার ভাব দেখিতাম। ভাবের আধিক্য হওয়ায় তাঁহার অঙ্গ সঞ্চালন হইত, কখনো বা দেহ নিস্পন্দ হইয়া যাইত। সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে এক প্রকার আভা বাহির হইত। মুখের শ্রী যেন দেখিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু তাহা এত গম্ভীর, উচ্চ ও অসাধারণ যে তাহা অনেকক্ষন দেখিতেও পারা যাইত না। দেখিতাম যে, কীর্তনের সময় ভাবলোকের বিষয়, শব্দ না দিয়া, অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেন। ভাবসকল যেন পুঞ্জীভূত ও জীবন্ত হইয়া তাঁহার দেহ ও সূক্ষ্ম স্নায়ুপুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করিত এবং সেইজন্য তাঁহার অঙ্গ

সঞ্চালন হইত। অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা যে মানের উচ্চতর ভাব প্রকাশ করা যায়, তাহা এই প্রথম দেখিয়াছিলাম। গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেরও ঠিক এইরূপ হইত।

সাধারণ লোকের কীর্তন হইল 'গতি' হইতে 'ভাব'-এ—From motion to ideas. পরমহংস মশাইয়ের কীর্তন হইল—ভাব হইতে গতিতে—From ideas to motion. এইজন্য সাধারণ লোকের কীর্তন ও নৃত্যের সহিত তাঁহার কীর্তন ও নৃত্যের বিশেষ পার্থক্য আছে। সাধারণ লোকের নৃত্য হইল 'নর-নৃত্য।' পরমহংস মশাইয়ের নৃত্য হইল 'দেব নৃত্য', যাহাকে চলিত কথায় বলে 'শিবনৃত্য'। ইহার সহিত চপল ভাবের কোনো সংস্রব নাই। ইহা হইল অতি উচ্চ মার্গে অবস্থানের কথা বা উচ্চ অবস্থার কথা। এই নৃত্য দেখিতে দেখিতে সকলেই নিশ্চল ও বিভোর হইয়া যাইত; যেন সকলের মনকে তিনি একেবারে ভাবলোকে লইয়া যাইতেন। অত লোক থাকিলেও কেহই কথাবার্তা বা নড়াচড়া করিতে পারিতনা; সকলেই যেন নির্বাক, নিস্পন্দ পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া থাকিত, সকলেই অভিভূত ও তন্ময় হইয়া পড়িত, সকলেরই মন তখন উচ্চস্তরে চলিয়া যাইত।...এই সময় পরমহংস মশাইয়ের দেহ হইতে আর একটি ভাবদেহ বিকাশ পাইত। ইহা যে কত বড় উচ্চ অবস্থার বিষয় তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারিত না; কিন্তু ইহা সে অতি উচ্চ অবস্থার বিষয়—এইটা সকলেই অনুভব করিত। পরমহংস মশাই যেন ভাবমূর্তি ধারণ করিতেন এবং স্বয়ং চাপ-জমাট ভাবমূর্তি হইয়া, সকলের ভিতর, অল্পবিস্তর, সেই ভাব উদ্বোধিত করিয়া দিতেন।... কীর্তনেও যে গভীর ধ্যান হয়, এইটি সর্বদা অনুভব করিতাম। এইজন্য, কীর্তনের সময়, কি গীত বা ভজন গান হইত, গানের ভাষাই বা কি, তাহা কাহারও স্মরণ থাকিত না, বা আনুষঙ্গিক অন্য কোনো ব্যাপারের বিষয়ও মনে থাকিত না। সকলের দৃষ্টি পরমহংস মশাইয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকিত। পরমহংস মশাই কিরূপে স্তরে স্তরে নরকায় হইতে দেব দেহে যাইতেছেন এবং কিরূপে এই দেহের প্রক্রিয়া হয় বা শক্তি বিকীরণ হয় তাহাই সকলে লক্ষ্য করিতাম। বেশ স্পষ্ট দেখিতাম যে, সাধারণ মানুষের অবস্থা হইতে কয়েক মিনিটের ভিতর তিনি অপর এক ভাব ধারণ করিয়া অন্য এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন।...একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করিতাম যে, কীর্তনকালে পরমহংস মশাইয়ের পদ সঞ্চালন প্রথম যে পরিধির ভিতর হইত, তাহার পর উহা এক ইঞ্চি আগেও যাইত না বা পিছনেও যাইত না, ঠিক যেন কাঁটায় কাঁটায় মাপ করিয়া তাঁহার পদ সঞ্চালন হইত।...পরমহংস মশাইয়ের এই কীর্তন হইল—সবিকল্প সমাধি। এই সময় পরমহংস মশাইয়ের ঘাড় ডান দিকে একটু বাঁকিয়া যাইত এবং তিনি হাত দুইটি সম্মুখে প্রসারিত করিয়া সুমুখ ও পিছনে চলাচল করিয়া স্থির হইয়া এক

স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, একেবারে নিস্পন্দ ও নিশ্চল। সবিকল্প সমাধি হইতে তিনি নির্বিকল্পসমাধিতে যাইতেন। সাধারণ ভাষায় ইহাই হইল পরমহংস মহাশয়ের কীর্তন।...ইহা এক স্বতন্ত্র ব্যাপার।...এই কীর্তন সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে হইলে, প্রত্যেকেই ইহা নিজে চিন্তা বা ধ্যান করিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ ইহা ভাষার ব্যাপার নয়।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, পৃঃ ১৫১-১৫৭ মহেন্দ্র-নাথ দত্ত)।...

তাঁর নৃত্যের আরেকটি বিশিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিচারণে। রামকৃষ্ণকে তিনি দ্বিতীয়বার দেখেন সেদিন, মণিলাল মল্লিকদের সিঁদুরিয়াপটির বাড়িতে। বহু ভক্ত, দর্শনার্থীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ তখন কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা, নৃত্যপর। তাঁর সেই ভাবৈশ্বর্যময় দিব্য প্রেমোজ্জ্বল রূপ সারদানন্দের মনে চিরদিনের জন্যে অঙ্কিত হয়ে যায়। নৃত্যকালীন রামকৃষ্ণের মাধুর্যময় অপূর্বত্ব এই ভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি—'তাঁহার হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব দিব্য জ্যোতি ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যের সহিত সিংহের বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব নৃত্য। তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্রাসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি নাই বা অঙ্গ সংযম-রাহিত্য নাই, আছে কেবল আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য ও উদ্যমের সম্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি। নির্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্য যেমন কখন ধীরভাবে এবং কখন দ্রুত সন্তরণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের সেই নৃত্য যেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি যেন আনন্দ সাগররূপ ব্রহ্ম স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গ সংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন।...বোধ হইতেছিল যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এক দিব্যোজ্জ্বল আনন্দধারা চতুর্দিকে প্রসৃত হইয়া যথার্থ ভক্তকে ঈশ্বর দর্শনে, মৃদু বৈরাগ্যবানকে তীব্র বৈরাগ্য লাভে, অলস মনকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য প্রদান করিতেছিল এবং ঘোর বিষয়ীর মন হইতেও সংসারাসক্তিকে সেইক্ষণের জন্য কোথায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার ভাবাবেশ অপরে সংক্রামিত হইয়া তাহাদিগকে ভাব বিহ্বল করিয়া ফেলিতেছিল এবং তাঁহার পবিত্রতায় প্রদীপ্ত হইয়া তাহাদের মন যেন কোন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে আরোহণ করিয়াছিল।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী সারদানন্দ)।

রামকৃষ্ণের আরো কদিনের কীর্তন ও নৃত্য বর্ণনা উদ্ধৃত করা হলো এখানে। কীর্তন গান ও নৃত্য তাঁর অঙ্গাঙ্গী সাধন। যখনই তিনি স্বয়ং কীর্তন গেয়েছেন কিংবা অপরের কীর্তন শুনেছেন, স্বতঃই নৃত্যপর হয়েছেন। তন্ময়চ্ছন্দে নিবেদন করেছেন অন্তরের ভক্তিভাব। আর তা সঞ্চারিত করে দিয়েছেন ভক্তমণ্ডলী ও শ্রোতাদের চিত্তে।

তিনি কীর্তনের আসরে উপস্থিত থেকেছেন অথচ নৃত্য করেন নি, এমন ঘটেছে কদাচিৎ। কীর্তনের তুল্য নৃত্যও শ্রীরামকৃষ্ণের নন্দন সত্তার এক মনোরম রূপ।

একদিন কেশবচন্দ্র পার্ষদদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন (পয়লা জানুয়ারী, ১৮৮১)। 'এদিকে সঙ্কীর্তনের আয়োজন হইতেছে। অনেকগুলি ভক্ত যোগ দিয়াছেন। পঞ্চবটী হইতে সঙ্কীর্তনের দল দক্ষিণ দিকে আসিতেছে। হৃদয় শিঙা বাজাইতেছেন। গোপীদাস খোল বাজাইতেছেন আর দুই জন করতাল বাজাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন—

হরিনাম নিস রে জীব যদি সুখে থাকবি।
সুখে থাকবি বৈকুণ্ঠে যাবি, ওরে মোক্ষ ফল সদা পাবি ॥
(হরিনামের গুণে রে)
যে নাম শিব জপেন পঞ্চমুখে
আজ সেই হরিনাম দিব তোকে।
(দয়াল নিতাই ডাকে রে) ॥
নারদ ঋষি দিবানিশি যে নাম বীণা যন্ত্রে গান করে ।
(ও জীব আয়রে কে পারে যাবি আয় রে) ॥
হরি নামের ডোর ঘাটে বাঁধা রে।
আমার প্রেমদাতা নিতাই ডাকে ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। এইবার সমাধিস্থ হইলেন।...'

(কথামৃত, পঞ্চম ভাগ পৃঃ ২১১)।

একদিন ঠাকুর কলুটোলায় এসেছেন, নবীন সেনের বাড়িতে। কেশবচন্দ্রের অগ্রজ তিনি। কেশব তার কয়েক মাস আগে স্বর্গত। তাঁর জননী রামকৃষ্ণকে সেদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্তও এসেছিলেন সেখানে।

প্রথমে ব্রাহ্ম ভক্তদের রামকৃষ্ণ এই গান দুখানি শোনালেন—'ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়' ও 'ডুব ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।'

তারপর তাঁদের গাইতে বললেন—'তুমি সর্বস্ব আমার (হে নাথ) প্রাণাধার সারাৎসার' এই গানখানি।

শেষে নিজে গাইলেন কীর্তন—

যশোদা নাচাত গো মা বলে নীলমণি
সে রূপ লুকালে কোথা করাল বদনী।
(একবার নাচ গো শ্যামা) (আসি ফেলে বাঁশি লয়ে)
(মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা লয়ে) (তোর শিব বলরাম হোক)

(তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ গো শ্যামা)

(যেরূপ ব্রজধামে নেচেছিলি)

(একবার বাজা গো মা তোর মোহন বেণু)

(যে বেণু রবে গোপীর মন ভুলিত)

(যে বেণু রবে ধেনু ফেরাতিস)

(যে বেণু রবে যমুনা উজান বয়)

গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন আকুল হত।

বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর নবনী ;
এলায়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী।
শ্রীদামের সঙ্গে, নাচিতে ত্রিভঙ্গে, গো মা,
আবার তাথৈয়া তাথৈয়া, তাতা থৈয়া থৈয়া, বাজত নূপুর ধ্বনি ;
শুনতে পেয়ে আসত ধেয়ে যত ব্রজের রমণী (গো মা)।

'এই গান শুনিয়া কেশব ঐ সুরের একটি গান বাঁধাইয়া ছিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তরা খোল করতালি সংযোগে সেই গান গাইতেছেন—

কত ভালবাস গো মা মানব সন্তানে,
মনে হলে প্রেমধারা বহে দু নয়নে।...'

তারপর আবার রামকৃষ্ণ কীর্তন আরম্ভ করলেন ও ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন। এবার গাইলেন এই কখানি কীর্তন—

(১) মধুর হরিনাম নিস্ রে জীব যদি সুখে থাকবি
(২) গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়
(৩) ব্রজে যাই কাঙ্গাল বেশে কৌপীন দাও হে ভারতী
(৪) গৌর নিতাই তোমরা দু ভাই পরম দয়াল হে প্রভু
(৫) হরি বলে আমার গৌর নাচে
(৬) কে হরিবোল্, হরিবোল্ বলিয়ে যায়
(৭) যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝুরে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে...

(কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৯৫-১৯৬)

এইভাবে সেদিন তিনি আটখানি কীর্তন গাইলেন।

একদিন গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে দুখানি কীর্তন শোনালেন—

'নদে টলমল টলমল করে গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে' ও 'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝুরে।'...

অধরলাল সেনের বাড়িতেও একদিন দুটি কীর্তন গাইলেন—

'ভুবনরঞ্জন রূপ নদে গৌর কে আনিল রে' ও 'শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই।'… সেদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে এসেছেন অদ্বৈত বংশের রাধিকা গোস্বামী। তাঁর অনুরোধে রামকৃষ্ণ দুখানি কীর্তন গাইলেন—'আমার অঙ্গ কেন গৌর হল' আর 'গোরা চাহে বৃন্দাবন পানে ধারা বহে দু নয়নে।' তার বিবরণ আগের অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে।

তাঁর আরো নানা দিনে কীর্তন গানের উল্লেখ পাওয়া যায়, সব উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। বেশ বোঝা যায় যে, অনেক কীর্তন পদ তাঁর জানা ছিল। আর তিনি অভ্যস্তও ছিলেন কীর্তন গানে।

এই গানের রীতিনীতি সম্পর্কে রামকৃষ্ণের যে ধারণা ছিল, তা বোঝা যায় তাঁর আখর দেওয়া থেকে। যেমন নিজের কীর্তনে তিনি আখর যোগে গাইতেন, তেমনি অন্যের গানেও উপযুক্তভাবে আঁখর দিতেন। প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

সঙ্গীত জগতে বাংলার নিজস্ব দান কীর্তন সঙ্গীত। এই বিশিষ্ট গান শুধু ভক্তিভাবের বাহন নয়, একটি নিপুণ গীতি-রীতি। কীর্তন গানের পদ ও পালা, সুর ও তালের বিশেষত্ব আছে। নানা রাগেরও প্রয়োগ দেখা যায় কীর্তনে, যদিও তা রাগ-সঙ্গীতের ধরনে নয়। শতাধিক তাল প্রচলিত আছে কীর্তনে, তার মধ্যে কয়েকটি বেশ বড় এবং জটিল।

কীর্তনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, পদের দুরূহ ভাবকে সহজ সরল কথায় সুরে ও তালে বুঝিয়ে দেয়া। এই কথার যোজনার নামই অলঙ্কার বা আখর বা কাটান। রবীন্দ্রনাথ আখরের সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন—'কথার তান' বলে। আখর বা কাটানের কয়েকটি স্তর আছে, তা অতিক্রম করতে হয় নির্দিষ্ট রীতিতে। তার শেষ স্তরে পৌঁছে পুনরায় সেই পথে মূল পদে ফিরে আসার নিয়ম।

কীর্তন গানের এইসব আখর, অনেক সময়েই, পদ-রচয়িতার মূল বাণী নয়। গায়কের নিজস্ব এবং প্রায়স তাৎক্ষণিক রচনা—আখর। কীর্তনীয়ার মুন্সীয়ানার পরিচয় দেয় তাঁর আখর দেওয়ার শক্তি। গানের সৌন্দর্য, মাধুর্যও বৃদ্ধি করে গানকে শ্রোতাদের কাছে আরো চিত্তাকর্ষক করে। উপযুক্ত আখর যুক্ত হয় গায়ক কবি-প্রাণ হলে। তা ছাড়া, কীর্তনের মূল বাণীর সঙ্গে আখর যোগ করতে সুর তাল লয়ের সঙ্গে সঙ্গতিও রাখা প্রয়োজন। রামকৃষ্ণদেবের যে সে যোগ্যতা ছিল, তা তাঁর আখর দেবার নানা দৃষ্টান্তে সুপ্রকাশ।

একদিন অধরলাল সেনের বাড়িতে কীর্তনের আসর বসেছে। কীর্তন গাইছেন বৈষ্ণবচরণ—

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব নটবর তপতকাঞ্চনকায়…

রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। আবার বসে আখর দিচ্ছেন—'একবার হরি বল রে।'…

আবার কীর্তনীয়া অন্য গান গাইছেন—

হরি বলে আমার গৌর নাচে…

তখন রামকৃষ্ণ আখর দিচ্ছেন ও নৃত্য করছেন—'প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নাচে রে…'

তারপর নরেন্দ্র যখন গান ধরেছেন—

হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।
লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে॥

তখন রামকৃষ্ণ আখর দিচ্ছেন—

প্রেমে মত্ত হয়ে হরি হরি বলি কাঁদ রে।

ভাবে মত্ত হয়ে—হরি হরি বলি কাঁদ রে।…

একদিন বলরামের বাড়িতে বৈষ্ণবচরণ গাইছেন—

আমার গৌর নাচে।
নাচে সংকীর্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে॥…

রামকৃষ্ণ আখর দিচ্ছেন—

নাচে সংকীর্তনে (শচীর দুলাল নাচে রে)।
(আমার গোরা নাচে রে)
(প্রাণের গোরা নাচে রে)……

আরেকদিন সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাগান-বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে। রাধাকৃষ্ণের মিলনের গান গাইছেন কীর্তনীয়ারা।

রামকৃষ্ণ আখর দিচ্ছেন—

ধনি দাঁড়ালো রে।
অঙ্গ হেলাইয়া ধনি দাঁড়ালো রে।
শ্যামের বামে ধনি দাঁড়ালো রে।
তমাল বেড়ি বেড়ি ধনি দাঁড়ালো রে…

সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে সেদিন শরতের মহোৎসব।

সজ্জিত সমাজ গৃহে, বহু ভক্তের সামনে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল গাইছেন। বাজছে খোল করতাল।

আর রামকৃষ্ণ সমানে আখর দিচ্ছেন—

'নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে;
আপনি নেচে নাচাও গো মা;

(আবার বলি) হৃদ্‌পদ্মে একবার নাচ মা ;
নাচ গো ব্রহ্মময়ী সেই ভুবনমোহন রূপে।'…

আরেকদিন সুরেন্দ্র মিত্রের শিমুলিয়া ভবনে কীর্তনের আসর বসেছে। কীর্তনীয়ারা গৌরাঙ্গের রূপের বর্ণনা করে গাইছেন—

লাখবান কাঞ্চন জিনি,
রসে ঢর ঢর গোরা মুজাঙ্‌ নিছনি ॥…

রামকৃষ্ণ আখর দিচ্ছেন কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করে—

(সখি ! রূপের দোষ না মনের দোষ ?)
(আন্‌ হেরিতে শ্যামময় হেরি ত্রিভুবন)…

অন্যের গানে এমনিভাবে তিনি আখর দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত আখর যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনি যথাযোগ্য, সুসমঞ্জস। অভ্যস্ত কীর্তন-ব্যবসায়ীদের মতন রামকৃষ্ণের পটুত্ব দেখা যায় তাৎক্ষণিক আখর রচনায়। তাদের মূল গানের সঙ্গে যুক্ত করে দেবার নৈপুণ্য। রামকৃষ্ণ যখনই কোনো কীর্তনের আসরে থেকেছেন, মাত্র শ্রোতা হয়ে আর থাকতে পারেন নি। আখরের পর আখর যোগ করেছেন সেই গানের ভাবে তদ্‌গত হয়ে। নিজে যখন কীর্তন গায়ক, তখনো আখর দিয়ে গেয়েছেন।

আর তাঁর নৃত্য। যখনই অপরের কীর্তন তাঁর প্রাণে মনে প্রিয় হয়েছে, তিনি নৃত্য আরম্ভ করেছেন ভাবে মত্ত হয়ে। নিজের কীর্তন গানেও যে মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য করেছেন, তাও তাঁর প্রায় সব কীর্তন আসরেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই দিব্য কীর্তনানন্দ ও ভাবোন্মত্ত নৃত্যের একমাত্র পূর্ব-দৃষ্টান্ত—শ্রীচৈতন্য। দুই অবতারের নৃত্য—মহাভাবে।

কীর্তন গানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রামকৃষ্ণের নৃত্য। নিজে যখন কীর্তন গেয়েছেন কিংবা কোনো কীর্তনীয়ার গান শুনেছেন অথচ নৃত্য করেন নি, এমন বিশেষ দেখা যায় নি। ভাবমুখে তাঁর প্রাণ স্ফূর্তি পেয়েছে দেহের তটে, নৃত্য লহরীতে। যেমন কীর্তন-সঙ্গীতের আসরে, তেমনি ঘরের মধ্যে কারো সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গেও। অধ্যাত্ম-কথা থেকে কীর্তন ও নৃত্যের সূত্রপাত হয়েছে।

ঠাকুরের সব কথাই তো ঈশ্বরীয় বিষয়ে। সেদিনও মহেন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে কথা বলছিলেন—'তাঁর প্রেমের একবিন্দু যদি কেউ পায় কামিনী কাঞ্চন অতি তুচ্ছ বলে বোধহয়। মিছরির পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা তুচ্ছ হয়ে যায়। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করলে, তাঁর নামগুণ সর্বদা কীর্তন করলে—তাঁর উপর সেই ভালবাসা ক্রমে হয়।'

এই বলেই কীর্তন গাইতে আরম্ভ করলেন—

সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে,

বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
(নিমাই নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে।)...

বন্ধনীর মধ্যেকার বাক্যটি—আখর। এমনি আখর সহযোগে গানের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন রামকৃষ্ণ। ঘরে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি কেবল মহেন্দ্রনাথ। সকালবেলা। স্থান—দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সেই ঘরটিতে।

আবার পাণিহাটীর সেই বিরাট বৈষ্ণব মহোৎসবেও।

কীর্তনের সঙ্গে নৃত্যে যে তিনি প্রাণের কি তীব্র আবেগে মেতে ওঠেন তার এক জীবন্ত উদাহরণ দেখা যায় সেখানে।

শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন মহা ধুমধামের এই উৎসব, পেনেটির রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও রাঘব মন্দিরকে কেন্দ্র করে: রামকৃষ্ণের সাড়ে তিন শ বছর আগে শ্রীচৈতন্য-শিষ্য রঘুনাথ এ মহোৎসবের প্রবর্তক। তারপর রাঘব পণ্ডিত তা প্রতি বছর পালন করে যান।

সেবার (১৮৮৩, জুন ১৮) রামকৃষ্ণ চলেছেন পেনেটিতে। দক্ষিণেশ্বর থেকে সপার্ষদ তিনি যাত্রী। ঘোড়ার গাড়িতে তাঁর সঙ্গে আছেন রামচন্দ্র দত্ত, রাখাল ঘোষ, মহেন্দ্র গুপ্ত, ভবনাথ, আরো দু'একজন।

পথে এতক্ষণ রামকৃষ্ণ সকলের সঙ্গে হাসি রহস্য করে কথাবার্তা বলছিলেন।

কিন্তু গাড়ি উৎসবের জায়গায় পৌঁছবামাত্র, একলা নেমে পড়লেন তিনি। আর রামচন্দ্র প্রমুখ দেখলেন—ঠাকুর তীরবেগে ছুটে গেলেন সংকীর্তনের দিকে। এত দ্রুত তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন যে পরিজনবর্গ তাঁর সঙ্গী হতে পারলেন না। তাঁদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে থেকে লোকারণ্যে হারিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ।

রাম দত্ত, রাখাল, মহেন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ সন্ধান করবার পর দেখতে পেলেন তাঁকে। নবদ্বীপ গোস্বামী তখন সদলে সংকীর্তন করতে করতে রাঘব মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন। সেই পথে কাতারে কাতারে লোক। তারই মধ্যে দিয়ে রামকৃষ্ণ তীরের মতন এসে পড়েছেন। নৃত্য আরম্ভ করেছেন সংকীর্তন দলের সঙ্গে।

রাম দত্তরা এসে দেখেন—তিনি ভাবে মত্ত হয়ে নাচছেন আর মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হচ্ছেন।

'পাছে পড়িয়া যান শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামী সমাধিস্থ দেখিয়া তাঁহাকে অতি যত্নে ধারণ করিতেছেন। আর চতুর্দিকের ভক্তেরা হরিধ্বনি করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প ও বাতাসা নিক্ষেপ করিতেছেন ও একবার দর্শন করিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছেন!

ঠাকুর অর্ধ বাহ্যদশায় নৃত্য করিতেছেন। আবার বাহ্য দশায় গান ধরিলেন—

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, ঐ তারা তারা দু' ভাই এসেছে রে।
যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা তারা দু' ভাই এসেছে রে।

(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়) (যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)।...
সংকীর্তন মধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য চতুর্দিকে লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইতেছে। ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নাচিতেছেন, কেহ কেহ ভাবিতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হইলেন!...
ঠাকুর আবার গান ধরলেন—

নদে টলমল টলমল করে গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে।

সংকীর্তন তরঙ্গ রাঘব মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে পরিক্রমণ ও নৃত্য করিয়া ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে প্রণাম করিয়া...শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ির দিকে এই তরঙ্গায়িত জনসঙ্ঘ অগ্রসর হইতেছে।...
ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আঙ্গিনায় আবার নৃত্য করিতেছেন কীর্তনানন্দে গর্গর মাতোয়ারা।...' (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২২-২৩)।

কীর্তনে ও নৃত্যে তিনি এমনিভাবে আপনি মেতেছেন। সেই সঙ্গে মাতিয়েছেন সকলকে। আর যখন নিজে গান গেয়েছেন, তাঁর বেশির ভাগ গানের এই প্রভাব দেখা গেছে। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর গান শুনে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবজীবনে শ্যামাসঙ্গীত যে কত প্রিয় তা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন উদাহরণ যোগে দেখানো হলো, কীর্তনেও তাঁর প্রীতির পরিচয়।
কীর্তন সঙ্গীত জনসাধারণেরও প্রিয়। তার কারণ কি—
একথা আলোচনার মধ্যে একদিন নরেন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'করুণ বলে তাই অত—লোকে ভালবাসে।'
শ্রীরামকৃষ্ণকে গায়ক-রূপে নানা রীতির গানেই অধিকারী দেখা গেল। যেমন কীর্তনে, তেমনি শ্যামাসঙ্গীতে, ভজনে কিংবা অন্যান্য অধ্যাত্ম তত্ত্বের গানে। কি রামপ্রসাদী, কি কমলাকান্ত বা দাশরথি বা অন্য গীতিকারের রচনায় যা তিনি গেয়েছেন, শ্রুতিমধুর হয়েছে। তৃপ্তি পেয়েছেন মাইকেল মধুসূদন, কেশব সেন, গিরিশ ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শশধর তর্কচূড়ামণি, ত্রৈলোক্য সান্যাল। নরেন্দ্র-তুল্য ওস্তাদী শিক্ষাপ্রাপ্ত, মার্জিতকণ্ঠ গায়ক যে তাঁকে অনুরোধ করে বিশেষ কোনো গান শুনেছেন, তা শুধু গুরুভক্তিতে নয়, রামকৃষ্ণের সঙ্গীতগুণে।...
প্রখ্যাতনামা গায়ক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় কিংবা বৈষ্ণবচরণ, নরোত্তম, বনোয়ারী, শ্যামাদাস বা সহচরী প্রমুখ কীর্তন গায়ক গায়িকার সামনে তিনি সপ্রতিভ ভাবে গান শুনিয়েছেন। কখনো বৈষ্ণবচরণের মতন কীর্তনীয়ার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আসরে গান গেয়েছেন সমান তালে।
অথচ তিনি তো প্রচলিত অর্থে গায়ক নন। গায়ক ব্যবসায়ও তাঁর নয়। ধর্ম-জগতের

এমন এক মহাপুরুষ তিনি, সকলকে ঈশ্বরমুখীন করবার জন্যে যাঁর আবির্ভাব।
কিন্তু গায়কের যা প্রধান গুণ—রঞ্জিনী-শক্তিতে শ্রোতাদের মোহিত করা, গানের ভাব শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত করা, তাঁর ছিল পূর্ণমাত্রায়।
কেমন গায়ক ছিলেন তিনি? কেন তাঁর গান এত চিত্তরঞ্জক হতো? তার কিছু বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর নানা দিনের গানের একজন শ্রোতা। তাঁর তখনকার নাম শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পরে রামকৃষ্ণের অন্যতম বিশিষ্ট সন্ন্যাসী শিষ্য, স্বামী সারদানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে সারদানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারও করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দীর্ঘকালীন সম্পাদকও হন তিনি। 'উদ্বোধন' ভবনের প্রতিষ্ঠাতা, রামকৃষ্ণদেবের বিস্তৃত জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' লেখক প্রভৃতি তাঁর নানা পরিচয়। কিন্তু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য কথা এই যে, সারদানন্দ একজন সুকণ্ঠ গায়ক। রামকৃষ্ণের কাছে প্রথম আসা যাওয়ার আগে থেকেই সঙ্গীতচর্চায় অভ্যস্ত ছিলেন তিনি।
রামকৃষ্ণের গানের কথায় সারদানন্দ জানিয়েছেন, 'আর ঠাকুরের সেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান। সে গান যে একবার শুনিত, সে কখন ভুলিতে পারিত না।... গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটি আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্মস্পর্শী মধুর স্বরে যথাযথ প্রকাশ করা এবং তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সঙ্গীত জগতের প্রাণ, একথা যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার তাল লয়ে বিশুদ্ধ না হইলে এই ভাব যে আত্মপ্রকাশে বাধা পাইয়া থাকে—একথা ঠাকুরের মুখ নিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলনা করিয়া বেশ বুঝা যাইত। রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, তখন ঠাকুরকে ডাকাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন।... ঠাকুরের মধুর গীত ভাল লাগিবার আর একটি কারণ ছিল। গান গাইবার সময় তিনি গীতোক্ত ভাবে নিজে এমন মুগ্ধ হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্য গাহিতেছেন একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন।...তাঁহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে তিনি যথার্থই ভাবিতেন, এই ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং ইহার কিছু মাত্র তাঁহার প্রাপ্য নহে। হৃদয় বলিত, এই কালে গীত গাহিতে গাহিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত...।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৯৯-১০০। স্বামী সারদানন্দ)।
সারদানন্দ কেবল গায়ক ছিলেন না। তিনি তবলায় ঠেকা দিতেও শেখেন বিবেকানন্দের কাছে। সেজন্যে, রামকৃষ্ণের গানে যে তাল লয় যথাযথ ছিল, সারদানন্দের এই মন্তব্য লক্ষণীয়।
রামকৃষ্ণের শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন যে সঙ্গীতবিদ ছিলেন, সেকথা আগেও উল্লেখ

করা হয়েছে। তাল লয়ে অপটু হলে তাঁর গান যে ব্যর্থ বোধ হতো, একথা বলা বাহুল্য।

সঙ্গীতজ্ঞ সারদানন্দের মতে, গানের অন্তর্নিহিত ভাবে রামকৃষ্ণ স্বয়ং মুগ্ধ হতেন এবং তদ্‌গত চিত্তে সেই ভাবকে মূর্ত করে তুলতেন। সেজন্যেই শ্রোতাদের অভিভূত করত তাঁর গান।

কিন্তু শুধু তন্ময় হয়ে, অত্যন্ত দরদের সঙ্গে গাওয়াই নয়। রামকৃষ্ণের কণ্ঠ ছিল অতি সুরেলা, সুমিষ্ট। শ্রোতাদের মোহিত করবার তাও এক প্রধান কারণ।

তাঁর গান গাইবার সর্বাধিক বিবরণ দিয়েছেন শ্রীম. অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি নিজেও গায়ক। আর প্রায় প্রতিবারই তিনি উল্লেখ করেছেন রামকৃষ্ণের কণ্ঠ-মাধুর্যের কথা। বিশেষণ দিয়েছেন—

'ঠাকুর মধুর স্বরে গান গাহিতে লাগিলেন'

'সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাহিলেন'

'গন্ধর্ব নিন্দিত কণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাইতেছেন'

'ঠাকুর মধুরকণ্ঠে গাহিতেছেন'

'তাঁহার প্রেম রসাভিসিক্ত কণ্ঠে গাহিতেছেন'

'ঈশানের কাছে বসিয়া মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন'

'ঠাকুর আবার সেই মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন'

'সেই গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠে গান গাইতেছেন'

'ঠাকুর সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মধুর গান গাহিতে লাগিলেন'

'শ্রীরামকৃষ্ণ, যে গানে কেশবাদি ভক্তদের মন মুগ্ধ করিতেন, সেই গান—সেই মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন। সকলের বোধ হইতেছে, যেন স্বর্গধামে বা বৈকুণ্ঠে বসিয়া আছেন।'

তাঁর সঙ্গীত-কণ্ঠ যে সুরেলা ছিল তার আরো উল্লেখ পাওয়া যায় সমকালীন ব্যক্তিদের উক্তিতে।

প্রথমে কৃষ্ণকুমার মিত্রের কথা। পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় সম্পাদক তিনি এবং ব্রাহ্মসমাজ ও স্বদেশী আন্দোলনের এক নেতা। রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ জামাতা কৃষ্ণকুমারের বিবাহ সভায়, ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে নরেন্দ্রনাথ দত্ত গান গেয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি', এ সংবাদটিও স্মরণীয়।

সেই কৃষ্ণকুমার মিত্র রামকৃষ্ণ সম্পর্কে লিখেছেন, 'পরমহংসকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সিন্দুরিয়াপটির নেপালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাটির ব্রহ্মোৎসবে এবং বেণীমাধব পালের সিঁথি উত্তরপাড়ার বাগানবাটির উৎসবে বহুবার দেখিয়াছি। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি। 'কত ভালবাস গো মানব সন্তানে'—ব্রহ্মসঙ্গীতের

এই গানটি তিনি এমন তদ্গত হইয়া গাহিতেন যে, সমস্ত লোক আত্মহারা হইয়া ব্রহ্ম কৃপাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার সমাধি হইত, তখন কতক্ষণ 'ওঁ' 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করা হইত এবং তিনি সংজ্ঞালাভ করিতেন।

(আত্মচরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র)

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর সঙ্গীতগুণের উল্লেখ আছে।

বর্ধমান রাজবাড়িতে তাঁর গানের কথা পাওয়া যায় সমকালীন একটি বিবৃতিতে। ১৮৮৪ সালের ৬ই অগস্টের 'ধর্মপ্রচারক' প্রকাশ করেছেন, 'মহাত্মা রামকৃষ্ণ··· আনন্দময়ীর আনন্দলাভের জন্য আপনার মনে আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন,···মধ্যে মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্ধমানের রাজবাটীতে আসিতেন। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় তানসেন কলাবৎ না হইলেও বর্ধমানের রাজপুরবাসিগণ তাঁহাকে একজন ভক্ত গায়ক বলিয়া জানিত।' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত— সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৩১)

শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করবার অব্যবহিত পরে 'পরিচারিকা' পত্রিকা (আগস্ট, ১৮৮৬) অন্যান্য কথার মধ্যে লেখেন, 'তিনি অতি মধুর সঙ্গীত করিতেন।'

(ঐ পুস্তক, পৃঃ ৪০)

তাঁর জীবনকালে 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮২, ফেব্রুয়ারি ২৬) পত্রিকা 'সংবাদ' মুদ্রিত করেন, তাঁব 'ভাবাবেশে প্রার্থনা উপদেশ সঙ্গীত সকলই মধুর এবং জ্ঞানদ।'

(ঐ পুস্তক, পৃঃ ২৭)

ওই পত্রেরই ১ নভেম্বর, ১৮৭৯ তারিখে—কেশব সেনের সদলে একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসার বর্ণনার মধ্যে—প্রকাশ, '···পরে সকলে গান করিতে করিতে পরমহংস মহাশয়ের গৃহাভিমুখে চলিলেন···সন্ধ্যার পরে তিনি কয়েকটি গান করিয়া সকলকে মত্ত করিয়া তোলেন। 'মধুর হরিনাম নিস রে জীব যদি সুখে থাকবি' সুমধুর সুরে এই গানটি করিয়া তিনি সকল লোককে মোহিত করেন, তখনকার স্বর্গের ছবি বর্ণনা করা যায় না।' (তদেব, পৃঃ ১৫)।

রামকৃষ্ণের গান গাওয়ার আরেকটি মূল্যবান বিবৃতি পাওয়া যায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্মৃতিকথায়। কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ। পরবর্তী কালে করাচীর 'ফিনিক্স', এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান পীপল', লাহোরের 'ট্রিবিউন' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সর্বভারতীয় সাংবাদিকতাব ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের একজন সুহৃদ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। দুজনে সমবয়সীও। বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই গুপ্ত মশায় পারদর্শী।

কেশব সেনের সঙ্গে আত্মীয়তাও ছিল নগেন্দ্রনাথেব। একদিন তিনি কেশবচন্দ্রের

সঙ্গে জাহাজে দক্ষিণেশ্বরে যান। সেদিনই প্রথম দেখেন রামকৃষ্ণকে। তাঁর গান ও কথাবার্তা শোনেন। তারপর রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেন আত্মীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে অর্থাৎ শ্রীম-কে। পরের বছর মহেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া, রামকৃষ্ণের কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে ডায়ারিতে তা নিয়মিত লিখে নেওয়া ইত্যাদি সমস্তই নগেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন তাঁর 'Reminiscences and Recollections' নামে তথ্যপূর্ণ, সুলিখিত গ্রন্থে—'In 1881, Keshab Chandra Sen accompanied by a large party, went on board a steam yacht belonging to his son in-law, Maharaja Bhupendra Narayan Bhup of Kuch Bihar to Dakhineshwar to meet Ramakrishna Paramhansa. I had the good fortune to be included in that party.' তারপর সেই স্টীমারের দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছানো, রামকৃষ্ণর স্টীমারে আসা, কথাবার্তা, সমাধি ও সমাধিভঙ্গের বর্ণনা করে নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন, '...the Paramhansa became fully conscious and sang in a pleasant voice: 'What a wonderful machine Kali the mother has made.' After the song, he gave luminous exposition on how voice should be trained for singing and the characteristics of a good voice...After seeing and hearing Ramakrishna, I went to see Mahendra Nath Gupta, who was related to me and was my senior by several years and told him everything and urged him to go to Dakshineshwar. This he did the following year and he was so much impressed by the Paramhansa's manner of speaking that he began keeping a diary in which he jotted down everything the saint said. He told me that what he heard in one day took him three days to set down in writing.' (Reminiscences and Recollections—Nagendra Nath Gupta).

রামকৃষ্ণের গাওয়া যে গানটির অনুবাদ নগেন্দ্রনাথ করেছেন, তা হলো—'শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে··· ।'

রামকৃষ্ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তির কথা নগেন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর গানের পরে। 'সঙ্গীতের জন্যে কণ্ঠকে কিভাবে শিক্ষিত বা পরিশীলিত করতে হয় এবং সুকণ্ঠের কি কি বৈশিষ্ট্য, সে সম্পর্কে পরমহংস একটি দীপ্ত পর্যালোচনা করেন', একথা নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিতভাবে জানান নি, কি বলেছিলেন

রামকৃষ্ণ। সেকথা বিবৃত করলে, রামকৃষ্ণের এই সঙ্গীত প্রসঙ্গ অত্যন্ত মূল্যবান হতো। কারণ কণ্ঠচর্চা সম্পর্কে তাঁর নিজের অন্য কোনো বিবৃতি পাওয়া যায় না। তবে সঙ্গীত কণ্ঠ কিভাবে শিক্ষিত বা পরিমার্জিত করা যায়, সুকণ্ঠের বৈশিষ্ট্য কি, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যে সচেতন ছিলেন, তার একটি প্রমাণ পাওয়া গেল নগেন্দ্রনাথের জবানীতে। পরে, সঙ্গীত সম্পর্কে রামকৃষ্ণের বিভিন্ন মন্তব্য আলোচনার সময় কণ্ঠের প্রসঙ্গ আবার আসবে। তখন আলোচ্য বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু মতামত মন্তব্যাদি প্রকাশ করা হবে, যা পাওয়া গেছে রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতিতে।

সমকালীন এত উক্তি থেকে ধারণা করা গেল যে, তিনি সুরেলা-কণ্ঠ গায়ক এবং শ্রোতারা মুগ্ধ হতেন তাঁর গানে। তিনি যে বেতালা বা লয়-জ্ঞানহীন ছিলেন না, স্বামী সারদানন্দের বিবৃতি সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য। তা ছাড়া, কীর্তন গান তিনি খোলের সঙ্গতে যে গেয়েছেন তার একাধিক দিনের সাক্ষ্য বিদ্যমান। রামকৃষ্ণের তাল লয় সম্পর্কে কিছু মতামতও যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করা হবে।

অবশ্য এমন কথা উঠতে পারে যে, আসরের পূর্ণ গায়ক হিসেবে দেখা যায় নি তাঁকে। কীর্তন ভিন্ন। অর্থাৎ শ্যামা-সঙ্গীত প্রভৃতি তিনি সুর-যন্ত্র কিংবা সঙ্গত যন্ত্রের সহযোগে গান করেন নি। উত্তর স্বরূপ বলা যায়, তার কাবণ একটিই। তাঁর সঙ্গীতের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল স্বতন্ত্রপ্রকৃতির। কখনো ভাগবতী কথা-প্রসঙ্গে। কখনো আপনার ভাবে, আপন মনে। কখনো উপদেশ বা শিক্ষাচ্ছলে। সেখানে তবলা বা তানপুরা এসরাজের প্রশ্ন নেই। তবু দেখা গেছে, বেসুরো বেতালা নন তিনি, তানপুরা বা তবলা সঙ্গতে গান না করলেও। কারণ নানা সঙ্গীতবিদ্ ব্যক্তি তাঁর গানের সপ্রশংস শ্রোতা। এসব কি একাধিক সিদ্ধ গায়কের সঙ্গে একযোগেও তাঁর গান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যে ধরনের গান তিনি গেয়েছেন তার উপযুক্ত সুর-বোধ তাল লয়-বোধের স্বভাবদত্ত অধিকারী রামকৃষ্ণ। সঙ্গীতেও তাঁর—তথাকথিত—'অশিক্ষিতপটুত্ব।' যেমন অশিক্ষিত হয়েও বেদান্তের প্রতিপাদ্য নানা বিষয়ে তিনি সর্বজনবোধ্য ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। ধর্ম ও অধ্যাত্মজগতের কত গূঢ়তম তত্ত্ব আলোচনা করে দেখিয়েছেন সরলতম অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাবে।

পূর্ণজ্ঞানী রামকৃষ্ণ পরমহংস। সেই মূল সত্তার এক প্রকাশ তাঁর সঙ্গীতগুণ। সেই পূর্ণ জ্ঞান থেকেই তাঁর গায়ন ক্ষমতারও অভিব্যক্তি। চিত্রাঙ্কন ও অভিনয়-শক্তি যেমন তাঁর অন্যান্য নান্দনিক রূপ—যা বিকশিত হয় নি অনবকাশ ও চর্চার অভাবের জন্যে।

তাঁর সুর-যন্ত্রের সঙ্গে না-গাওয়ার প্রসঙ্গ আগে হচ্ছিল। তবে যন্ত্র সহযোগে, সঙ্গীতের

পূর্ণ পরিবেশে তাঁর গান গাইবার উদাহরণও যে একেবারে নেই তা নয়। এ বিষয়ে একাধিক দিনের কথা স্মরণ করা যায়। সেসব দিনে তিনি একযোগে গান গেয়েছিলেন কীর্তনীয়া বৈষ্ণবচরণ কিংবা নরেন্দ্রনাথের মতন মার্জিত-কণ্ঠ গায়কদের সঙ্গে, কণ্ঠ মিলিয়ে। তখন তাঁদের গানের সঙ্গে সুর-যন্ত্রও ছিল। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীত কণ্ঠ যে সুরেলা ছিল তা নিঃসন্দেহ।

তা ছাড়াও তাঁর সঙ্গীত-যন্ত্রের সঙ্গে একদিন গাইবার কথা জানা যায়, বারাণসীতে। ভারতের আদি তন্ত্র-বাদ্য বীণা সহযোগে। সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীণকার মহেশচন্দ্র সরকারের বাজনার সঙ্গে সাময়িক গান গেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ।

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরমোহন সেবার তীর্থ ভ্রমণে নিয়ে যান তাঁকে। পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে। বৈদ্যনাথ থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত। তারই মধ্যে কিছুদিন তীর্থ করেন কাশীতে।

ব্রজধামে থাকবার সময় রামকৃষ্ণের বীণাবাদন শোন্‌বার ইচ্ছা হলো। বীণা সচরাচর রাগালাপের একক বাদনের সুর-যন্ত্র। গানের সঙ্গতকার নয়। তবু যে রামকৃষ্ণ বীণা শুনতে আগ্রহী হলেন, তা থেকে বোঝা যায়—বাণী-নির্ভর নয় এমন বিশুদ্ধ সঙ্গীতেরও তিনি অনুরাগী। সঙ্গীতবিষয়ে তাঁর চিত্ত পরিশীলিত। কিন্তু এ তীর্থে তাঁকে নিরাশ হতে হলো। কারণ মথুরবাবু কোনো বীণাবাদকের সন্ধান পেলেন না বৃন্দাবনে।

তারপর তাঁরা কাশীতে এলেন। ভারতের আধ্যাত্মিক রাজধানী বারাণসী, সঙ্গীতেরও পুরী। এখানকার সঙ্গীতক্ষেত্রে বীণার বিশিষ্ট স্থান। কলাবৎ বীণ্‌কারের সে যুগেও অপ্রতুল নেই। ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। কাশী-নরেশ দরবারই তো তখন সঙ্গীতের অতি গৌরবের স্থান, ভারতের নানা শ্রেষ্ঠ গুণীজনে ধন্য। তাছাড়া, কবীর চৌরা থেকে নগরের অঞ্চলে অঞ্চলে কত কৃতী গায়ক বাদক। উচ্চ মানের চর্চায় মুখরিত বারাণসীর সঙ্গীত-ক্ষেত্র। সর্বপ্রকার যন্ত্র-সঙ্গীতের সাধন পীঠ।

এখানে মথুরমোহনকে বেশি ব্যস্ত হতে হলো না। একজন প্রথম শ্রেণীর বীণ্‌কারের সন্ধান পেলেন বাঙালীটোলাতেই। বাঙালী হলেও তিনি একাধিক পশ্চিমী ওস্তাদের কাছে দস্তুরমত শিক্ষাপ্রাপ্ত গুণী, বীণা যন্ত্রেরই একান্ত সাধক। মহেশচন্দ্র সরকার। উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ কলাকারদের সঙ্গে একাসরে তিনি বাজিয়ে থাকেন। শৌখীন অর্থাৎ অপেশাদার হয়েও গুণী সমাজে সম্মানিত, স্বীকৃত বীণাবাদক মহেশচন্দ্র। তানসেনের পুত্র-বংশীয় তন্ত্রকার সাদিক আলী খাঁ, বীণ্‌কার সেতারী গণেশীলাল বাজপেয়ী, সেনীয়া নিসার আলী খাঁ প্রমুখের শিক্ষা ও সঙ্গ লাভে কৃতবিদ্য হন মহেশচন্দ্র।

মথুরমোহন তাঁর বীণা বাজনা শোনাবার জন্যে নিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণকে। মহেশ-

চন্দ্রের বিশাল ভবনে।'বাঙালীটোলার মদনপুরায়, চৌষট্টি যোগিনী ঘাটের কাছে। মহেশচন্দ্র তখন পঞ্চাশ বছরের প্রবীণ। রামকৃষ্ণের বয়স বত্রিশ বছর। দক্ষিণেশ্বরের এই মহাপুরুষের কথা মহেশচন্দ্রের বিশেষ কিছু জানা ছিল না। কলকাতা থেকে আগত শুধু একজন আগ্রহী শ্রোতা বলেই তাঁকে জেনেছিলেন বীণ্‌কার। বিকাল পাঁচটায় মহেশচন্দ্র বীণা বাজাতে আরম্ভ করলেন, তাঁর একতলার বৈঠকখানায়। রামকৃষ্ণ তার মধুর ঝঙ্কারে প্রথম থেকেই আবিষ্ট হলেন। যেমন তন্ময়চিত্তে বাজাতে লাগলেন বীণ্‌কার, তেমনি ভাবস্থ হতে লাগলেন শ্রোতাও।

রাগের আলাপচারী শুনতে শুনতে রামকৃষ্ণের অর্ধবাহ্য দশা হলো। 'মা আমায় হুঁশ দাও, আমি ভালো করে বীণা শুনব', এই প্রার্থনা করতে লাগলেন তিনি।

তাঁর প্রার্থনা পূরণ হয়েছিল। সমাধিস্থ তিনি হননি। বাহ্যভূমিতে অবস্থান করে বীণা শুনলেন সানন্দে। আর মাঝে মাঝেই বীণা ধ্বনির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গেয়ে উঠলেন।

রাত আটটা পর্যন্ত এইভাবে বাজালেন মহেশচন্দ্র। সুর-রসিককে শুনিয়ে তিনিও সুপ্রীত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সম্পদের সম্বন্ধে কোনো ধারণা না পেলেও, কত বড় গুণগ্রাহী শ্রোতা এবং সঙ্গীতের মর্মজ্ঞ যে তিনি, তা বুঝেছিলেন সেই বীণা-সাধক। রামকৃষ্ণের প্রতি তিনি এমনই আকৃষ্ট হন যে কাশীতে যে কদিন ঠাকুর থাকেন, মহেশচন্দ্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন প্রত্যহ।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, সাধকভাবে, পৃঃ ৩৩১—স্বামী সারদানন্দ)।

অনুমান করা যায়, বীণা বাদনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বর-সংযোগ 'সুরিলি' হয়েছিল। নচেৎ এত বড় বীণ্‌কার তাঁকে বাজনা শোনাতেন না তিন ঘণ্টা যাবৎ।

আর মহেশচন্দ্র সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'বীণা বাজাতে বাজাতে ইনি এককালে মত্ত হয়ে উঠতেন।'...

রামকৃষ্ণের নানাদিনের এবং নানা ভাবের গান গাওয়ার বৃত্তান্ত এই পর্যন্ত।

এখন তাঁর গানের রীতিনীতির কথা। তাঁর গাওয়া গানের ধরন ধারণের প্রসঙ্গ— বিষয়বস্তুর কথা নয়।

দেখা গেছে, তিনি যে সব গান গাইতেন তার বেশির ভাগই বাংলা। কিন্তু কিছু কিছু হিন্দী গানও তাঁর জানা ছিল, ইচ্ছা হলে সেগুলি গাইতেনও। তাঁর বাংলা গীতাবলী পর্যালোচনার আগে, হিন্দী গানের কথা বলে নেওয়া যায়। তাঁর গাওয়া হিন্দী গানগুলি সমস্তই ভজন-সঙ্গীত। এক ধরনের ঐকান্তিক ভক্তি-ভাবের গান। ভারতের সমগ্র হিন্দী-ভাষী অঞ্চলে শুধু নয়, পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র গুজরাটে পর্যন্ত ভজন গানের ব্যাপক প্রচলন। সেজন্যে ভারতীয় সঙ্গীতেও একটি শ্রেণী হিসেবে ভজনের

স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ভজন গান সচরাচর তুই তুকে বা কলিতে গঠিত : স্থায়ী ও অন্তরা। কিন্তু মীরাবাঈ প্রমুখের দীর্ঘতর ভজনও যেমন আছে, তেমনি কোনো কোনো রচয়িতার একটি পদ বা দু চরণেই সম্পূর্ণ ভজন গান দেখা যায়। মীরা, তুলসীদাস, সুরদাস, নানক, কবীর প্রভৃতি সাধক সাধিকাদের ভজন বেশি প্রসিদ্ধ। মীরাবাঈ, তুলসীদাস ও কবীরের ভজন গেয়েছেন রামকৃষ্ণ, তাছাড়া অন্য রচয়িতাদের পদাবলীও।

তাঁর ভজনগানের কয়েকটি সমকালীন বিবৃতি এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

স্বামী অখণ্ডানন্দ জানিয়েছেন, 'যখনই ঐরকম হিন্দুস্থানী বা রাজপুতানার ভক্তরা তাঁর কাছে আসত, ঠাকুর এই গানটি গাইতেন—

হরিষে লাগি রহো রে ভাই,
তেরে বনত বনত বনি যাই।
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে,
তারে সুজন কসাই,
শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে,
তারে মীরাবাঈ॥

হাসতে হাসতে এই গানটিও গাইতেন—

দিল রামকো নেহি জানা হৈ
তো সো জানা হৈ সো কেয়া রে।
দিল রামকো নেহি কিয়া
তো জো কিয়া সে কেয়া রে॥'

(স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৫-৩৬)।

স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 'রামাইৎ বাবাজীদের নিকটে যে সকল ভগবানের ভজন শিখিয়াছিলেন, তাহা গাহিয়া আমাদের শুনাইতেন। যথা—

(মেরা) রামকো না চিনা হ্যায়, দেল্
চিনা হ্যায় তুম্ ক্যারে।
আওর জানা হ্যায় তুম্ ক্যারে॥
সন্ত ওহি যে রাম রস চাখে,
আওর বিষয় রস চাখা হ্যায় সো ক্যারে॥
পুত্র ওহি যো কুলকো তারে
আওর যো সব পুত্র হ্যায় সো ক্যারে॥

অথবা

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরায়ী।
ভজ লে অযোধ্যা রাম দোসরা না কোই ॥
হসন বোলন চতুর চাল অয়ন বয়ন দৃগ্ বিশাল
ভ্রূকুটি কুটিল তিলক ভাল নাসিকা শোভাই ॥
কেশরকো তিলক ভাল মান রবি প্রাতঃকাল
শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাট রতিপতি ছবিছায়ী ॥
মোতিন্‌কো কণ্ঠমাল তারাগণ উরু বিশাল
মান গিরি শিখর ফোরি সুরসরি বহিরায়ী ॥
বিহরে রঘুবংশবীর সখা সহিত সরযূতীর
তুলসীদাস হরষ নিরখি চরণ রজ পাই ॥

অথবা গাহিতেন—

রাম ভজা সেই জিয়ারে জগ্‌মে।
রাম ভজা সেই জিয়ারে ॥

অথবা—

মেরা রাম বিনা কোহি নাহিরে
তারণওয়ালে···

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, উত্তরার্ধ, পৃঃ ৬৬)···

আর কবীরের 'মোকো কঁহা ঢুঁড়ে বন্দে মৈঁ ত তেরে পাশ মেঁ' ও 'সেবা বন্দি আওর অধীনতা' এই ভজন দুটিও তিনি গাইতেন বলে প্রকাশ।

এমনি কিছু সংখ্যক হিন্দী ভজন ভিন্ন রামকৃষ্ণের গাওয়া সমস্ত গানই বাংলা। সে গীতাবলী বিষয়বস্তুতে আধ্যাত্মিক তথা ভক্তিভাবের হলেও বিভিন্ন তাদের গীতিরীতি। তাঁর বাংলা গানের মধ্যে, শ্যামাসঙ্গীতের পরেই লক্ষ্যণীয় সংখ্যায় আছে কীর্তন। কীর্তন গানের পৃথক পদ্ধতি ও বিশিষ্ট গাইবার ধরন ইত্যাদি বিষয়ে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর গায়ন-রীতিতে যে কেবল স্বাতন্ত্র আছে, তা নয়। কীর্তন গানের ভক্তিরসের আবেদন এমনি নিজস্ব এবং উন্মাদনাকর যে অন্য কোনো গীতিরীতির সঙ্গে তার তুলনা হয় না। কীর্তন (কয়েকজনের সম্মিলিত কণ্ঠে যা সংকীর্তন) নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি শ্রেণী হয়ে আছে বাংলা গানের জগতে। তাই সচরাচর দেখা যায়, যাঁরা কীর্তনীয়া অর্থাৎ কীর্তন-ব্যবসায়ী তাঁরা অন্য কোনো প্রকার সঙ্গীতের চর্চা করেন না। মগ্ন থাকেন ঐ রীতিতেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় কীর্তন গান। ভাবে মত্ত হয়ে তাঁকে কীর্তন গাইতে দেখা গেছে নানা অনুষ্ঠানে। কীর্তন গান কেন এত জনপ্রিয়? একথায় তিনি একদিন

এমন মতও প্রকাশ করেন—'করুণ বলে তাই অত—লোকে ভালবাসে।' তাঁর নিজেরও হয়ত সেই কারণে ভালো লাগত কীর্তন। সকরুণ, বিরহ-বিধুর 'মাথুর' তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পালা।

কিন্তু বৈচিত্র্য-বিলাসী সাধক রামকৃষ্ণ, সঙ্গীতেও। তাই কীর্তনের মরমিয়া হলেও শ্যামাসঙ্গীতেরও তিনি ভাবুক গায়ক। আর সংখ্যার হিসাব যদি ধরা যায়, তাহলে কালী-বিষয়ক গান তাঁর কীর্তনের চেয়ে প্রিয়তর। বলা চলে, শ্যামাসঙ্গীত তাঁর প্রিয়তম গান। কারণ শ্যামাবিষয়ে গান তিনি সর্বাধিক গেয়েছেন। আর শ্যামাসঙ্গীতও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিগণিত হয়েছে বাংলায় সঙ্গীত ক্ষেত্রে।

আবার গীতরীতির বিচারে শ্যামাসঙ্গীত পর্যায়ে একাধিক বিভাগ স্বীকৃত। যেমন রাম-প্রসাদ ও কমলাকান্তের গান। রামকৃষ্ণ এই দুই পদকর্তার গান সব চেয়ে বেশি গাইতেন। কিন্তু কালী-বিষয়ক হলেও তাঁদের দুজনের গানের ধরন সম্পূর্ণ পৃথক।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত কালী-সাধক এবং তাঁদের রচিত গান—সাধন-সঙ্গীত। তাঁদের সাধন-ভাবের বাহন। আবার তাঁরা দুজনেই সঙ্গীতজ্ঞ। একাধারে গীত-রচনাকার, সুরকার ও গায়ক। স্বরচিত যাবতীয় গান তাঁরা নিজেরা সুরসংযোগ করে প্রথম গেয়েছেন। তাঁদের গানের ফলে সেই পদাবলী প্রচলিত ও প্রচারিত হয়েছে বাংলার সঙ্গীত জগতে। তাঁরা যে বিশিষ্ট ধরনে আপনাদের গান গাইতেন তা একেকটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যত শ্যামাসঙ্গীত গেয়েছেন, তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি সংখ্যক গান রামপ্রসাদের রচনা। বোঝা যায়, রামপ্রসাদের গান তাঁর অতিশয় প্রিয়। গাইবার আগে অনেক সময় বলে দিতেন, 'একটা রামপ্রসাদের গান শোন।' আবার এমন মন্তব্যও করেছেন—অন্য কোনো রচনাকারের নামে যা বলেন নি—'রামপ্রসাদ সিদ্ধ। তাই তাঁর গান ভালো লাগে।' রামপ্রসাদকে সিদ্ধিলাভ করা সাধক বলে তিনি জানতেন।

স্বভাব-কবি এবং গায়ক রামপ্রসাদ সেন (আ. ১৭২০-১৭৮১। প্রায় তিনশ' গানের রচয়িতা। তার মধ্যে অনেকগুলিই বাংলার সঙ্গীত-ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে।

স্বরচিত গানে রামপ্রসাদ যে সুর দিয়ে গাইতেন তা বাউল ধরনের। সহজ সরল কিন্তু প্রাণস্পর্শী সেই সুরের চাল। তাঁর সমস্ত গানেরই এক প্রকার গাইবার ধরন এবং তা তাঁর নিজস্ব। সেজন্যে রামপ্রসাদের গান 'রামপ্রসাদী' বা 'প্রসাদী সুর' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। যে-কোনো গায়ক রামপ্রসাদের গান গাইবেন তাঁকে গাইতে হবে সেই নির্দিষ্ট রীতিতে। রামপ্রসাদও সেইভাবে তাঁর গান গেয়েছেন।

শোনা মাত্র চেনা যায় রামপ্রসাদী গান। এক রকম বাউলের মতন সুরে তাঁর সমস্ত

গান গড়া হলেও রামপ্রসাদ কোনো কোনো গানে রাগ প্রয়োগ করেছেন। আর তাঁর অনেক গান একতালা। তার রাগ-সঙ্গীত পর্যায়ের নয় রামপ্রসাদী গান। কারণ কখনো কখনো রাগের ব্যবহার সত্ত্বেও গাইবার ধরন তাঁর নিজস্ব রীতিতে।

অবশ্য রামপ্রসাদের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল রাগসঙ্গীতে, সম্ভবত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নদীয়া রাজসভার সূত্রে। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর একজন গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক। কৃষ্ণনগর দরবারে রামপ্রসাদ মাঝে মাঝে গেছেন। দরবারী কলাবৎদের গানও শুনেছেন সেখানে। আর নিজের সঙ্গীত-গুণে তার কিছু কিছু আত্মস্থ করেছেন।

দরবারে গাইবার মতন হিন্দুস্থানী গান যে রামপ্রসাদের জানা ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, নবাব সিরাজুদ্দৌলার ঘটনাটি থেকে।

হালিশহরের ঘাটে রামপ্রসাদ রোজই গঙ্গাস্নানে আসেন। স্বরচিত নতুন নতুন গান তখন গাইতে থাকেন জলে দাঁড়িয়ে। ভাবে তন্ময় হয়ে গাওয়া তাঁর সেইসব গান ঘাটের সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনেন। মুক্ত আকাশের নীচে রামপ্রসাদের মুক্ত প্রাণের সুর অনুরণন জাগায় তাঁদের মনে।

সেদিনও রামপ্রসাদ গঙ্গায় আপন মনে গাইছিলেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা তখন মুর্শিদাবাদ থেকে চলেছেন কলকাতায়। রামপ্রসাদের উদাত্ত কণ্ঠের গান ভেসে এলো নবাবের বজরায়। সুর শুনে সিরাজ আকৃষ্ট হলেন। বজরাকে নিয়ে যেতে বললেন ঘাটের দিকে।

গান শেষ হতে, একজন পার্ষদকে নবাব বললেন, 'ওই গায়ককে এখানে নিয়ে এস। আমি ওঁর গান শুনব।'

নবাবের বার্তাবাহীর সঙ্গে বজরায় এলেন প্রসাদ।

সিরাজুদ্দৌলা বললেন, 'আমায় আপনার গান শোনান।'

তখন রামপ্রসাদ একটি হিন্দী গান গাইলেন।

নবাব বলে উঠলেন, 'না, না, আমি আপনার কাছে হিন্দী উর্দু শুনতে চাই না। আপনি গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে যে গান গাইছিলেন, সেই গান করুন।'

এবার প্রসাদ শ্যামা মায়ের গান আরম্ভ করলেন। দরদভরা কণ্ঠে গানের সঙ্গে তাঁর অশ্রু ঝরতে লাগল বিগলিত ধারায়।

প্রসাদী গান শুনে নবাব যে তৃপ্তিলাভ করলেন তা হয়ত এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ তো আগেই আরম্ভ হয়েছে। বিক্ষুব্ধ-চিত্ত সিরাজুদ্দৌলারও চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। রামপ্রসাদকে তিনি বলেন, 'চলুন আমার সঙ্গে'।

রামপ্রসাদ অবশ্য রাজি হন নি।

(সাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃঃ ১২৬-১২৭—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)।

বিপর্যস্ত মোগল নবাব শান্তি পেয়েছিলেন যে গানে, যে সুর তাঁর এমন প্রাণস্পর্শী হয়েছিল, সেই মরমী সুরে গভীর ভাবোদ্দীপক গানের জন্যেই স্মরণীয় রামপ্রসাদ। তাঁর নিজস্ব সুরের অধ্যাত্ম সঙ্গীত বলে রামকৃষ্ণের এত প্রিয় রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত।

এইসব প্রসাদী গান—'ডুব দে রে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে'; 'কে জানে কালী কেমন? ষড়দর্শনে না পায় দরশন'; 'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে', 'আয় মন বেড়াতে যাবি, কালী কল্পতরুমূলে রে (মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি'; 'ভাবিলে ভাবের উদয় হয়'; 'সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে', 'এই সংসার মজার কুটি'; 'অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি'; 'মা কি শুধুই শিবের সতী'; 'ক্ষ্যাপার হাট বাজার মা তোদের', 'এবার কালী তোমায় খাব', 'মন রে কৃষি-কাজ জান না', 'আর ভুলালে ভুলব না মা'; 'ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়'; 'এসব ক্ষ্যাপা মেয়ের খেলা'; 'এবার আমি ভাল ভেবেছি', 'আমি ওই খেদে খেদ করি (শ্যামা), তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি'; 'শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি ভব সংসার মাঝে', 'ভাব কি ভেবে পরাণ গেল',—গেয়ে ভাবস্থ পান রামকৃষ্ণ।

আর রামপ্রসাদী গানের পরেই তাঁর প্রিয় শ্যামাসঙ্গীত—কমলাকান্তের রচনা। বাংলার অতি উৎকৃষ্ট এক পদকর্তা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (আ. ১৪৭২-১৮২০)। সে কালের নিরিখে তাঁর গানে বাণীর পারিপাট্য আর লালিত্য লক্ষ্য করবার। আর যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি উচ্চ মার্গের ভাবের বাহন তাঁর গান-কমলাকান্তের তুল্য এমন ঐকান্তিক কালীসাধক, কালীভক্তও দুর্লভ-দর্শন।

বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ (রাজ্যকাল ১৭৮০-১৮৩২) ও কুমার প্রতাপচাঁদ (জন্ম: ১৮৯০) গুরু জ্ঞান করতেন তাঁকে। কমলাকান্তের নিদানকালের কথাও বলবার মতন।

তখন তাঁর অন্তিমক্ষণ। কবিরাজ সেকথা জানিয়েছেন। তেজচাঁদ সাধককে দেখতে এসেছেন সংবাদ পেয়ে।

গুরুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গঙ্গা তীরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব কি?'

গানে উত্তর দিলেন কমলাকান্ত—

'কি বালাই, কেন গঙ্গা তীরে যাব?
আমি কালো মায়ের ছেলে হয়ে
বিমাতায় কি শরণ লব?'

রামপ্রসাদের তুল্য কমলাকান্তেরও গান রচনা ধর্ম-সাধনার অঙ্গস্বরূপ। তাঁর গীত-

প্রেরণা একান্ত শ্যামাভক্তি হলেও সঙ্গীত বিষয়ে কমলাকান্তের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। আর রাগ-সঙ্গীতের রীতিনীতি সম্পর্কে খানিক ধারণাও। তাঁর অনেক গানই চার কলিতে ও রাগে গঠিত। আর টপ্পার ধরনে দানার তান দিয়ে গাওয়া হয়ে থাকে। কমলাকান্ত যেহেতু স্বরচিত গানের সুরকার ও গায়ক, তাই তাঁর শ্যামাসঙ্গীতে টপ্পার অঙ্গ তাঁর নিজেরই দান। এ বিষয়ে সাঙ্গীতিক তথ্যও আছে। বর্ধমানের যে চান্না গ্রামে তাঁর জন্ম ও প্রথম জীবন কাটে, সেখানেই তিনি সঙ্গীতচর্চা করেছেন সঙ্গীতজ্ঞ আত্মীয় কেনারাম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কমলাকান্তের চেয়ে কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ কেনারাম। চান্নার পাঁচ-ছ ক্রোশ নিকটেই গুপ্তিপাড়া। বাংলার আদি টপ্পাচার্য কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালী মীর্জার (আ. ১৭৫০-আ. ১৮২০) স্বগ্রাম। কেনারাম এবং কমলাকান্তরও প্রথম জীবনে কালিদাস কয়েক বছর গুপ্তিপাড়ায় থাকেন। তা হলো, পশ্চিমাঞ্চল থেকে তাঁর টপ্পাদি রাগসঙ্গীত শিখে আসবার (১৭৮১-৮২) পরের কথা। সেজন্যে কালী মীর্জা কিংবা তাঁর স্থানীয় শিষ্য অম্বিকাচরণের কাছে কেনারামের সঙ্গীতশিক্ষার বিশেষ সম্ভাবনা। তাই সাধক কমলাকান্তের কালী বিষয়ক নানা গান টপ্পা অঙ্গে শোনা যায়, সুরকার-গায়কেরই দৃষ্টান্তে।

রামকৃষ্ণের গায়ন প্রসঙ্গে ঐ আলোচনাটির তাৎপর্য আছে। তা হলো, কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত রামকৃষ্ণ নানা দিনে গেয়েছেন। সুতরাং এ ধারণা সঙ্গত যে, তিনি কমলাকান্তের গানগুলি গেয়েছেন টপ্পার ধরনে। কারণ সেই রীতিতেই কমলাকান্তের গীতাবলী গাইবার প্রথা প্রচলিত। অতএব বোঝা যায়, এই রীতিতে বা ধরনে বা চালে গাইবার নিপুণতা ঠাকুরের ছিল।

তাঁর এই সব শ্যামাসঙ্গীত বেশি গাইতেন রামকৃষ্ণ—'যতনে হৃদয়ে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে', 'আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে'; 'শ্যামা মা কি আমার কালো রে'; 'মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে'; 'শ্যামা ধন কি সবাই পায়', 'সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী', 'শ্যামা মা কি কল করেছে', 'কখন কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা', প্রভৃতি। কমলাকান্তের এই গানগুলির বেশির ভাগ টপ্পা অঙ্গের বলে বাংলায় সঙ্গীত জগতে প্রচলিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাহলে, কীর্তন, হিন্দী ভজন, রামপ্রসাদী ও টপ্পার ধরনে শ্যামাসঙ্গীত —এমনি বিভিন্ন রীতিতে গাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। তা ছাড়া, নানা গীতিকারের অধ্যাত্ম তথা ভক্তিভাবের বাংলা গানও তিনি গাইতেন, যা প্রচলিত ছিল সেকালে। এমন কয়েকজন রচনাকারের নাম আগেই দেওয়া হয়েছে। তা ভিন্ন আরো গীতিকারের গান তাঁর গাওয়া সম্ভব। কারণ তাঁর গানের সম্পূর্ণ বিবরণ তো পাওয়া যায় নি।

চতুর্থ অধ্যায়

কত গান তিনি গেয়েছিলেন

শ্রীরামকৃষ্ণ কত বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রসঙ্গে গান শুনিয়েছেন, কি ধরনের বা রীতির গান তিনি গাইতেন, তাঁর গীতিকণ্ঠ কেমন ছিল, কীর্তনাদি গানের সঙ্গে তিনি কি ভাবে নৃত্যে মত্ত হতেন, গীতের তুল্য নৃত্যও তাঁর শিল্পী-সত্তায় কি অঙ্গাঙ্গী ছিল, কোন্ ভাবের গান তিনি বেশি গাইতেন, তাঁর গানের বিষয়বস্তু ইত্যাদি আলোচনা আগেকার অধ্যায় দুটিতে করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের গান গাওয়া সম্পর্কে আরেক প্রকার সমীক্ষা বর্তমান অধ্যায়ের বিষয়।

বিভিন্ন পুস্তকের উল্লেখ অনুসারে তাঁর গীত গানের একটি সামগ্রীক তালিকা এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে দেওয়া হবে। বর্তমান অধ্যায়টি তারই বিস্তৃত ভূমিকা বা পরিচায়িকা স্বরূপ।

এখন বিবেচ্য—কত গান এবং কি কি গান গেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে প্রধান আকর গ্রন্থ—শ্রীম-র 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত', পাঁচ ভাগে সম্পূর্ণ। গুপ্ত মহেন্দ্রনাথের তুলনারহিত কীর্তি। রামকৃষ্ণ এবং তাঁর ভাবধারাকে জানার পক্ষে যেমন অমূল্য, অপরিহার্য, তেমনি প্রাঞ্জল, সুখপাঠ্য বিবরণী এই 'কথামৃত'। দিনলিপির আকারে প্রতিবেদন, যার অধিকাংশই লেখকের প্রত্যক্ষ গোচর। পরমহংসদেবের নিজ মুখের বাণী এবং তাঁর গীত গানেরও সংকলন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, বহু প্রয়োজনীয় অধ্যাত্ম প্রশ্নের তাঁর সহজতম উত্তর, সর্বজনবোধ্য ব্যাখ্যা কথামৃতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রাপ্তব্য। পাঠক ও শ্রোতাদের এক পরম শান্তি লাভের দিক দর্শনী—শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও প্রসঙ্গ সংগ্রহের এই মহাকোষ।

"কথামৃত' গ্রন্থাবলী রামকৃষ্ণের সঙ্গীত বিষয়েও বহু তথ্যের ভাণ্ডার। তাঁর নানা দিনের গান গাওয়া, তার পরিবেশ, উপলক্ষ ইত্যাদির বর্ণনা, সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন মন্তব্য, মতামতের উল্লেখ; অন্যান্য গায়কদের কথা, তার গান গাওয়ার মতন গান শোনার মূল্যবান বিবৃতি—এমনি অনেক কিছুই পাওয়া যায় মহেন্দ্রনাথ প্রমুখাৎ। আর তা সমস্তই নির্ভরযোগ্য। কারণ তিনি গানের স্থানে উপস্থিত থেকেছেন। তা ভিন্ন মহেন্দ্রনাথ নিজেও গায়ক, গানের মর্মজ্ঞ। তাই রামকৃষ্ণের নানা দিনের সঙ্গীত-প্রসঙ্গ লেখক উপস্থাপিত করেছেন এমন তন্নিষ্ঠভাবে। 'কথামৃত' গ্রন্থাবলীর' অনেকখানি স্থান পূর্ণ করে আছে সাঙ্গীতিক বিবরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং

তাঁর পার্ষদবৃন্দ ও অন্যান্য গায়ক গায়িকাদের গীত প্রসঙ্গ।

কিন্তু সময়ের হিসাবে 'কথামৃত' বইগুলি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কারণ রামকৃষ্ণ-জীবনের একটি খণ্ডাংশ মাত্র মহেন্দ্রনাথের দিনলিপিতে প্রকাশ পেয়েছে। পরমহংসদেবের শেষ চার বছর দু মাস কাল 'কথামৃত' গ্রন্থাবলীর পরিধি। মাঝে মাঝে 'পূর্বকথা'-য় কিছু আগেকার স্মৃতিচারণ আছে বটে। কিন্তু তা অল্পই এবং সংক্ষিপ্তও। মূল পুস্তকের তুল্য তথ্যপূর্ণ হওয়া সেগুলির পক্ষে সম্ভব নয়।

মহেন্দ্রনাথ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন ১৮৮২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। সেদিনই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেন ও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। ওই তারিখ থেকে এপ্রিল ২৩, ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত বিবরণ আছে তাঁর 'কথামৃত' পাঁচটি খণ্ডে। কারণ সেই সময়টি তিনি রামকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ রামকৃষ্ণ দেহান্তের (১৬ আগস্ট, ১৮৮৬) তিন মাস তিন সপ্তাহের পূর্ববর্তী প্রতিবেদন মহেন্দ্রনাথের বিবৃতিতে প্রকাশিত।

কিন্তু এই চার বছর দু' মাসেও মহেন্দ্রনাথের পক্ষে প্রত্যহ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাওয়া সম্ভব হতো না। তিনি যেতেন রবিবার কিংবা কোনো ছুটির দিনে। অর্থাৎ তাঁর স্কুল যে সব দিনে বন্ধ থাকত। সপ্তাহের অন্যান্য দিনেও অনেকে উপস্থিত হতেন রামকৃষ্ণের কাছে। সে সব দিনে রামকৃষ্ণ যত কথা বলতেন বা গান গাইতেন তার উল্লেখ থাকতে পারেনি 'কথামৃত'তে।

রামকৃষ্ণ তিরোধানের অনেক বছর পরে, 'কথামৃত' গ্রন্থাবলী যখন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়েছে, তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য বাবুরাম মহারাজ একজনকে কথায় কথায় বলেন, 'তোমাদের এই এক হয়েছে কথা, যখন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে এসব কথা নেই, তখন তিনি বলেন নি।...মাস্টার মহাশয়ের 'কথামৃত' ছাড়া ঠাকুরের অনেক কথা ও গান আছে যা মাস্টার মহাশয় জানতেন না।' (পৃঃ ২, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি—কমলকৃষ্ণ মিত্র)।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে নানা বিষয়ে গবেষণায় বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দ) ওই মন্তব্যটি মনে রাখা দরকার।

'কথামৃত' বিবরণীতে দিনলিপির আকারে তারিখ দেয়া আছে, এই এক সুবিধা। তাই থেকে জানা যায়, কতদিনের কথা এই গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট আছে। সেই অনুসারে একটি হিসাব নেওয়া যায়, আলোচিত দিনগুলি সম্পর্কে। যথা—

১৮৮২ সালের ২২ দিন, ১৮৮৩ সালের ৬২ দিন, ১৮৮৪ সালের ৩৮ দিন, ১৮৮৫ সালের ৪২ দিন ও ১৮৮৬ সালের ১৫ দিনের রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ বিবৃত করেছেন মহেন্দ্রনাথ। অর্থাৎ সাকুল্যে ১৭৯ দিনের কথা তাঁর 'কথামৃত' পুস্তক মালার বিষয়বস্তু।

অবশ্য সেই সঙ্গে কিছু কিছু 'পূর্বকথা' আছে।

সেই ১৭৯ দিনের সমীক্ষা করা যায় রামকৃষ্ণের সঙ্গীত প্রসঙ্গে। তাহলে দেখা যায়, তিনি তার মধ্যে গান গেয়েছেন ১০৮ দিন। আর তাঁর গান শোনার বৃত্তান্ত আছে ৬০ দিনের। কোনো কোনো দিন গান তিনি যেমন গেয়েছেন, শুনেছেনও তেমনি।

এই পরিসংখ্যান থেকে ধারণা করা যায়, সঙ্গীত তাঁর জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করে ছিল। বলা চলে, তিনি বাস করেছেন সঙ্গীতের নিরন্তর পরিবেশে। তাঁর যত দিনের বিবরণ মহেন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তার অধিকাংশেই আছে গান। রামকৃষ্ণ হয় নিজেই গান গেয়েছেন, না হলে গান শুনতে চেয়েছেন অপরের কণ্ঠে। তাঁর আগ্রহে অপর গায়করা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে গান শুনিয়েছেন। কিংবা যে গৃহী ভক্তদের বাড়ি তিনি যেতেন, তাঁর গানের আয়োজন করতেন, গান তাঁর একান্ত ভালো লাগে বলে। 'কথামৃত'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রামকৃষ্ণের সঙ্গীত-প্রীতি আর সঙ্গীত-কৃতির পরিচয় জাজ্জ্বল্যমান। ১৭৯ দিনের মধ্যে ১০৮ দিন তিনি গেয়েছেন স্বয়ং। ৬০ দিন গান শুনেছেন গায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে। গান শুনতে শুনতে ভাবস্থ হয়ে পড়েছেন। কখনো বা যোগ দিয়েছেন গায়কের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে।

আর, হিসাবে দেখা গেছে, ওই ১০৬ দিনে ১০৫ খানি গান গেয়েছেন রামকৃষ্ণ। তার মধ্যে ৫৬টি গান গেয়েছেন একবার। কিন্তু ৪৯টি গান একাধিকবার। কোনটি ৮ দিন, কোনটি ৭ দিন, কোনটি ৬দিন, কোনটি ৫ দিন, কোনটি ৪ দিন, তিন দিন, দু দিনও তাঁর গাইবার কথা জানা যায়। তাঁর গাওয়া গানের তালিকা দেওয়া হবে পরে, অন্যান্য গ্রন্থের উদাহরণ যোগে।

এখানে 'কথামৃত'র সাক্ষ্যে দেখা যায়, একেকদিন তিনি গেয়েছেন দু'খানি চারখানি, এমন কি আট-ন'খানি গানও। এমন উদাহরণ কেবল তাঁদের জীবনেই দেখা যায় যাঁদের প্রধান অবলম্বন—সঙ্গীত। কোনো নিরন্তর ঈশ্বর সঙ্গকারী মহাসাধকের জীবনে এ এক অনন্য সংঘটন।

এখানে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। রামকৃষ্ণ-জীবনের মাত্র শেষ চার বছর, মাস কয়েক তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন 'কথামৃত'কার। আর লিপিবদ্ধ করেছেন ১৭৯ দিনের বিবরণ। তার মধ্যে রামকৃষ্ণ ১০৮ দিন গান গেয়েছেন। আর তাঁর গাওয়া গানের সংখ্যা ২১৫ খানি। কারণ ৫৪টি গান একবার আর ৪৮টি গান গেয়েছেন একাধিকবার। মহেন্দ্রনাথ যদি ওই চার বছরে শুধু ছুটির দিনে নয়, অন্যান্য দিনেও রামকৃষ্ণ সকাশে যেতেন ; তাহলে কি তাঁর আরো বহু দিনের সঙ্গীত প্রসঙ্গ পাওয়া যেত না ? তা ছাড়া, তিনি প্রথম রামকৃষ্ণকে দর্শন করেন যখন (ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২), তার এক যুগ আগে রামকৃষ্ণের সাধনজীবন সম্পূর্ণ। ১৮৭৫ থেকে তিনি এসে পড়েছেন বৃহত্তর

জনসমাজের মধ্যে, নির্জন সাধনপর্বের অন্তে। নানা ব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করছেন। তাঁর বাণী শুনতে আসছেন অনেকে, দক্ষিণেশ্বরে। মহেন্দ্রনাথ যদি ১৮৭৫ থেকে রামকৃষ্ণ সন্নিধানে যেতেন এবং 'কথামৃত'-র মতন দিনলিপি রাখতেন তাহলে রামকৃষ্ণের সঙ্গীতপ্রসঙ্গও কি বিপুলাকার হতো, তা অনুমান সাপেক্ষ। তাঁর বিষয়ে প্রধান অবলম্বন হলেও 'কথামৃত'-র এই অসম্পূর্ণতার কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আরেকটি আকর গ্রন্থ—স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এটি তাঁর বিস্তারিত, তথ্যপূর্ণ জীবনী। তাঁর সাধন ও ভাবজীবন সহযোগে তাঁর আনুপূর্বিক জীবনচরিত বলে 'লীলাপ্রসঙ্গ'-তে গানের কথা বেশি স্থান পেতে পারে নি। এটি জীবনী পুস্তক, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কৃত দিনলিপি-জাতীয় বিবরণ নয়। তবু এ গ্রন্থেও তাঁর ২১টি গান গাওয়ার প্রসঙ্গ আছে, বিভিন্ন বয়সে। তার মধ্যে ১২ খানি গান 'কথামৃত'-তেও তাঁর গাইবার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁর এক্ষেত্রে ৯টি গান 'কথামৃত'-র অতিরিক্ত ধর্তব্য। অর্থাৎ 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ'-র সাক্ষ্য অনুসারে তাঁর ১১১টি গান শোনাবার কথা জানা গেল।

রামকৃষ্ণের সঙ্গীত সম্পর্কে তৃতীয় মূল্যবান বই—হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্মৃতিকথা'। এটি স্বল্পখ্যাত এবং স্বল্পায়তন। কিন্তু এই পুস্তিকায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য আছে তাঁর গানের বিষয়ে। লেখক হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি নির্ভরযোগ্যও। কারণ তিনি রামকৃষ্ণের নিকট আত্মীয় ও তাঁরই ঘনিষ্ঠ সূত্রে বইখানির বিষয়বস্তু লাভ করেছেন।

'কথামৃত'-তে অনেকবার পাওয়া গেছে রামলালের কথা। পরমহংসদেবকে তিনি গান শুনিয়েছেন। গায়ক বলেই রামলালের পরিচয় আছে 'কথামৃতের একাধিক স্থানে। রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র, অর্থাৎ তাঁর দ্বিতীয় অগ্রজ রামেশ্বরের পুত্র তিনি। রামলাল দীর্ঘ ১৪ বছর (১৮৭২-১৮৮৬) ঠাকুরের পার্শ্বচর ও সেবক থাকেন দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুর ও কাশীপুর বাড়িতে। রামকৃষ্ণকে তাঁর নানা দিনে গান শোনাবার বিবরণও দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রামলাল-পুত্র হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্মৃতিকথা' থেকে জানা যায় রামকৃষ্ণের গাওয়া গানের একটি তালিকা। পুস্তিকাটিতে লেখক ৮১টি গান প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে রামলাল গাইতেন ৩০ খানি গান। আর বিশেষভাবে রামকৃষ্ণ গাইতেন বলে উল্লিখিত আছে ৫১টি।

দেখা যায়, এই ৫১ খানি গানের মধ্যে ১৮টি আছে যা রামকৃষ্ণের গাওয়ার উল্লেখ পাওয়া গেছে 'কথামৃত' গ্রন্থাবলীতেও। সুতরাং এই 'স্মৃতিকথা'য় অতিরিক্ত ৩৩

খানি গান তাঁর গাইবার কথা জানা গেল। লেখক তাঁর পিতা রামলালের কাছে এই বইয়ের সাঙ্গীতিক তথ্যগুলি পাওয়ায় তাঁর বিবৃতি প্রামাণিক গণনীয়।

তাহলে 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'স্মৃতিকথা'র হিসাবে রামকৃষ্ণের গাওয়া গানের সংখ্যা হলো: ১০২+৯+৩৩=১৪৪। অন্যান্য সূত্রেও তাঁর আরো গানের কথা জানা যায়। সে সব উল্লেখ করবার আগে, 'স্মৃতিকথা'-য় প্রকাশিত একটি সংবাদ দেবার আছে যা অলৌকিক।

যে রামলাল এতদিন গান শুনিয়েছেন রামকৃষ্ণকে, তিনি তার আগে কখনো গান করেন নি। অকস্মাৎ গায়ক হন রামকৃষ্ণের ইচ্ছায় ও প্রার্থনায়। গান গাওয়া দূরের কথা, রামলালের এমন কি কথাবার্তাতেও জিহ্বার জড়তা ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর গান গাইবার সূচনা কি করে হলো, তার আশ্চর্য কাহিনী জানিয়েছেন রামলালেরই পুত্র, পুস্তিকাটির লেখক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—

'ঠাকুর নিজে যেমন মাতৃসঙ্গীত গাহিতে ভালবাসিতেন, তেমনি অপরের মুখে মায়ের নাম গান শুনিতেও ভালবাসিতেন।

বহিরাগত ভক্তরা মাঝে মাঝে আসিয়া ঠাকুরকে গান শুনাইয়া চলিয়া যাইতেন। তাহাতে ঠাকুরের মন ভরিত না। ভাবিতেন, যখনই ইচ্ছা হবে তখনই শুনবো এই রকম কেউ যদি পাশে থাকত তো ভালো হতো।

সদা সর্বদা ঠাকুরের কাছে থাকিতেন আমার পিতৃদেব।

তাই ঠাকুর একদিন মাকে প্রার্থনা জানাইলেন, মা, যদি রামের গলাটা খুলিয়া দিস ত বড় ভাল হয়।

আশ্চর্য! পিতৃদেব কোনদিনই গান গাহিতে জানিতেন না। কিন্তু ঠাকুরের প্রার্থনায় মা তাঁহার আন্তরিক আবেদন মঞ্জুর করিলেন, পিতৃদেব অপূর্ব গান গাহিবার শক্তি দিলেন।

একদিন রামকৃষ্ণদেব পিতৃদেবকে গান গাহিতে আদেশ করিলেন।

ঠাকুরের শয়নকক্ষের পূর্বদিকের বারান্দায় দুইজনে বসিলেন।

পিতৃদেব গান ধরিলেন:

দেখবে চল রাণি, শিবের স্বর্ণ কাশী,
কাশীর কথা কি একমুখে প্রকাশি।
শতমুখে কওয়া ভার
জামাই আর নাই ভিখারী।...ইত্যাদি

গান শুনিয়া ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না।

বলিলেন, 'যা তোর খুড়িকে ডেকে নিয়ে আয়।'

সারদা দেবীকে নহবৎ থেকে ডাকিয়া আনিলে, ঠাকুর বলিলেন, 'রাম গান গাইবে। তুমি শুনবে, তাই ডেকেছি।'

ঠাকুরের কথা শুনিয়া শ্রীমায়ের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

রামলাল গান গাহিবে! তাহার মুখ দিয়া ত স্পষ্ট কথা বাহির হয় না। সে গান করিবে!

বলিলেন, 'সে কি! ওর মুখ দিয়ে যে 'রা' বেরোয় না। ও কি করে গান গাইবে?'...

'না গো না, ও-কথা ভেবুনি। মাকে বলে সব ঠিক করে দিইছি।'

পিতৃদেবের গান শুনিয়া শ্রীমা খুবই খুশি হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, ঠাকুরের পক্ষে সবই সম্ভব।' (পৃঃ ৩৭, স্মৃতিকথা—হরিহর চট্টোপাধ্যায়)।

ঘটনাটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। বিবরণও প্রামাণিক। কারণ লেখক রামলালেরই পুত্র। পিতার নিকটেই প্রসঙ্গটি শোনেন বিবৃতিকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

তারপর থেকে, ঠাকুরের ইচ্ছা হলেই রামলাল তাঁকে গান শোনাতেন। আর সম্ভবত তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনিয়েছেন সর্বাধিক। কারণ এক যুগেরও অধিককাল রামলাল ছিলেন ঠাকুরের নিত্য সেবক।

রামলাল ও তাঁর গানের কথা আবার উল্লেখ করা হবে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ বৃত্তান্তে। এখানে রামলালের সূত্র পর্যন্ত পাওয়া গেল, ঠাকুরের ১৪৪টি গান গাইবার উল্লেখ। এখন পুনরায় আলোচ্য প্রসঙ্গ। অর্থাৎ পরমহংসদেবের গাওয়া গানের সংখ্যা গণনা। আগে তিনখানি পুস্তকের হিসাব নেয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে চতুর্থ মূল্যবান গ্রন্থ—'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি।' লেখকের নাম কমলকৃষ্ণ মিত্র।

বইটির শিরোনাম দেখে আশা হয়েছিল, ঠাকুরের সঙ্গীত সম্পর্কে বিশেষ তাঁর গান ও সমাধি সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্দীপক তথ্য তথা বিবরণাদি যথেষ্ট পাওয়া যাবে। কারণ, পুস্তকের লেখক কমলকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের সমকালীন না হলেও তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ শিষ্য ভক্তদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। গ্রন্থটি তিনি সংকলনও করেন তাঁদের নিকটে প্রাপ্ত উপকরণেই। যাঁদের কাছে এ ব্যাপারে কমলকৃষ্ণ মিত্রের গতিবিধি ছিল, তাঁরা হলেন—শ্রীম, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, রামলাল চট্টোপাধ্যায়, রামলালের ভ্রাতা ও ভগিনী শিবলাল ও লক্ষ্মী প্রমুখ।

তাঁদের নিকটে লেখক ঠাকুরের নানা সাঙ্গীতিক বৃত্তান্ত উদ্ধার করতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হয় নি। তাঁর বইটি মূলত 'কথামৃতে' উল্লিখিত কিছু গানের স্বরলিপি মাত্র। স্বরলিপিগুলি সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য কিনা সন্দেহ। তবে একটি গানের তালিকা আছে শ্রীরামকৃষ্ণের গীত বলে, সেটি অসম্পূর্ণ হলেও পুস্তকটির একমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য। 'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি' বিশেষজ্ঞের রচনা

হলে, আলোচ্য বিষয়ে প্রভূত আলোকপাত হতে পারত। বহু তথ্যাবলীও উদ্ধার লাভ করত ঠাকুরের গান সম্পর্কে।

বইখানির রচনা ও বিষয়বস্তু সমাবেশ অত্যন্ত অসংলগ্ন। বহু অবান্তর কথার মধ্যে থেকে লেখকের এই বিবৃতিটি পাওয়া যায় গ্রন্থের মূল বিষয় সম্পর্কে—'কথামৃতের মোট ৩৮টি গান সহ স্বরলিপি ও ঠাকুরের গাওয়া পরিশিষ্ট গানগুলি…স্বরলিপি সহ দেওয়া হইল।'

উল্লিখিত সূত্রে বলা যায় না কি যে গ্রন্থের নামকরণ বিভ্রান্তিকর, নৈরাশ্যজনক এবং অর্থহীনও! শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া ও শোনা ক'টি গানের স্বরলিপি—এই ধরনের শিরোনামা পুস্তকটির পক্ষে সঙ্গত হতো। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত কোন্‌গুলি এবং সঙ্গীতে তাঁর সমাধিলাভের কোনো বিবরণই কমলকৃষ্ণ মিত্রের এই পুস্তক থেকে জানা যায় না।

যা হোক, রামকৃষ্ণদেব কর্তৃক গীত গানের যে তালিকা লেখক দিয়েছেন তার মধ্যে এমন কতকগুলি আছে যা অন্যত্র নেই। বইখানির যা মূল্য তা এইখানে।

'* এইরূপ চিহ্নের সব গান ঠাকুর গাহিতেন' (পৃঃ ৮৪, ঐ পুস্তক), বলে লেখক ২৯টি গান দিয়েছেন।

সেই গানগুলির মধ্যে দুটি গান আছে যা অন্যান্য পুস্তকেও পাওয়া যায়। যেমন, 'ওরে কুশীলব কি করিস গৌরব' (দাশরথি রায়ের রচনা) ও (নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তপতকাঞ্চনকায়।'

আরেকখানি গান 'ঠাকুর গাহিতেন' বলে লেখক এই তালিকাভুক্ত করেছেন—'প্রেমে জল হয়ে যাও গলে।' এটি রজনীকান্ত সেনের রচনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে গাওয়া অসম্ভব। কারণ রজনীকান্তের (জন্ম ১৮৬৫, জুলাই ২৬) বিশ বছর বয়সে পরমহংসদেবের সঙ্গীতকণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং এক বছর পরে তাঁর দেহত্যাগ ঘটে। কান্তকবির গান রচনা আরম্ভই হয় তার কয়েক বছর পরে।

সুতরাং কমলকৃষ্ণ মিত্রের তালিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া ২৯টি গান থেকে তিনটি বর্জনীয়। সেই হিসাবে 'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি' পুস্তক থেকে তাঁর গীত ২৬টি গান ধর্তব্য। এই গানগুলি তাঁর গাওয়ার কথা অন্য কোনো গ্রন্থ সূত্রে জানা যায় নি।

আগেকার তিনখানি বই থেকে জানা গিয়েছিল যে তাঁর গীত গানের সংখ্যা ১৪৪টি। তার সঙ্গে কমলকৃষ্ণ মিত্রের তালিকা যোগে তা হলো ১৭০টি।

আরো কয়েকটি পুস্তক ও সাময়িক পত্রে ঠাকুরের অন্য কটি গান গাইবার উল্লেখ আছে। যেমন—(১) 'স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী'-তে বিবৃত দুখানি 'আমার ভক্তি

যেবা পায়/সে যে সেবা পায়/...' ও 'চল যাই ভার লয়ে যাই/অযোধ্যায় রাম রাজা হবে/'... (২) স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা'-য় (পৃঃ ১৪) 'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের...।' (৩) (হাটখোলা দত্ত পরিবারের) সুরেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ' পুস্তকে (পৃঃ ২৬)—'আজু ফাগ রণে/দেখি তুমি হার কি আমি হারি...।' (৪) মহেন্দ্রনাথ দত্ত কথিত 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের অনুধ্যান' গ্রন্থে (পৃঃ ৫৯)—'আর কি সাজাবি আমায়/জগত চন্দ্র হার আমি পরেছি গলায়...।' (৫) কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখিত 'আত্মচরিত' পুস্তকে—'কত ভালোবাস গো মা মানব সন্তানে...।' (৬) রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের জীবন বৃত্তান্ত' গ্রন্থে—'ওমা কাঁদছে কে তোর ধন বিহনে...।' (৭) নব বিধান ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৬, অক্টোবর) পত্রিকায় প্রকাশিত—'এই হরিনাম নিস রে জীব...।' (৮) স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও ঘনিষ্ঠ ভক্তদের দুই খণ্ড জীবনী গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত মালিকা'-য় তিনটি গান—'কেন নদে ছেড়ে সোনার গৌর দণ্ডধারী হবি...', 'আমার গোরার সঙ্গী হয়েও ভাব বুঝতে নারলুম রে...' ও 'জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী...।'

এখানে তাঁর গাওয়া ১১টি গানের কথা জানা গেল। সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত ১৭০ টির সঙ্গে তাঁর গীত গানের সংখ্যা হলো—১৮১টি।

কিন্তু এই তালিকাও সম্পূর্ণ নয়। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ ওই ১৮১ ভিন্ন অন্য গানও গেয়ে-ছিলেন, যদিও কার সাক্ষ্য প্রমাণ এ পর্যন্ত প্রকাশ পায় নি। কিছু জানা যায় পরোক্ষ-ভাবে।

'কথামৃত' গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত বিবরণের অতিরিক্ত নানা গানই যে ঠাকুর গাইতেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, 'কথামৃত' তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বে মাত্র চার বছর দু মাসের বিবরণী। তার মধ্যেও ১৭৯ দিনের লিপিবদ্ধ ঘটনাবলী। ঠাকুরের অবশিষ্ট জীবনের 'কথামৃত' গ্রন্থাবলীর তুল্য এমন আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত আর নেই। যদি তা থাকত, তাঁর আরো বহু দিনে নানা গানের উল্লেখ পাওয়া যেত অবশ্যই। স্বামী অখণ্ডানন্দের একটি উক্তি থেকে স্পষ্টই জানা গেছে যে, 'কথামৃতে' বিবৃত হয় নি এমন অনেক গানই শ্রীরামকৃষ্ণ গেয়েছেন। এখানে এমনি আরেকটি সূত্রের উল্লেখ করা যায়।

ঠাকুরের বিশিষ্ট শিষ্য স্বামী অভেদানন্দের এই উক্তিটি স্মরণীয়—'(শ্রীরামকৃষ্ণ) কখনও বা মধুর কণ্ঠে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণের রচিত গান করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। কখনও কখনও তিনি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা কীর্তন করিতেন। কখনও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন রচিত পদাবলী গান

করিতেন এবং আপন মনে মাতোয়ারা হইয়া নূতন নূতন আখর দিতেন।' (আমার জীবনকথা, পৃঃ ৩৮)। 'কথামৃত' প্রমুখ কোনো গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের চণ্ডীদাসের কোনো পদ গাইবার কথা জানা যায় নি। কিন্তু এখানে তা পাওয়া গেল স্বামী অভেদানন্দের বিবৃতি থেকে—

শ্রীরামকৃষ্ণ যতদিন যত গান গেয়েছেন সমস্তই লিপিবদ্ধ হয়নি। ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত তাঁর দৈনন্দিন প্রাসঙ্গিক বিবরণ যদি শ্রীম-র তুল্য অপর কোনো লিপিকারক গ্রথিত করতেন তাহলে তাঁর গানের তালিকা আরো কত দীর্ঘায়ত হতো বলা কঠিন। কারণ, আগে যেমন বলা হয়েছে, শ্রীম. শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাঁর জীবনের শেষ চার বছর দু' মাস মাত্র। তার মধ্যেও কেবল শনি, রবিবার ও ছুটির দিনে। এইভাবেই ঠাকুরের গাওয়া ১৮১ গানের মধ্যে ১০২টি গানই পাওয়া গেছে 'কথামৃত' মাধ্যমে।

এইসব কারণে বোঝা যায়, তাঁর গীত গানের তালিকাটি অসম্পূর্ণ। প্রকৃত সংখ্যার অনেক কম।

আরো একবার কল্পনা করতে ইচ্ছা হয়, যদি 'মাস্টার মহাশয়' মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে যেতেন ১৮৭৫ সাল থেকে—কলকাতার শিক্ষিত তথা গণ্যমান্য সমাজের সঙ্গে যে সময় থেকে ঠাকুরের যোগাযোগ ঘটে—তা হলে তাঁর কি বিপুল, বিচিত্র সাঙ্গীতিক বৃত্তান্ত যে উদ্ধার হত! কারণ মহেন্দ্রনাথ বর্ণিত যতদিনের শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই সঙ্গীতমুখর।

সে প্রত্যাশা পূরণের কোনো সম্ভাবনা নেই বটে। তবে এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা যায় যে, তিনি অন্তত শ দুয়েক গান জানতেন এবং গেয়েছেন।

সংখ্যাটি অল্প নয়। এ ব্যাপারেও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁর সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ছিল দু শ' গান। কখনো পুস্তক কিংবা খাতা দৃষ্টে তিনি গান করেন নি। আর হিন্দী খেয়াল ঠুংরির তুল্য চার পঙ্‌ক্তিরও নয় তাঁর গীতাবলী। প্রায়শই তাঁর গান দশ বারো পঙ্‌ক্তিতে গঠিত। গভীর দার্শনিক তত্ত্বপ্রধান এবং বক্তব্যভারে দীর্ঘাকার। এমনকি সুদীর্ঘ ৩৬ পঙ্‌ক্তির একটি গানও তিনি গেয়েছেন বলে উল্লিখিত—বল রে শ্রীদুর্গা নাম / (ওরে আমার আমার আমার মন রে)। 'আমার অঙ্গ কেন গৌর হল রে' গানখানি আখর সমেত ২০ পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায়। এমনি নানা দীর্ঘকায় কীর্তন গেয়েছেন তিনি। তা ছাড়া, রামপ্রসাদের কয়েকটি বৃহৎ গানও তিনি গাইতেন। তাঁর গাওয়া বিভিন্ন ভক্তিভাবের ও কীর্তনাঙ্গ গানগুলি অধিকাংশই বৃহৎ আয়তনের। তাৎক্ষণিক আখর যোগে বর্ধিত কলেবর হয়ে যায়।

কখনো আকস্মিক প্রেরণায়, কখনো প্রাসঙ্গিক আলোচনায়, কখনো শিক্ষাদানের

উদ্দেশ্যে, কখনো কখনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে, কখনো ঈশ্বরীয় ভাবমত্ততায় তাঁর গান গাওয়া। বিনা প্রস্তুতিতে সদা সপ্রতিভ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতকণ্ঠ! স্মৃতিশক্তির অলৌকিক নিদর্শন তাঁর গীত পরিবেশনা। সিদ্ধ সঙ্গীত-ব্যবসায়ীদের মধ্যেও এমন ঘটনা বিরল-দর্শন। গান-ক্রিয়া তাঁদের জীবনের বৃত্তি ও অবলম্বন, সুদীর্ঘকালের সাধন থেকে দৈনন্দিন অভ্যাস যোগে পরিণত। অর্থকরী পেশার ফলে অনেক সময় এমন দক্ষতা সৃষ্টি হয় বটে। তবু তাঁদেরও মাঝে মাঝে বই বা খাতা দেখে নিতে ও প্রস্তুত হতে হয়।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে? তাঁর নিরক্ষরতার অপবাদ সত্য না হলেও, কিশোর বয়সের পর কোনো পুঁথি পুস্তক আর পাঠ করেন নি তিনি।

তা ভিন্ন, সঙ্গীতক্রিয়া তো তাঁর জীবনে মুখ্য কর্ম নয়। আবার অবসর বিনোদনের প্রিয় মাধ্যমও না। গায়করূপেও তিনি পরিচিত নন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কে এবং পৃথিবীতে কি জন্যে তাঁর অবতরণ ঘটেছিল, সে বিষয়ে তাঁর সমকালীন কিছু ব্যক্তি জেনেছিলেন। যত দিন যাচ্ছে, ততই জানছেন আরো বহুজন। কিন্তু সেই সাধনোত্তর পর্বে, অর্থাৎ যে কালে তিনি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গ করছেন, মিলিত হচ্ছেন সকলের সঙ্গে, ভক্তজনদের মধ্যে বিরাজমান হচ্ছেন, সর্বদা যাঁর কথোপকথনের একমাত্র বিষয় ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, দর্শনার্থীদের যিনি শান্তি আনন্দ জ্ঞান ভক্তি তথা অধ্যাত্ম ভাবে উদ্বুদ্ধ করছেন, চিহ্নিত শিষ্যদের সাধনপথে অগ্রসর করে দিচ্ছেন, নরেন্দ্রনাথকে গঠিত করছেন লোকহিতে বিরাট কর্মযজ্ঞের জন্যে, প্রতিদিনই যাঁকে ঈশ্বরের উদ্দীপনায় ভাবস্থ বা সমাধিস্থ হতে দেখা যায়, আবার যিনি দৈনিক বিশ ঘণ্টা পর্যন্তও ধর্ম প্রচারে কথা বলেছেন (স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি—'মদীয় আচার্যদেব'), ঈশ্বরই যাঁর ধ্যান জ্ঞান মনন এবং প্রত্যক্ষ দর্শন—তাঁর সঙ্গীত বিষয়ে নিত্য প্রস্তুতি ও এমন স্মরণশক্তি-যুক্ত নৈপুণ্য পরম বিস্ময়কর। এক কথায়—লোকোত্তর ব্যাপার।

বক্তব্যপ্রধান শ' দুয়েক গান শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্থ, সদা-প্রস্তুত ছিল আর তিনি যে-কোনো উপযুক্ত প্রসঙ্গে তেমনি গান শুনিয়ে দিতেন। আর প্রতি গানই এমন সানুরাগে ভাবাবেগে উদ্বেল হয়ে গাইতেন যে নিজেরই চোখে অশ্রু ঝরত আর সে গানের প্রভাবে মুগ্ধ, অভিভূত হতেন শ্রোতারা।

পঞ্চম অধ্যায়

তাঁর গান-'শিক্ষা'র কথা, তথা শিল্পী-সত্তা

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আরেক রহস্য—তাঁর সঙ্গীত-'শিক্ষা' বা সংগ্রহ। এমন নানা ধরনের শ' গান যিনি শিল্পীরূপে সার্থকভাবে গাইতেন তিনি অবশ্যই গায়ন-শিল্পীরূপে স্বীকার্য।

স্বীকার্য! কিন্তু ভাবজীবনে আবাল্য সিদ্ধ তিনি। তার মধ্যে এত গান শিক্ষার অবকাশ মিলল কি করে? এও এক পরম প্রশ্ন তাঁর অনবসর জীবন সম্পর্কে।

শ্যামাসঙ্গীত, পদাবলী কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভজনাদি নানাপ্রকার গান তিনি গাইতেন। এই বিভিন্ন রীতির শ' দুয়েক গান তিনি যথাযথ শিখলেন, অর্থাৎ আয়ত্ত করলেন কিভাবে? কোথায়? জীবনের কোন্ পর্বে?

তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, কোনো গায়কের নিকটে তিনি গায়ন বিষয়ে পাঠ কিংবা উপদেশ পান নি। কোনো গুণীর কাছে শিক্ষালাভ করে তিনি গায়ক হন নি।

নিশ্চিতভাবে বলা চলে, রামকৃষ্ণ গান শিখেছেন শুনে শুনে। অপর গায়কদের গান শুনেছেন এবং আত্মস্থ করে নিয়েছেন। তাঁর গীতিকণ্ঠ, সুরবোধ ও সঙ্গীতপটুত্ব স্বভাবদত্ত।

এমন দৃষ্টান্ত অবশ্য আরো দেখা গেছে এবং তা সঙ্গীতজগতেই। প্রতিভাধর গায়নশিল্পীরা সকলেই শ্রুতিধর এবং গান শুনে শিখে নেবার ক্ষমতা তাঁদের থাকে। বিশেষ সেই ধরনের গান, যা গাইতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ ধ্রুপদ খেয়ালের তুল্য যা গুরুর নির্দেশে বিধিবদ্ধভাবে শিক্ষাসাপেক্ষ নয়।

কিন্তু তবু লক্ষণীয় ব্যাপার আছে তাঁর ক্ষেত্রে। রীতিমত পদাবলী কীর্তন, কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত (যা টপ্পাতে গাওয়ার প্রচলন) প্রভৃতি সার্থকভাবে পরিবেশন প্রতিভাবান গায়ক ভিন্ন সম্ভব নয়, বিশেষ যদি সেসব গান শ্রুতির ফলে শিক্ষা হয়ে থাকে। স্বভাব গায়ক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিভা স্বয়ং প্রকাশ।

ভাব-জীবনের তুল্য তিনি গায়ন-জীবনেও সহজ-সিদ্ধিপ্রাপ্ত। স্বরূপজ প্রতিভায় তিনি গায়ক হয়েছেন। তাঁকে কোনো অভ্যাস করতে হয় নি এজন্যে। তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠ একেবারেই পূর্ণ বিকশিত, যে ধরনের গানে স্ফূর্তিলাভ করেছে তাঁর প্রাণ। সঙ্গীত বিষয়ে অদীক্ষিত হয়েও তিনি সুপটু। তাঁর কণ্ঠ বেসুর নয়, রীতিমত সুরেলা। এককালীন বহু সংখ্যক শ্রোতৃবৃন্দকে সুমিষ্ট কণ্ঠে পরিতৃপ্ত করবার যোগ্যতাসম্পন্ন। সিদ্ধ

গায়কের গীতি-কণ্ঠ তাঁরা নানা মার্জিতকণ্ঠ শিক্ষিতপটু গায়ক কিংবা সঙ্গীতব্যবসায়ী কীর্তনীয়া তথা অন্যান্য গুণীদের সহযোগে তাঁর গান গাওয়ার দৃষ্টান্তে তা ধারণা করা যায়। মাত্র শুনে, অর্থাৎ নিয়মিত চর্চা না করে, এত গানের এমন সফল গায়ক হওয়াও বিশিষ্ট গায়ন-প্রতিভার নিদর্শন। তিনি যে সাধন-সাপেক্ষ রাগসঙ্গীতের গায়ক নন, তাঁর অনুষ্ঠিত গানগুলি যে প্রধানত কাব্যসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত ভক্তি-গীতি, তা হলেও তাঁর সঙ্গীতগুণের ব্যত্যয় হয় না। এই গীতাবলীও যে মধুর সুরেলা কণ্ঠে শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন তাই তাঁর সঙ্গীতকৃতির সাক্ষর-সূচক। কারুর কাছে যে তাঁকে শিক্ষা করতে হয় নি তাঁর এই সামর্থ্যও স্মরণীয়।

এখন প্রশ্ন, তিনি এত গান যে শুনে শুনে শিখেছিলেন, তা কোথায়? এবং তাঁর জীবনের কোন্ সময়ে বিভিন্ন গায়কদের অনুষ্ঠান শুনে তিনি গানগুলি শিক্ষা বা সংগ্রহ বা আত্মস্থ করেছিলেন?

তার মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে তিনি প্রায় ত্রিশ বছর বাস করেছিলেন। সেখানে তাঁর দশ-এগারো বছরের ছিল সাধন পর্ব। অর্থাৎ ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত। সে সময় গানের নিয়মিত অভ্যাস রাখা অসম্ভব ছিল। শিক্ষার সুযোগ আরো কম। কারণ তখন কোনো গায়কের যাতায়াত হয় নি দক্ষিণেশ্বরে। তারপর শেষোক্ত সময় থেকে ১৮৭৫ সনের মধ্যবর্তীকালে?

তখনো বৃহত্তর ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসিদ্ধি হয় নি। সেজন্যে এখানে সঙ্গীতজ্ঞদেরও আগমন ঘটত না, যে তিনি শিক্ষা করবেন তাঁদের দৃষ্টান্তে ও অনুষ্ঠানে।

মনে রাখা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় সর্বাংশে বাংলা গান গাইতেন। মাত্র কয়েকটি হিন্দী ভজন তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়, যেমন রামাইৎ সম্প্রদায়ের কিংবা কবীরাদের ভজন। সেইসব ভজন গান তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সমাগত বা সাময়িক নিবাসী পশ্চিমাঞ্চলের সাধু সন্তদের মুখে শুনেছিলেন।

সুতরাং তিনি তাঁর গানগুলি আপন কণ্ঠে ধারণ করেন প্রধানত বাঙালী গায়কদের দৃষ্টান্তে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে বাংলার নানা কৃতী সন্তানের মতন গায়ন-শিল্পীরাও দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হতে থাকেন—১৮৭৫ সালের পরে। কেশবচন্দ্র সেন এবং ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় পরমহংস সম্বন্ধে প্রচারের ফলে সেই প্রক্রিয়ার সূচনা। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক চরিত্র ও বাণীর আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে তাঁদের সমাগম ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে যখন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা), বৈষ্ণবচরণ, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গায়কদের যাতায়াত এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান আরম্ভ হয়—অর্থাৎ ১৮৭৫-এর পরবর্তী সময়ে—তখন শ্রীরামকৃষ্ণকেও তো তাঁদের সঙ্গে সমান তালে

গাইতে দেখা যায়। অর্থাৎ ঠাকুর তার অনেক আগেই রীতিমত গায়ক। সুতরাং, তাঁদের দৃষ্টান্তে নয়, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার অনেক আগে থেকেই তিনি বহু সংখ্যক গীতের গায়নশিল্পী।

কেশবচন্দ্রকে তিনি প্রথম আলাপের দিনেই (১৮৭৫, মার্চ) 'কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন' গানটি শুনিয়েছিলেন। সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণের পরিণত বয়স, প্রায় চল্লিশ বছর। তাঁর গানের প্রথম আত্মস্থ করণের যুগ তা নয়, গায়করূপেও সুপরিণতির কাল।

কারণ তার অনেক বছর পূর্ব থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের গায়নশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রীতিমত গান শোনানো এবং একাধিক বিশিষ্ট শ্রোতাকে পরিতৃপ্ত করার কথা। যথা—কবি শ্রীমধুসূদন এবং আরো এক যুগ আগে রাণী রাসমণিকে 'ওই সালের অন্তত ছ' বছর আগে' (১৮৬৮/৬৯), তিনি মাইকেল মধুসূদনের ধর্ম জিজ্ঞাসার উত্তরে গেয়েছিলেন সাধক কমলাকান্ত ও রামপ্রসাদের গান।

মাইকেল-সাক্ষাতের দশ-বারো বছর আগে রাণী রাসমণিকে শ্রীরামকৃষ্ণের গান শোনাবার কথা জানা যায়।

দক্ষিণেশ্বরে ঐতিহাসিক কালীমন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার (১৮৫৫, ৩১ মে) পর রাণী রাসমণি জীবিত ছিলেন ছ বছর। মৃত্যুর (১৮৬১,) কিছুকাল আগে পর্যন্ত তিনি দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে আসতেন।

মন্দির স্থাপনার সময় থেকে ভবতারিণী কালীর পূজক নিযুক্ত হন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ অগ্রজ তিনি। রামকৃষ্ণও তিন মাসের মধ্যে প্রথমে বিগ্রহের বেশ-কার ও পরে বিষ্ণু মূর্তির পূজারী হয়েছিলেন। তারপর রামকুমারের মৃত্যুতে তাঁকে নিয়োগ করা হয় কালী মন্দিরের পূজক পদে।

১৮৫৫ থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর নিবাসী থাকেন। রাণী রাসমণিও তাঁর সঙ্গীত কণ্ঠের পরিচয় পান প্রথমাবধি। তারপর কয়েক বছর যাবৎ অনেক দিনই অনন্য এই পূজারীর গান সাগ্রহে তিনি শুনেছিলেন।

সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে আগমনের আগেই মধুর-কণ্ঠ গায়ক ছিলেন রামকৃষ্ণ। তাঁর গানের সংগ্রহও যথোচিত ছিল।

এখানে মনে রাখা যায়, দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর বয়স উনিশ বছর। তার পরের বছর থেকে যথাবিধি বিগ্রহ পূজারী থাকা অসম্ভব হয় রামকৃষ্ণের পক্ষে। ঈশ্বর লাভের ব্যাকুলতায় তিনি উন্মাদপ্রায় হন। তাঁর সেই দিব্যোন্মাদ অবস্থা এবং বিভিন্ন মতে ঐকান্তিক সাধন-কাল প্রায় এগার বছর ধর্তব্য। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৬/৬৭ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আগত রামাৎ সম্প্রদায়ের সাধুদের কাছে

তিনি কটি ভজন সংগ্রহ করেছিলেন জানা যায়। তার মধ্যে আছে তুলসীদাসের 'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরায়ী।' তা ছাড়া, কবিরের হিন্দী ভজন 'সেবা বন্দি আওর অধীনতা'-ও প্রাপ্ত হন এই পর্বে। কিন্তু কোনো বাঙালী গায়কের সে সময় দক্ষিণেশ্বরে আগমন ঘটত না। সেজন্যে তাঁর পক্ষেও এই পর্বে বাংলা গান সংগ্রহ করা সম্ভব না, এখানে অবস্থান করে।

ওই বছরগুলির মধ্যে তাঁর বিবাহের জন্যে কামারপুকুরে কয়েক মাস অবস্থান এবং পরে মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থযাত্রাও হয় পশ্চিমাঞ্চলে। অবশিষ্ট সমস্ত সময়টি তাঁর দক্ষিণেশ্বরে কঠোর তপশ্চর্যায় উদ্‌যাপিত হয়ে যায়। তা হলো তাঁর বিশ থেকে ত্রিশ একত্রিশ বছর বয়সের কথা। এই পর্বে তাঁর গানের প্রসঙ্গ স্বাভাবিক কারণেই অপ্রাপ্য। একমাত্র কাশীতে সিদ্ধ বীণ্‌কার মহেশচন্দ্র সরকারের যন্ত্র-সঙ্গীতের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠ সহযোগিতার উল্লেখ পাওয়া গেছে ১৮৬৬ সালে। তাও তাঁর সুপরিণত সঙ্গীতশক্তির পরিচায়ক, শিক্ষানবীশ পর্যায়ের সূচক নয়।

সুতরাং দক্ষিণেশ্বর নিবাসী হওয়ার অর্থাৎ ১৮৫৫-র আগে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ রীতিমত গায়নক্ষম ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত করা হলো পূর্বাপর তথ্য বিবরণের ভিত্তিতে। তাঁর গান আত্মস্থ করার সময় উনিশ বছর বয়সের পূর্ববর্তী। সচরাচর অনেক প্রতিভাবান গায়কের জীবনেই এই বয়সে সঙ্গীতচর্চা ও গীতকণ্ঠ লাভের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বেশির ভাগ গায়কই গঠিত হন প্রথম যৌবনে।

এ পর্যন্ত, সঙ্গীত 'শিক্ষা' বা সংগ্রহের সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরকাল থেকে পর্যালোচনায় তাঁর প্রথম জীবনের দিকে পিছিয়ে আসা হচ্ছিল। আলোচনার সুবিধা ও ধারাবাহিকতার জন্যে এই বিপরীত পরিক্রমার প্রয়োজন ছিল।

এখন তাঁর বাল্যজীবন থেকেই সঙ্গীত প্রসঙ্গ আরম্ভ করা বিধেয়। কারণ নিতান্ত বালক বয়সেই রামকৃষ্ণের গীতিকণ্ঠ প্রকাশ পায়, যেমন দেখা যায় প্রতিভাধর গুণীদের জীবনে।

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি (বাংলা সন ১২৪২, ৬ই ফাল্গুন) তাঁর জন্ম। বাড়িতে ও পরে গ্রামে তিনি গদাধর নামে পরিচিত হন। ধর্মপ্রাণ পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবে তাঁদের সর্বতোমুখী ধর্মের সংসার।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে গদাধর পিতার সুললিত কণ্ঠে দেব দেবীর স্তোত্র পাঠ শুনতে থাকেন। আর রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান। ঈশ্বর ভক্তির দৃষ্টান্ত পান পিতামাতার দৈনন্দিন আচরণে; কথাবার্তায়।

গদাধরকে পাঠশালায় ভর্তি করা হয় পাঁচ বছর বয়সে। তাঁদের কুটিরের কাছেই হালদার

পরিবারের গৃহ চত্বর। তারই নাটমণ্ডপে সেই পাঠশালা। হালদার-পুকুরও গদাধরদের বাড়ির প্রায় পাশেই। উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ যে পুষ্করিণীটির নাম উল্লেখ করেছেন একাধিক প্রসঙ্গে।

শিশু বয়সেই গদাধরের আশ্চর্য মেধা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরে এবং বাইরে।

পিতার মুখে শোনা স্তব স্তোত্র সঠিক মনে রাখেন গদাধর। আর তেমনি সুরে আবৃত্তি করেন। পিতার কাছে শুনেই আয়ত্ত করেন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের নানা কাহিনী। তেমনি গেয়ে থাকেন অন্যের মুখে শোনা গান। গদাধর বড়ই সঙ্গীতপ্রিয়। ক্রমে বালকের আরো বিভিন্ন গুণ স্বভাবের প্রেরণায় প্রকাশ পেতে থাকে। গান ছাড়াও তাঁর অন্য ক'টি শিল্পকর্মের সুন্দর সূচনা হয় তখন থেকে। সামগ্রীকভাবে বলা যায়, তাঁর মূল শিল্পী-চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রদর্শন মাধ্যম। সঙ্গীত ভিন্ন আরো তিনটি নন্দন-গুণ মুকুলিত হয় গদাধরের চরিত্রে। তা হলো—মূর্তি গঠন, চিত্রাঙ্কন ও অভিনয়। বাল্যজীবনেই সেই সকল বৃত্তির অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। তাদের পরিচয় দেয়া হবে তাঁর গানের প্রসঙ্গ আরম্ভ করার আগে।

তাঁর জন্ম ও প্রথম বিদ্যা আহরণ এবং বিচরণের নির্ধারিত ক্ষেত্র কামারপুকুর। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, এই সকল সুকুমার বৃত্তি অনুশীলনের অনুকূল পরিবেশ তার চতুঃ-সীমার মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন। সেকালের নানা চারুশিল্প চর্চায় অনুষ্ঠানে চিত্তরঞ্জক পল্লী কামারপুকুর। গ্রামের গায়ক, কুমার, পটুয়া আর যাত্রাপালাকারদের দৃষ্টান্তে গান, ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া আর যাত্রা পালা অভিনয়ের প্রেরণা পান গদাধর। জন্মভূমির পটভূমিকাতেই তাঁর সকল ললিতকলা চর্চার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে।

গ্রামে কুমোরদের পাড়ায় যান গদাধর। তাদের হাতে দেবদেবীদের মূর্তি গড়া দেখতে বালকের বড় ভালো লাগে। নিবিষ্ট হয়ে তাই দেখেন কিন্তু শুধু দেখে তৃপ্ত থাকেন না গদাধর। তারপর নিজেই সেই সব মূর্তি গড়েন বাড়িতে বসে। সকলের প্রশংসা পায় তাঁর গড়া দেবদেবীর মূর্তি।

পরে তাঁর দক্ষিণেশ্বরের প্রথম জীবনেও এই বিগ্রহ গঠন নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তখন তিনি বিষ্ণু মন্দিরের পূজারী। একবার গোবিন্দজীর বিগ্রহের একটি পা ভেঙে গিয়েছিল। তিনি তা নতুন করে গড়ে, মিলিয়ে দেন নিখুঁত ভাবে। মূর্তি গঠনের অবকাশ পরবর্তী জীবনে আর তিনি পান নি।

কামারপুকুরে সেই বালক বয়সেই তাঁর ছবি আঁকারও হাত দেখা যায়। তেমনি তা শিখে নেবার জন্যে তাঁর সচেতন আগ্রহ ও প্রয়াস। গ্রামের দক্ষ পটুয়াদের সঙ্গে গদাধর মিশতেন অঙ্কন শিক্ষার উদ্দেশ্যে। তাদের অনুসরণে তিনি নিজে ছবি আঁকতেন।

ক্রমে নিপুণ হয়ে ওঠেন অঙ্কনে।

উত্তর জীবনেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর চিত্রাঙ্কণ ক্ষমতা, যদিও এবিষয়ে চর্চা রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু তাঁর এই অঙ্কন-শক্তি বর্তমান ছিল পরিণত বয়স পর্যন্ত। একবার যুবক বয়সে ছবি এঁকেছিলেন ভগ্নী ও ভগ্নিপতির একত্রে। সে চিত্র চমৎকার হয়েছিল।

অন্তিম জীবনেও এই শক্তির পরিচয় দেন কাশীপুর বাড়িতে। তখন তিনি কাল ব্যাধিতে রুদ্ধ-কণ্ঠ। অনেক সময় আকারে ইঙ্গিতে, কখনো বা কাগজে লিখে সংক্ষেপে কোনো বক্তব্য জানাতেন। এমনি সময়ে একদিন যে কাগজে লিখেছিলেন—'নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘুরে বাহিরে হাঁক দিবে।' তারই নিচে এঁকেছেন একটি তাৎপর্যপূর্ণ রেখা-চিত্র : একটি স্থিরদৃষ্টি মানুষের মুখ আর তার পিছনে এক ময়ূর !

সেই শেষ পর্বেই তিনি আরেকদিন একটি চিত্র অঙ্কন করেছিলেন সারদাদেবীর জন্যে। শ্রীমাকে তখন ঠাকুর সাধনের নানা নির্দেশাদি দিতেন। সেই সূত্রে একদিন কুলকুণ্ডলিনী, ষঠচক্র ইত্যাদির ছবি কাগজে এঁকে দেখিয়েছিলেন সারদাদেবীকে।

তাঁর হাতে আঁকা আরেকটি চিত্র দক্ষিণেশ্বরের দেওয়ালে অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। কাঠ কয়লা দিয়ে এঁকেছিলেন—টবের ওপর পদ্ম-ফুলের গাছ। আর সেই ফলের ওপর একটি পাখি। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ দেওয়ালে সেই ছবি তাঁর তিরোভাবের বহুকাল পরেও দেখা যেতো। রামলাল সেই চিত্র অনেককে দেখাতেন ঠাকুরের নিজের হাতে আঁকা বলে।

এইভাবে দেখা যায়, নিয়মিত অভ্যাস না থাকলেও ছবি আঁকার নৈপুণ্য তাঁর বরাবরই ছিল।

মূর্তি গঠন ও চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে গদাধরের আরো একটি বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাও বাল্যবয়স থেকে। তাঁর শিল্পী মনের আরেক প্রকাশ। তা হলো তাঁর অভিনয় ক্ষমতা ও সেই ব্যাপারে অদ্ভুত অনুকরণ শক্তি।

কামারপুকুরে যত যাত্রাপালা বালক গদাধর দেখতেন, সে-সবের হুবহু অনুকরণ তিনি করতেন। পালাগুলির অভিনয় করে দেখাতেন নিজে। শুধু তাই নয়, সঙ্গীদের নিয়ে তাঁর সেই সব পালাভিনয় করবার কথাও জানা যায়।

গদাধরের এ বিষয়ে শক্তি দেখে সমবয়সী কয়েক বন্ধু মিলে একটি যাত্রাপালার গোষ্ঠী তৈরি হয় কামারপুকুরে। কিশোর গদাধরই হন দলপতি ও শিক্ষক।

কামারপুকুর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে মানিকরাজার প্রকাণ্ড আমবাগান। মহলা আর অভিনয়ের সুবিধার জন্যে সেটিই তাঁদের নাট্যস্থল হলো। জ্যেষ্ঠদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেখানেই চলল মহলা। অভিনয়ও হলো আমবাগানের মধ্যে। রাম এবং কৃষ্ণলীলা

বিষয়ে যাত্রাপালা। সেই সব যাত্রা অভিনয়েই গদাধরের থাকত প্রধান ভূমিকা। অপরের ভাবভঙ্গী ধরন-ধারণ অনুকরণ করবার তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সাবলীল অঙ্গচালনা। আর সেই সঙ্গে সুকণ্ঠ, বাকপটু তিনি। সর্বসাকুল্যে গদাধরের নটোচিত নানা গুণই সহজাত ছিল।

কৈশোরের পরে নাট্যবৃত্তির চর্চা করা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে। তবু পরিণত উত্তর-কালেও ভাবাভিব্যক্তিতে যে দক্ষতা শ্রীরামকৃষ্ণ দেখান, সকলে চমৎকৃত হতেন। তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো এখানে :—

তখনো তিনি দক্ষিণেশ্বরে আছেন। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হবার পরবর্তী সময়ের কথা। অর্থাৎ আগস্ট, ১৮৮৪ সালের পরে। গিরিশচন্দ্র তাঁর স্নেহাশীষ লাভ করেছেন ও ঐকান্তিক ভক্ত হয়েছেন। তাঁর নাটক ও নাট্যমঞ্চকে প্রীতির চক্ষে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা', 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'বৃষকেতু', বিবাহ বিভ্রাট' প্রভৃতি অভিনয়ও প্রত্যক্ষ করেছেন। অমৃতলাল বসু, বিনোদিনী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নটনটীরাও তাঁকে অবতার জ্ঞানে মান্য করেন নাট্যাচার্যের দৃষ্টান্তে। এমন এক সময়ের কথা। সেদিন নাট্যশালার কয়েকজন নটী তাঁকে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন।

বিবরণটি দিয়েছেন, স্বামীজীর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত : 'দক্ষিণেশ্বরে একবার থিয়েটারের অনেকগুলি অভিনেত্রী গিয়াছিল। তাহারা পরমহংসদেবকে 'সীতা' ও 'সাবিত্রী' অভিনয় করিয়া দেখাইল। পরমহংসদেব তাঁহাদিগকে কীর্তন গায়িকাদের দূতী সংবাদ ইত্যাদি অভিনয় করিয়া দেখাইলেন। কীর্তন গায়িকারা কিভাবে তাহাদের বড় নথটি উঠাইয়া পানের পিচ্ ফেলে, কি করিয়া হাত নাড়ে, কি করিয়া গলা ও মাথা নাড়ে তিনি তাহা অবিকল দেখাইতে লাগিলেন। অভিনেত্রীরা ইহাতে আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'ইনি সাধু হয়ে কি করে এত মেয়েলী ঢঙ্ জানেন।'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান পৃঃ ১৯৭)

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাভিনয় শক্তির একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার :—'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক।… শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের পর পরমহংসদেবের শ্রীমুখে বিল্বমঙ্গলের উপাখ্যান শুনিয়া গিরিশচন্দ্র এই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ভক্ত চরিত্রের সহিত একটি ভণ্ড চরিত্র অঙ্কনে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সাধক চরিত্রের ইহাই মূল। পরমহংসদেব একদিন ভণ্ড সাধুদের হাবভাব গিরিশচন্দ্রকে হুবহু নকল করিয়া দেখাইয়াছিলেন।'

(গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ৩১৩)।

শ্রীরামকৃষ্ণ নাটক অভিনয় দেখতে যেমন ভালবাসতেন তেমনি সচেতন ছিলেন নাট্য-

শালার সামাজিক কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে। তাঁর প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের যখন ধর্মজীবনে উত্তরণ ঘটে, তিনি নট-নাট্যকার বৃত্তি পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা করতে পারেন নি শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধের ফলে। 'কথামৃত' গ্রন্থে তা উল্লিখিত।

সেদিন (১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪) তিনি বীডন স্ট্রীটের স্টার থিয়েটারে এসেছেন। অভিনয় হবে গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ' চরিত্র। বক্সে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তখন গিরিশচন্দ্র কথা বলছেন, নাটক আরম্ভ হবার আগে। বাবুরাম এবং মাস্টারমশায়ও উপস্থিত আছেন। তার বিবরণ দিয়েছেন গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ—

'শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বা! তুমি বেশ সব লিখেছো।'

গিরিশ—মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, তোমার ধারণা আছে।...

গিরিশ—মনে হয়, থিয়েটারগুলো আর করা কেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না না, ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে।'

(কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১০৩)

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরোয়াভাবে অভিনয় শক্তি প্রদর্শনের আর একটি নিদর্শন দিয়েছেন শ্রীম. :

'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন ও ছোট খাটটিতে বসিয়া বসিয়া তাহাদিগকে কীর্তনীর ঢঙ্ দেখাইয়া হাসিতেছেন। কীর্তনী সেজেগুজে সম্প্রদায় সঙ্গে গান গাইতেছে। কীর্তনী দাঁড়াইয়া, হাতে রঙিন রুমাল, মাঝে মাঝে ঢঙ্ করিয়া কাশিতেছে ও নথ তুলিয়া থুথু ফেলিতেছে। আবার যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে ও বলিতেছে 'আসুন।' আবার মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ, অনন্ত ও বাউটি ইত্যাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে।

অভিনয় দৃষ্টে ভক্তরা সকলেই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

(কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১১৮)।

নাটকাভিনয়ের প্রতি তাঁর সানুরাগ আগ্রহ সেই ছেলেবেলা থেকে। যখন তিনি যাত্রাপালায় যোগদান করতেন বন্ধুদের দলপতি হয়ে, কামারপুকুরে।

মূর্তি গড়া, ছবি আঁকা, আর মানিক রাজার আমবাগানে নিজেদের সখের যাত্রা করা। বালক গদাধরের তখন এইসব নিয়ে দিন কাটছে। তেমনি প্রাণের আনন্দে সেই সময় থেকে তাঁর সঙ্গীত চর্চারও সূত্রপাত তাঁর প্রকৃতিদত্ত মধুরকণ্ঠ। অপরের মুখে শোনা গান তিনি মিষ্টি গলায় গেয়ে সকলকে তৃপ্তি দেন। আর গানের ব্যাপারেও

প্রকাশ পায় গদাধরের সেই অসামান্য স্মরণশক্তি, মেধা আর নৈপুণ্য। অপরের মুখে শুনে তিনি অবিকল গাইতে পারেন। আর গোটা গোটা গান কণ্ঠস্থ থাকে তাঁর। গ্রামে যেসব যাত্রাপালার নকল করে অভিনয়ের চর্চা, সেই যাত্রাগান শুনেই তাঁর অনেক গান শেখা। তা ছাড়া চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যেবেলায় সংকীর্তনের আসর থেকেও। কিংবা লাহাদের অতিথিশালায় সাধু বৈরাগীদের মুখে শুনেও গান আয়ত্ত করে নেন গদাধর। যা একবার শেখেন, মনে একেবারে মুদ্রিত হয়ে যায়।

কামারপুকুরের কোথাও যাত্রা হলেই গদাধরের শুনতে যাওয়া চাই। নানা শাস্ত্রীয় উপাখ্যান, পুরাণ-কাহিনী যেমন সেইসব যাত্রা থেকে জেনে নেন, তেমনি তাদের গানগুলিও শিখে নেন মনে মনে। পরে আবার সেই গান গ্রামের শ্রোতাদের শুনিয়ে দেন। ভালো লাগে সকলের।

এমনি করেই তাঁর সঙ্গীতের শিক্ষা, সংগ্রহ আর চর্চার সূচনা সেই প্রথম জীবন থেকে।

গদাধরের স্বভাবে আরেকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তিনি যেমন সদানন্দ তেমনি কৌতুক ও রঙ্গপ্রিয়। এই গুণেও সবাই পছন্দ করেন তাঁকে। গ্রামের ঘরে ঘরে তাঁর যাওয়া-আসা আর প্রীতিকর সঙ্গ। তিনি যেখানে উপস্থিত থাকেন, সেখানেই আনন্দের হাট। যাত্রাপালায় শোনা উপাখ্যান তিনি আবার সকলকে শোনান। বর্ণনা করেন চিত্তরঞ্জক ভাবে। কিভাবে সেসব বললে শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট হয় সে বোধও আছে বালকের। উত্তরকালে যে অনর্গল বাক্‌পটুতায় সকলকে আনন্দ আর শান্তি দিয়েছেন, তার সূত্রপাতও এই বাল্যজীবনে, সহজাত শক্তিতে। তাঁর সুকণ্ঠে রঙ্গিনী সুবচন ঝরে। গানের মতন পুরাণ কাহিনী শুনিয়েও তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। পল্লীনারী ও গৃহবধূদের বিশেষ প্রিয় হন গদাধর। তাঁর মুখে গান শোনা ভিন্ন তাঁরা তাঁকে খাওয়াতেও ভালবাসেন। তাঁর বয়স তখন সাত-আট বছর।

এই সব তথ্য বিবরণ দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় শিষ্য স্বামী সারদানন্দ। তাঁর লিখিত সুবিস্তৃত জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' থেকে ঠাকুরের এই বাল্য পরিচয় বিবৃত করা হলো। তাঁর গানের প্রথম যুগের প্রসঙ্গে সেই পটভূমিও জানা প্রয়োজন।

উক্ত গুণাবলীতে কামারপুকুরে সকলের স্নেহধন্য হয়েছেন প্রিয়দর্শন প্রিয়ভাষী গদাধর।

কেবল বিদ্যাচর্চার বাঁধা পাঠে তাঁর অনীহা, যদিও পাঠশালায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তাঁর বিশেষ বিরাগ গণিতে। পরবর্তী জীবনে নিজেই বলেছেন, 'শুভঙ্করী বাঁধা লাগত।'

এমনি নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের অন্য দিকে দেখা যায়—গভীরতা। সেই বালক বয়সের পক্ষে অসাধারণ—একাগ্র, ভাবুক চিত্ত। তারই এক পরম অবস্থায় তাঁর ভাবস্থ হওয়া। পরবর্তীকালের সাধন তপস্যার ফলস্বরূপ প্রথম প্রাপ্ত নয়। তার বহু আগে, নিতান্ত বাল্যজীবনেই তাঁর ভাবসমাধির সংকেত।

স্বামী সারদানন্দ তাঁর ভাবজীবনের বিশ্লেষণ করে যা জা নিয়েছেন তাই এক্ষেত্রে দিকদর্শনীস্বরূপ। তা হলো, ঠাকুরের অধ্যাত্মজীবনে আগেই দেখা দেয় ফল। ফুল পরে ফোটে। আগে সিদ্ধি, পরে সাধন।

গদাধরের বয়স যখন আট বছরও হয় নি, এমন এক দিনে সেই অব্যক্ত মানসিকতার অভিজ্ঞতা হলো।

সেদিন তিনি ভ্রমণ করছিলেন উন্মুক্ত প্রান্তরের পথে। ঊর্ধ্বদিকের বিশাল আকাশ-পটে তখন তাঁর দৃষ্টি গিয়েছিল। নবীন মেঘের ঘন ঘটায় অসীম গগন আচ্ছন্ন। আর তারই বুকে উড়ে চলেছে শুভ্র বলাকার সারি।

সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে বালকের চিত্তে এক অপূর্ব ভাবান্তর ঘটল। সমগ্র জগৎ সংসার শুধু নয়, তাঁর লুপ্ত হয়ে গেল আপন দেহের বোধও। তিনি যেন মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সঙ্গীরা তাঁকে অচৈতন্য মনে করে বহন করে নিয়ে এলো বাড়িতে।

এ বিষয়ে পরে তিনি বলেছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি অজ্ঞান হন নি। সংজ্ঞা ছিল তখনো। আর তাঁর এক আনন্দের অনুভব আর ভাব হয়েছিল যা আগে কখনো বোধ করেন নি।

কিন্তু সবাই তাঁকে জ্ঞানহারা দেখেছিল বাইরে থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রথম ভাবসমাধি।

তার কিছুকাল পরে গদাধরের পিতার মৃত্যু হলো। তা হলো ১৮৪৪ সালের কথা। গদাধরের বয়স তখন আট বছর।

পিতৃবিয়োগের পর থেকে তাঁকে অনেক সময় চিন্তাশীল দেখা যেতে লাগল। আগেকার সদানন্দ সকৌতুক ভাব গেল না বটে। কিন্তু মাঝে মাঝেই গদাধর নির্জনতা-প্রিয় হলেন। সংসারের দিকে যেন দেখলেন নতুন চোখে। পর্যবেক্ষণের শক্তি প্রখর হলো। বয়স যেন তাঁর বৃদ্ধি পেয়ে গেল অকস্মাৎ।

পাঠশালায় আগের মতন যেতে লাগলেন। কিন্তু মন বসল না লেখাপড়ায়। পিতার অভাব বোধ নানাভাবে যেন পূরণ করতে চাইলেন। মন বেশি গেল যাত্রা গান আর পুরাণ কথা শোনা, দেব দেবীর মূর্তি গড়ায়।

লাহা পরিবারের অতিথি ভবনে তাঁর যাতায়াত এখন ক্রমেই বাড়তে লাগল। তার

কারণ এখানে আছে সাধু বৈরাগীদের প্রিয় সঙ্গ। লাহা পরিবারের কথায় বলে রাখা যায় যে, ধর্মদাস লাহা ছিলেন গদাধরের পিতৃবন্ধু। আর ধর্মদাসের পুত্র গঙ্গাবিষ্ণু তেমনি গদাধরের প্রিয় বয়স্য।

তাঁদের স্বগ্রাম কামারপুকুরের আরেকটি বিশেষত্বও উল্লেখ্য।

পূর্ব ভারতের তীর্থ পরিক্রমার ক্ষেত্রে কামারপুকুর গ্রামটির লক্ষ্যণীয় স্থান আছে। পশ্চিমাঞ্চল থেকে শ্রীক্ষেত্র পুরী যাবার পথে কামারপুকুরের অবস্থান। বাংলা তথা পূর্ব ভারতেরও অনেক অঞ্চল থেকে জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপনীত হবার পথ গেছে এখান দিয়ে। রেল-পূর্ব যুগের প্রাচীন পায়ে চলা পথ। প্রসঙ্গত বলা যায়, কামারপুকুরের অদূরে সঙ্গীতরাজ্য বিষ্ণুপুর ও পশ্চিম ভারত থেকে পুরুষোত্তম ধাম তীর্থযাত্রা পথের ধারে অবস্থিত। সেজন্যেই মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চল থেকে জগন্নাথ ক্ষেত্রে তীর্থযাত্রী এক হিন্দু সঙ্গীতাচার্য বিষ্ণুপুরে সমাগত হন। তারপর ঘটনাক্রমে বিষ্ণুপুর রাজ্যে তাঁর দীর্ঘ বাস এবং বিষ্ণুপুরের তরুণ গায়ক রামশঙ্কর ভট্টাচার্যকে (আ. ১৭৬১-১৮৫৩) সঙ্গীতশিক্ষা দানের ফলে বিষ্ণুপুর ঘরানা ধ্রুপদ গানের উৎপত্তি। বিষ্ণুপুরের মাত্র আট-দশ ক্রোশ নিকটবর্তী কামারপুকুর।

বিষ্ণুপুরের তীর্থ মাহাত্ম্য এবং মন্দির স্থাপত্য, মূর্তিশিল্পও উল্লেখযোগ্য। মল্লরাজাদের আমলে নির্মিত বিশাল দেবায়তন মল্লেশ্বর মন্দির, আরো প্রাচীন দেবগৃহের বিগ্রহ মৃন্ময়ী বিষ্ণুপুর রাজ্যের ধর্ম সংস্কৃতিতে গৌরবোজ্জ্বল স্থানের অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম জীবনে বিষ্ণুপুর ভ্রমণের উল্লেখ করেছেন। 'কথামৃতের' 'পূর্বকথায়'—আমি এক বার বিষ্ণুপুরে গি'ছলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ি আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্তি আছে, নাম মৃন্ময়ী ঠাকুরবাড়ির কাছে বেশ বড় দীঘি। কৃষ্ণ বাঁধ। লাল বাঁধ।... আর দীঘির কাছে আমার ভাব সমাধি হল, তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ী দর্শন হল—কোমর পর্যন্ত।' (কথামৃত, প্রথমভাগ, পৃঃ ৯৮)

সেই বিষ্ণুপুর রাজ্যের একই পথে কামারপুকুরেও শ্রীক্ষেত্র যাত্রীদের যাতায়াত হয়ে থাকে। গ্রামের সম্পন্ন লাহা পরিবার একটি পান্থনিবাস করে দিয়েছেন তীর্থ যাত্রীদের জন্যে। সেটি কামারপুকুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বৃহত্তর ধর্মীয় জগতের সঙ্গে এই গ্রামের সংযোগকেন্দ্র। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের সন্ন্যাসী তীর্থিকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সেতু স্বরূপ। কারণ এখানে বহু সাধু সন্ত সাময়িক বাস করে যান পুরীধাম পরিক্রমার পথে।

গদাধরের জীবনেও অতিথিশালাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এখানেই তিনি সাধক সন্ন্যাসীদের সঙ্গ ঘনিষ্ঠভাবে লাভ করেন। অল্প বয়সেই অধ্যাত্ম রাজ্যের গভীর প্রভাবে

আসেন তাঁদের সাহচর্যে। আর তাঁর গানের সংগ্রহও তাঁদের কাছে অল্প নয়। বাংলা তথা ভারতের নানা সাধককেই গায়ক বা গীতপ্রিয় দেখা গেছে। এই পান্থনিবাসে সমাগত বাঙালী ও পশ্চিমা সাধুদের মুখে ধর্মসঙ্গীতও শুনতেন গদাধর। অধ্যাত্ম ভাবের বিভিন্ন গান শুনে শুনেই আত্মস্থ করতেন।

পূর্ব-দক্ষিণ ভারতের বহু প্রসিদ্ধ তীর্থ যাত্রার পথে সেই পান্থনিবাস। সুতরাং নানা অঞ্চলের সন্ত বৈরাগীরা নিত্য সেখানে উপনীত হতেন। আর গদাধরও সাধুসঙ্গ লাভের জন্যে যেতেন উৎসুক হয়ে। তাঁর আপন অন্তরের টান তা ছিলই। আর পুরাণের কথায় জেনেছেন যে সাধু সন্ন্যাসীরা জীবন যাপন করেন ঈশ্বর দর্শনের জন্যে। সাধু-সঙ্গ মানুষকে চরম শান্তি দিতে পারে। পিতার মৃত্যুর পর বালকের নিজেরও প্রবণতা দেখা যায় ঈশ্বর বিষয়ে।

তাই সুবিধা পেলেই গদাধর চলে আসেন তাঁদের কাছে। সাধু বৈরাগীদের সেবা সহায়তাও করেন।

তাঁরা প্রীত হন বালকের ধর্ম বিষয়ে আগ্রহ দেখে। মুগ্ধ হন তাঁর পরিচর্যায়। প্রিয় দর্শন, সরল গদাধরকে তাঁরা ধর্মের নানা উপদেশ দেন। ঈশ্বর ভজন শোনান। একেকদিন সাধুরা যোগীও সাজান তাঁকে।

এমনি ঘনিষ্ঠ সাধুসঙ্গ তাঁর পিতার মৃত্যুব অব্যবহিত পরের কথা। গদাধরের বয়স তখন আট-ন বছর চলেছে।

এমন এক সময়েই হলো তাঁর দ্বিতীয় বারের ভাবসমাধি।

কামারপুকুরের এক ক্রোশ দূরে আনুড নামে গ্রাম। সেখানে গদাধর বিশালাক্ষী দেবী দর্শন করতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সংজ্ঞা হারালেন পথিমধ্যে।

এবারেও, তাঁর নিজের কথায়, 'দেবীর চিন্তা করতে করতে তাঁর পাদপদ্মে মন গিয়েই এরূপ হয়েছিল।'

গদাধরের দশ এগার বছর বয়সের যা বিবরণ পওয়া যায় তাওএকই প্রকার চরিত্রের কথা।

একদিকে লাহা-বাড়ির পান্থনিবাসে সাধুসন্তদের সঙ্গ। অন্যদিকে সদানন্দ মধুরস্বভাবে ও হাস্যকৌতুকে, রামায়ণ মহাভারত পুরাণের আখ্যান আর সুমিষ্ট গলায় গান শুনিয়ে গ্রামের অনেকের, বিশেষ পল্লনারীদের স্নেহভাজন। তেমনি ছিল মাঝে মাঝে তাঁর যাত্রাপালার অনুকরণে অভিনয়।

তারপর এগার বছর বয়সে তাঁর তৃতীয়বার ভাবসমাধির কথা জানা যায়।

সেদিন শিবরাত্রি উৎসব। গ্রামে পাইনদের বাড়িতে যাত্রাপালা হচ্ছিল সেই উপলক্ষ্যে। কিন্তু যিনি শিবের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

পালা বন্ধ হবার উপক্রম দেখে, শিব সাজতে বলা হলো গদাধরকে। মহাদেব সেজে তাঁকে কটি কথা বলতে হবে। তিনিও সানন্দে সম্মত।

তখন তাঁকে সাজানো হলো শিবের সাজে। মাথায় জটাজুটধারী। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে বুকে বাহুতে বিভূতির চিহ্ন আঁকা।

কিন্তু মহাদেবের সাজ সম্পূর্ণ করে বিভূতি ভূষিত হতেই বাহ্যজ্ঞান হারালেন গদাধর। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই তাঁর অমনি ভাবসমাধি হতে লাগল। কখনো ধ্যান করবার সময়। কখনো দেব-দেবী মাহাত্ম্যের গান শুনতে শুনতে। তখন এমন তন্ময় হতেন যে তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে যেত বাহ্য জগৎ। আর সেই সঙ্গে অন্তরে জাগত এক অপূর্ব আনন্দের অনুভব। তন্ময়তা যেদিন বেশি হতো, সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়তেন। তাঁকে জড়ের মতন দেখাতো সে সময়।

নিজের সেই অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'অন্তরে সেই দেব বা দেবীর দিব্যদর্শন করে তখন আনন্দ হয়।'

এমনিভাবে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল তাঁর ধর্মভাব, আধ্যাত্মিক অনুভূতি। সংসার যে অনিত্য এ বিষয়ে গদাধরের নিশ্চিত ধারণা হলো। কিন্তু বয়স তখন বার তের বছর মাত্র।

তন্ময়তার সময় ভিন্ন তাঁর সেই সদানন্দ ও কৌতুকপ্রিয় স্বভাব রইল পূর্বেরই মতন। আর নিয়মিত পাঠশালা গেলেও, লেখাপড়ায় তেমনি উদাসীনতা।

কিন্তু তাঁর অসামান্য মেধা আর প্রতিভা নানাভাবেই প্রকাশ পেতে লাগল। একদিন গ্রামের পণ্ডিতসভায় বিভিন্ন কঠিন প্রশ্নের তিনি সমাধান করেছিলেন। বয়স তো তখন আরো কম—এগার বছর। উপনয়নের কিছুদিন পরের কথা। সেদিন শুধু পণ্ডিতদেরই আশীর্বাদ পেলেন না গদাধর। তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি দেখে গ্রামেও একটা সাড়া পড়ে যায়।

আবার তাঁর মুখে রামায়ণ মহাভারত পাঠ আর পুরাণ কথা শুনতে সকলের তেমনি আগ্রহ। তিনিও সবাইকে সেসব শুনিয়ে তেমনি আনন্দ দেন, মুগ্ধ করেন। অনেকের অনুরোধে বাড়িতে এসে শোনান প্রহ্লাদ, ধ্রুবের উপাখ্যান। অনেক উপাখ্যান নিজে পুঁথিতেও নকল করেন সুন্দর ছাঁদের হস্তাক্ষরে।

এমনিভাবে যখন তাঁর তের বছর বয়স চলেছে, তাঁদের সংসার বড় অসচ্ছল হয়ে দাঁড়াল। তখন জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকুমার গেলেন কলকাতায়। ঝামাপুকুরে টোল খুললেন। রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে। সেখানে ও অন্য কটি বাড়িতে নিত্যসেবার ভারও পেলেন রামকুমার।

গদাধর দেশের বাড়িতেই রইলেন। অর্থকরী কাজে তাঁর অতি অনিচ্ছা। তাঁর জননীকে

সাহায্য করতে লাগলেন অনেক কাজে। পল্লীনারীরা তাঁদের বাড়িতে এসে তাঁকে অনুরোধ জানান—গান আর ধর্মোপাখ্যান শোনাতে। সকলকে শুনিয়ে গদাধরের নিজেরও বড় তৃপ্তি।

কামারপুকুরে মূর্তি গঠন, পটোদের চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি চারুশিল্পের কথা আগে বলা হয়েছে। তেমনি সঙ্গীতচর্চাও গ্রামে বিলক্ষণ।

কামারপুকুরে যাত্রাপালার দলই তখন তিনটি। সেসব যাত্রার এক প্রধান অঙ্গ—গান। গ্রামে একদল বাউলও আছেন, তাঁদের অনেকেই গায়ক। তাছাড়া, দু' এক দল কবিয়ালও দেখা যায় কামারপুকুরে।

আর এ গ্রামে বহু বৈষ্ণবের বাস। সেজন্যে সন্ধ্যায় নানা বাড়িতে যেমন ভাগবতপাঠ হয় তেমনি সংকীর্তনের আসরও বসে।

গদাধর এই সমস্ত সঙ্গীতই নিয়মিত শোনেন। আর আয়ত্ত করে নেন অসামান্য মেধা ও স্মরণশক্তিতে। বহু শ্যামাসঙ্গীত, বাউল ও নানা অধ্যাত্ম ভাবের গান, কীর্তন তিনি এইভাবে শিক্ষা সংগ্রহ করেন কামারপুকুরে অবস্থানকালেই। শুধু শেখা নয়, গ্রামের সকলকে সেসব গান গেয়ে শোনাতেন। যেমন গৃহবধূদের ঘরে, তেমনি চণ্ডীমণ্ডপের সাধারণ আসরেও।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গৃহী শিষ্য রামচন্দ্র দত্তও ঠাকুরের প্রথম জীবনে গান আত্মস্থ করা এবং সুমিষ্ট সঙ্গীতকণ্ঠ সম্পর্কে বলেছেন, 'বাল্য থেকেই অসামান্য মেধা, যা শোনা তাই মনে রাখা। যাত্রা, কীর্তন, চণ্ডীর গান, নানাপ্রকার সঙ্গীত এইভাবে কণ্ঠস্থ। কণ্ঠ অতি মধুর, বেশি বয়সেও।'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত পৃঃ ৪—রামচন্দ্র দত্ত)

আনন্দময়, চিত্তাকর্ষক গদাধরের চরিত্র। আবার, কীর্তনাদি গান ও পুরাণ ভাগবত প্রভৃতি পাঠ আর ধর্মতত্ত্বের ভক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যায়, গ্রামে তিনি সবার প্রিয়। সংকীর্তনের সময় তাঁর তুল্য ভাবোন্মত্ততা, নতুন নতুন ভাবময় আখর প্রয়োগের নৈপুণ্য, মধুর কণ্ঠস্বর ও সুন্দর নৃত্য কামারপুকুরে আর কারুরই ছিল না। তাই তাঁকে ডাক পড়ত সন্ধ্যাবেলার আসরে আসরে। তাঁর যোগদানের ফলে সে সব অনুষ্ঠানে আনন্দের হাট বসত। সকলেই চাইতেন তাঁকে। তাই সব আসরেই পালাক্রমে তিনি যেতেন। সকলকে তৃপ্তি দিতেন সঙ্গীতে, পাঠাদিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং উত্তরকালে এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তা হলো দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কক্ষে ভক্তদের সঙ্গে একদিনের (১৮৮৩, জুন ১০) কথা। ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল তাঁর কথায় গান গাইছেন। পর পর চারখানি গান শোনালেন তিনি। তখন ঠাকুর বললেন, 'আমি এসব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতাম। এক এক যাত্রার সমস্ত পালা গেয়ে

দিতে পারতাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীয় দমন যাত্রার দলে ছিলাম।'

(কথামৃত/পঞ্চম, পৃঃ ৪৬)

নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্রের পর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বনামপ্রসিদ্ধ ভক্ত হলেন নট-নাট্যকার-নাট্য-পরিচালক অমৃতলাল বসু। ঠাকুরের বাল্যকাল সম্পর্কে কাব্য আকারে লেখা জীবনীতে অমৃতলালও তাঁর উক্ত গুণ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন—'যাত্রাগান শুনে পালা বলে অবিরাম'।

(ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা। পৃঃ ৩২—অমৃতলাল বসু)

আবার আরেকটি বৈশিষ্ট্যও তাঁর চরিত্রে দেখা যায়। এই কৈশোরেই পরিণত বয়সের মতন বাস্তব বুদ্ধি। গ্রামের অনেকের সাংসারিক সমস্যায়ও পরামর্শ দিতেন তিনি। পরবর্তী জীবনে যখন পরমহংস, ঈশ্বরের অবতাররূপে দক্ষিণেশ্বরে বিরাজমান, নিয়ত ঈশ্বর প্রসঙ্গে এবং আপনার দৃষ্টান্তে ধর্মজীবনের পথ নির্দেশ করছেন, তখনো দেখা গেছে তাঁর প্রখর বাস্তবতাবোধ, লোকপ্রজ্ঞা বা মানবচরিত্রের জ্ঞান, সংসারের নানা বিষয়ে অকাট্য ধারণা—যা নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণ শক্তিরই ফল।

এই ধরনের গুণাবলীও গদাধরের সেই বাল্য বয়সেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সে সাংসারিক বুদ্ধি তিনি আপন সুবিধার জন্যে প্রয়োগ করেন নি কখনো। অন্যদের জাগতিক, সাংসারিক সঙ্কট সমস্যায় সৎ পরামর্শ দিয়েছেন। এসব কারণেও গ্রামবাসী-দের প্রিয়জন তিনি। শুধু ভণ্ড ও ধূর্তেরা তাঁর প্রতি বীতরাগ ছিলেন। কারণ গদাধর সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ/অন্যায়ের, অধর্মের ঘোরতর প্রতিবাদী। কপটতা ও মিথ্যা-চারের একান্ত বিরোধী। সত্য ভাষণে কখনো পরাঙ্মুখ নন।

এইভাবে সতের বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর কামারপুকুরে কাটল। গ্রামে কনিষ্ঠের বিদ্যা-শিক্ষা কিংবা অর্থকরী কাজে কোনো আশা-ভরসা নেই দেখে, রামকুমার এবার তাঁকে নিয়ে এলেন কলকাতায়।

দেশে জননীর কাছে রইলেন দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর। মায়ের ও সংসারের যে কাজকর্ম অনুজ সর্বপ্রিয় সদানন্দ গদাধরের অভাবে কামারপুকুরের জীবন অনেকখানি নিষ্প্রাণ, নিরানন্দ হয়ে পড়ল। গ্রামে তিনি এতদিন আনন্দের হাট বসিয়ে রেখেছিলেন চিত্তা-কর্ষক ব্যক্তিত্বে, নানা রঙ্গিনী গুণে।

এখন জ্যেষ্ঠের সঙ্গে কামারপুকুরের চতুষ্পাঠীতে গদাধর বাস আরম্ভ করলেন। তা হলো ১৮৫৩ সালের কথা।

রামকুমার অনেক আশা করে কলকাতায় এনেছিলেন তাঁর অনুজকে। কামারপুকুরে লেখাপড়া কিছু হচ্ছিল না। গদাধরের বিদ্যাভ্যাস হবে এখানে নিজের টোলে। সে অর্থকরী কাজেরও যোগ্য হয়ে উঠবে।

কিন্তু, দেখে হতাশ হলেন। বিদ্যাশিক্ষায় আদৌ মন নেই গদাধরের। সাংসারিক সুরাহা তাকে দিয়ে বিশেষ হবে না। অর্থ উপার্জনে বীতস্পৃহ দেখা যায় তাকে। কনিষ্ঠের অন্তর্লোকের সন্ধান রামকুমার পান নি। গদাধরের হৃদয় তখন এক অপূর্ব-ভাবে অনুপ্রাণিত। পূর্ণজ্ঞানের অভিলাষী তিনি। ইহকালের অর্থলিপ্সু বিদ্যায় তাঁর আগ্রহ জাগবে কি? যে জ্ঞান ও বিদ্যা মানুষকে শাশ্বত শান্তি দেয়, অমৃতের অধি-কারী করে, সংসার সাগর থেকে উত্তরণ ঘটায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্যে তখন তিনি তৎপর হয়েছেন। অর্থচিন্তা তাঁর মনের ত্রিসীমার বাইরে।

একুশ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবক রামকুমার। তবু তাঁকে স্পষ্টই গদাধর জানিয়ে দিলেন, 'ও চাল কলা বাঁধা বিদ্যেয় আমার দরকার নেই।'

অনুজের দ্বারা সাংসারিক সহায়তার আশা রামকুমার ত্যাগ করলেন। গদাধর আপন ভাবেই রইলেন ঝামাপুকুরের বাসায়। অগ্রজের টোলে থেকেও টুলো পণ্ডিত বৃত্তি-ধারী হলেন না।

তবে বিগ্রহ সেবার দায়িত্ব কিছু কিছু পালন করতে লাগলেন জ্যেষ্ঠের কথায়।

তাঁর দু'বছর অতিবাহিত হলো কলকাতায়। এমন সময় (১৮৫৫, মে ৩১) রাণী রাসমণি স্নানযাত্রার শুভ দিনে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। ঘটনাচক্রে ভবতারিণী কালীর নিযুক্ত পূজারী রামকুমারের সঙ্গে তিনিও হলেন দক্ষিণেশ্বর নিবাসী। দেবালয় স্থাপনের তিন মাসের মধ্যে গদাধরের সেখানে বিষ্ণু বিগ্রহের বেশকারী ও তার এক বছর পরে রামকুমারের মৃত্যুতে কালী মন্দিরের পূজক নিযুক্ত হওয়া, দিব্যোন্মাদনা, ঈশ্বর সাধন প্রভৃতি 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে উল্লিখিত এবং তাঁর জীবনী পাঠকদের সুপরিচিত।

এখানে গদাধরের প্রথম কলকাতা বাসের সময়টি আলোচ্য, বিশেষভাবে তাঁর সঙ্গীত প্রসঙ্গে। কামারপুকুরের তুল্য তাঁর অন্তরঙ্গ বিবরণ অবশ্য এই পর্বে পাওয়া যায় না। অথচ আত্মবিকাশের পক্ষে সতের থেকে উনিশ বছরের জীবনকাল স্বভাবতই গুরুত্ব-পূর্ণ, যে বছর দুয়েক তিনি ঝামাপুকুর রাজপরিবারের বহির্বাটিতে অগ্রজের সঙ্গে অতিবাহিত করেছিলেন।

তারুণ্যের এই প্রথম পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম উপলব্ধি তথা ধর্মজীবন যে নির্ধারিত পথে যাত্রা করে তা বলা বাহুল্য। ।।

আর তাঁর শিল্পীচিত্ত? যা তাঁর মূল সত্তারই অন্যতম রূপ, এক অঙ্গাঙ্গী প্রকাশ? কামারপুকুরে সে নন্দনবৃত্তি স্ফূর্তি লাভ করছিল চার মাধ্যমে। মূর্তিগঠন, চিত্রাঙ্কন, পালাভিনয় ও সঙ্গীত। তার মধ্যে প্রথম তিনটি কলাবিদ্যার চর্চা বা অনুষ্ঠান করা উত্তর জীবনে আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তার কারণও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে

না। অবশ্য এই তিন বিষয়েও তাঁর নিপুণতার নিদর্শন দেখা গেছে দক্ষিণেশ্বর-জীবনে। তার বিবরণও আগেই উল্লিখিত এই তিন বৃত্তি স্ফুরণের যে সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশ কামারপুকুর গ্রামে তিনি পেয়েছিলেন, তার অভাব ছিল অপরিচিত ঝামাপুকুরে, একথা অনুমেয়। তাঁর কলকাতা বাসের এই সময় থেকে ওই তিনটি বিদ্যাচর্চায় বিরতি থাকে।

কিন্তু তাঁর গীতশক্তি? ললিতকলার এই অঙ্গটি তাঁর ঈশ্বরীয় জীবনের অঙ্গাঙ্গীরূপে অন্তপর্ব পর্যন্ত যে জীবন্ত ছিল তা কি নিষ্ক্রিয় থাকে এই দু বছর? না। এমন দীর্ঘ-কাল তা সম্ভব নয়। এটি স্ব-ভাব, সদা ক্রিয়াশীল। কোনো গায়নশিল্পী সক্ষম জীবনে সঙ্গীতবিহীন থাকতে পারেন না, বিশেষ প্রথম তারুণ্য কালে। আর যাঁর গীতি-গুণ বালক বয়সেই প্রকাশ পায়। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, আলোচ্যকালে অর্থাৎ তাঁর জীবনের এই উন্মুখর পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতকণ্ঠ অধিকতর সক্রিয় ছিল, তাঁর গ্রহিষ্ণু চিত্ত আরো সঙ্গীত সংগ্রহ, সঞ্চয় ও আত্মস্থ করেছিল তৎকালীন কল-কাতার প্রাচুর্যপূর্ণ সঙ্গীতক্ষেত্র থেকে।

তাঁর নিজের জীবনেও তখন তার উপযুক্ত অবকাশ ছিল। জ্যেষ্ঠের ব্যবস্থায় ও তাঁকে সহায়তার জন্যে গদাধর কয়েকটি যজমান বড়িতে পূজকের কাজ করতেন বটে। কিন্তু চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাচর্চায় দেখা যেত না তাঁকে।

আরো জানা যায় যে, সদানন্দ, মধুর স্বভাবের জন্যে গদাধর কলকাতার এই অঞ্চলেও অনেকের প্রীতির পাত্র হন। কামারপুকুরের মতন প্রতিবাসী গৃহবধূদের স্নেহ লাভ করেন গান ও পুরাণাদির আখ্যান শুনিয়ে, সরল ব্যবহারের গুণে। তাঁর অন্তর্নিহিত সৎ প্রকৃতি, সকলের সঙ্গে মেলামেশায় আন্তরিকতা, হাস্যকৌতুক, প্রীতি ইত্যাদির জন্যে তাঁর ঝামাপুকুরে বাসপর্বও সুখের হয়েছিল, সবাইকার শুভ ইচ্ছা লাভ করে। কামারপুকুরে মুকুলিত গদাধরের উক্ত গুণাবলী কলকাতা জীবনে আরো বিকশিত হয়।

ঝামাপুকুরে কোনো কোনো পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে যে গদাধরের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তারও দৃষ্টান্ত—নকুড় বৈষ্ণব। তিনি কীর্তনপ্রিয় এবং ঠাকুরের সেই তরুণ বয়স থেকে পরিচিত হয়ে দক্ষিণেশ্বরে শেষ পর্যায় পর্যন্ত যাতায়াত করতেন। 'ঝামাপুকুরের নকুড় বাবাজী'র প্রসঙ্গ শ্রীম উল্লেখ করেছেন একদিন (১৮৮৩, মে ২৭) 'পূর্বকথা'য়: 'এইবার ঠাকুর নিজের ঘরের পশ্চিম বারান্দায় আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। কাছে রাখাল, মাস্টার, নকুড় বৈষ্ণব প্রভৃতি। নকুড় বৈষ্ণবকে ঠাকুর ২৮/২৯ বৎসর ধরিয়া জানেন। যখন তিনি প্রথম কলিকাতায় আসিয়া ঝামা-পুকুরে ছিলেন ও বাড়ি বাড়ি পূজা করিয়া বেড়াইতেন তখন নকুড় বৈষ্ণবের দোকানে

আসিয়া মাঝে মাঝে বসিতেন ও আনন্দ করিতেন। পেনেটিতে রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব উপলক্ষে নকুড় বাবাজী ইদানীং ঠাকুরকে প্রায় বর্ষে বর্ষে দর্শন করিতেন। নকুড় ভক্ত বৈষ্ণব। মাঝে মাঝে তিনিও মহোৎসব দিতেন। নকুড় মাস্টারের প্রতিবেশী।...' (কথামৃত, পঞ্চম, পৃঃ ৪০)।

কলকাতার এই দু'বছর তাঁর গীতিকণ্ঠ অবশ্যই নীরব ছিল না। তা বোঝা যায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অবস্থান থেকেই। মন্দিরে তাঁর ভক্তি-কলকণ্ঠের গান শুনে রাণী রাসমণি মুগ্ধ হতেন। গায়ককে অনুরোধ করেও গান শুনতেন রাণী।

কামারপুকুরে বাসকালে গদাধরের সঙ্গীত সংগ্রহাদির কথাও বিবেচ্য। অপরের গান শুনে তা আত্মস্থ করবার যে প্রবণতা ও ক্ষমতা তাঁর স্বগ্রামে বাল্যজীবনে প্রকাশ পায়, এবং কলকাতায় স্বাভাবিকভাবেই তার অধিকতর স্ফুরণ হয়। কারণ তাঁর উদীয়মান বয়স এবং কলকাতার সমাজ জীবনে সঙ্গীতচর্চার ব্যাপকতা।

তখনকার রাজধানীতে প্রায় সকল ধনীগৃহের বৈঠকখানায় সঙ্গীতসভা। কৃতী গায়ক বাদকরা নিযুক্ত থাকেন নিয়মিত অনুষ্ঠানের জন্যে। ধ্রুপদাদি রাগসঙ্গীত তাঁরা পরিবেশন করেন। আবার বাংলা গানও শোনা যায় কোনো কোনো দিন। এমনি একটি শ্রেষ্ঠ আসর সে সময় শোভাবাজার রাজবাড়ি। সে সঙ্গীত-সভায় রাগ-সঙ্গীতের কলাবৎদের সঙ্গে বাংলা গানের গুণীদেরও রীতিমত পোষকতা হয়ে থাকে। জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে ঠাকুরবাড়ি প্রমুখ আরো নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। বাহুল্য বোধে এক কথায় বলা যায়, উত্তর কলকাতায় সঙ্গীত সভা বিহীন ঐশ্বর্যশালী বাঙালী পরিবার বিরল ছিলেন সেযুগে।

যে (রাজা) দিগম্বর মিত্রের গৃহে রামকুমারের টোল ছিল এবং গদাধর বাস করতেন অগ্রজের সঙ্গে, সেখানেও বসত সঙ্গীতের আসর। বিভিন্ন রীতির গায়কদের অনুষ্ঠান এই ভবনে হতো। তিনি সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বরে চলে যাবার ক'বছর পরে বিখ্যাত ধ্রুপদ-গুণী যদু ভট্ট সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

দিগম্বর মিত্রের গৃহাসর থেকে গান শোনা বা সঙ্গীত বিষয়ে লাভবান হওয়া গদাধরের পক্ষে অতি স্বাভাবিক।

তেমনি অন্যান্য সঙ্গীত-সভায় তাঁর তুল্য অনুরাগীর গান শোনাও অসম্ভব নয়। শুধু বাড়িতে সঙ্গীতাসর নয়, সেকালের কলকাতায় সাধারণের জন্যে অনেক উন্মুক্ত আখড়াও ছিল। নানা হরিসভার অধিবেশন মুখরিত হতো কীর্তনীয়াদের পদাবলী সঙ্গীতে। কীর্তন গানের যথেষ্ট প্রচলন উনিশ শতকের সেই মধ্যভাগে ছিল। উত্তর কলকাতার নানা অঞ্চলেই বহু প্রকার গান বাজনার অনুষ্ঠান হতো নিয়মিত।

বিশেষ হাফ আখড়াই গান, পাঁচালী, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখের শ্যামাসঙ্গীত,

বিভিন্ন প্রকৃতির অধ্যাত্ম বিষয়ক গান—সবই প্রচলিত ছিল রাজধানীর সঙ্গীতক্ষেত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, জাতীয় জীবনে নব জাগৃতির জন্যে চিহ্নিত, উনিশ শতকের বাংলাদেশে সেই ঐতিহাসিক কাল। ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতে তখন ভারতে একদিকে যেমন জাগরণের ও নতুন উদ্যমের সাড়া, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও নব মূল্যায়নের প্রয়াস। ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় এই উভয়বিধ কর্মচাঞ্চল্য প্রকাশিত। সেই জাগৃতি পর্বের মুখপাত্র হয় বাংলা, বিশেষ কলকাতা, তার নানামুখীন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল স্বরূপ। সমাজ-সংস্কারে, ধর্ম-আন্দোলনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, সাহিত্য ও সংবাদপত্র জগতে, নাট্যশালা প্রভৃতির মতন সঙ্গীতক্ষেত্রেও। যেমন ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ধারা—রাগসঙ্গীতের অনুশীলন ও চর্চার ব্যাপক প্রচলন ঘটে, তেমনি বাংলা গানের নানাপ্রকার আসরেরও অভাব ছিল না কলকাতার উত্তরাঞ্চলে। সর্বসাকুল্যে সেই সব অনুষ্ঠানে ধর্মবিষয়ক সঙ্গীতের একটি প্রধান স্থান ছিল। গানের সেই পরিমণ্ডলে গদাধর কি শ্রোতারূপে উপস্থিত হতেন না, তাঁর অবসর কালে? তাঁর তুল্য সঙ্গীতপ্রিয় এবং সঙ্গীতক্ষম তরুণ কি সেই সাঙ্গীতিক পরিবেশে লাভবান হন নি? তেমনি বিভিন্ন আসর থেকে আপন ভাবানুসারী গান কি সেই সতের-আঠার-উনিশ বছর বয়সে সঞ্চয় বা আত্মস্থ করে নেন নি শ্রুতিধর গদাধর? তথ্য প্রমাণ না থাকলেও এমন অনুমান করা যায় সঙ্গতভাবেই।

যেমন কামারপুকুরে তেমনি কলকাতার জীবনেও এমনিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীত 'শিক্ষা' বা সংগ্রহ। বিভিন্ন গায়কদের মুখে শুনে শুনেই কণ্ঠস্থ করে নেওয়া। এই-ভাবে, কারুর কাছে রীতিমত শিক্ষা না করেই তিনি স্বয়ংসিদ্ধ গায়ন-শিল্পী। লোকোত্তর মেধা ও স্মরণ-শক্তিতে সমস্ত গান তাঁর চিত্তপটে চির মুদ্রিত থেকে যায়। খাতাপত্রে গীত সংগ্রহ করেন নি তাঁর প্রায় পরিণত বয়স পর্যন্ত। গানের বাণী দেখে কখনো শ্রীরামকৃষ্ণ গান শোনান নি। লিখিতভাবে গান রক্ষা করবার একটি উদাহরণ যা পাওয়া যায় তা তাঁর উত্তর জীবনের কথা, এবং সম্ভবত রামলালের সুবিধার জন্যে। সে বিবরণ বর্তমান অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ্য। এখানে আরেকবার স্মরণ করা যায় যে, সঙ্গীত যাঁদের জীবনের অর্থকরী বৃত্তি ও অবলম্বন তাঁরা শ্রুতিধর হলেও লিখিতভাবে সংগ্রহ করে রাখেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তুল্য সম্পূর্ণ স্মৃতিশক্তি-নির্ভর গায়ক দুর্লভ-দর্শন, সঙ্গীত-জগতেও।

যেমন বিনা শিক্ষায় এত সংখ্যক গান আয়ত্ত করা, তেমনি স্মরণের পটে সমস্ত ধারণ করে রাখা এবং ইচ্ছামাত্র যে-কোনো সময়ে যে-কোনো সঙ্গীত পরিবেশনা—সবই তাঁর জীবনের তুল্য অলৌকিক পর্যায়ের।

বাল্য থেকে প্রায় সতের বছর বয়স পর্যন্ত কামারপুকুরে। তারপর বছর ছয়েক কলকাতায়। এই তাঁর গানের 'শিক্ষা' সংগ্রহের কাল। এই দুই পর্যায়ের পরে তাঁর সঙ্গীত-সঞ্চয় যে সম্ভব নয় সে বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। রামাৎ সম্প্রদায়ের সাধুদের নিকটে প্রাপ্ত ভজনগুলি মাত্র ব্যতিক্রম। তবে দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হবার প্রায় এক বছর পর থেকে তাঁর যে দশ-এগার বছরের একান্ত সাধন জীবন, সেই কালেও তিনি গান গেয়েছেন। কখনো আপন মনে, আপন ভাবে, কখনো মৃন্ময়ী চিন্ময়ী দেবীর উদ্দেশ্যে। কখনো উপলব্ধির, কখনো উপাসনার মাধ্যম স্বরূপ। তা ভিন্ন, বীণ্‌কার মহেশচন্দ্রের বাজনার সঙ্গে তাঁর কণ্ঠসঙ্গীতে সহযোগিতাও এই সাধন পর্বের অন্তর্গত।

তপস্যা যুগের অন্তে তিনি প্রত্যাদেশ পান—'তুই ভাব মুখে থাক্।'

ভাব-স্বরূপই শ্রীরামকৃষ্ণ। তখন থেকেই দিব্য জীবনের সূত্রপাত।

তাঁর ভাবমুখীন জীবনেও সঙ্গীত নিরন্তর অন্তরঙ্গ রইল। বিভিন্ন ভাবের গান সেই ভাগবতী হৃদয়ে সদাজাগরূক। অধ্যাত্ম ভাবের সব অনুষঙ্গে অনুরূপ গানে উৎসারিত হয়ে ওঠে তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠ। স্বামী সারদানন্দের মন্তব্য এখানে আরেকবার স্মরণ করা যায়, 'ঠাকুরের মধুর গীত এত ভালো লাগিবার আর একটি কারণ ছিল। গান গাহিবার সময় তিনি গীতোক্ত ভাবে নিজে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্য গাহিতেছেন একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন।...তাঁহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে তিনি যথার্থই ভাবিতেন, এই ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং ইহার কিছুমাত্র তাঁহার প্রাপ্য নহে।'

('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'—সাধকভাব পৃঃ ৯৯-১০০)।

সিদ্ধিলাভের পরের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের গান দক্ষিণেশ্বরে প্রথম যে বহির্জগতের শোন-বার বিবরণ পাওয়া যায়, তিনি মাইকেল মধুসূদন। তা হলো আনুমানিক ১৮৬৯ সালের কথা। তার পরেও বছর ছয়েক সাধু সন্তরাই প্রধানত আসতেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। ১৮৭৫-এর আগে পরমহংসদেবের চরিত্র-মাহাত্ম্যের কথা বাঙালী সমাজ জানতে পারে নি।

পরবর্তীকালে এবিষয়ে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের বলেছিলেন, 'কেশব সেনের আসবার পর থেকে তোদের মতো ইয়ং বেঙ্গলের দলই এখানে আসতে শুরু করেছে। আগে আগে কত যে সাধুসন্ত ত্যাগী সন্ন্যাসী বৈরাগী বাবাজী সব আসত যেত, তা তোরা কি জানবি? রেল হবার পর থেকে তারা সব আর এদিকে আসে না। নইলে রেল হবার আগে যত সাধুরা সব গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটা পথ ধরে সাগরে চান করতে জগন্নাথ দেখতে আসত। রাসমণির বাগানে ডেরাডাণ্ডা ফেলে অন্তত দু'চার দিন

থাকা, বিশ্রাম করা, তারা সকলে করতই করত। কেউ কেউ আবার কিছুকাল থেকেই যেত।' (শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ৪৮—স্বামী সারদানন্দ)।
বেলঘরিয়ার বাগান বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করলেন, তারপরই কেশবচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় লেখেন, 'We met not long ago Paramhansa of Dakshineswar, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never ceasing metaphors and analogies so which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are...too gentle, tender and contemplative...' (Indian Mirror, 28th March, 1875). একই তারিখের 'সান্‌ডে মিরর' পত্রিকায় প্রকাশ —'Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to inspire such men as these.

(Sunday Mirror, 28th March, 1875).

ক্রমে কেশবচন্দ্র ও তাঁর প্রভাবাধীন স্থলভ সমাচার, ইণ্ডিয়ান মিরর, সান্‌ডে মিরর, থিওষ্টিক কোয়াটার্লি প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় পরমহংসদেবের কথা প্রচারের ফলে তাঁর অমৃত বাণী, লোকোত্তর পুণ্য চরিত্র ও ধর্মাদর্শের কথা কলকাতার মান্যগণ্য ও সুধীসমাজ জানতে পারে। তারপর থেকে বাঙালী সমাজের নানা কৃতী ব্যক্তি, ভক্ত এবং কেশব তথা ব্রাহ্মসমাজের অনুগামী ও অন্যান্য তরুণরা দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হতে থাকেন তাঁকে দর্শন করবার জন্যে। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন কেশবচন্দ্রের আত্মীয় এবং তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। নরেন্দ্রনাথের কেশবচন্দ্র ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উভয়তই ঘনিষ্ঠতা ছিল। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (সারদানন্দ) ও তারকনাথ ঘোষাল (শিবানন্দ) যাতায়াত করতেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে। দত্ত মহেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তারকনাথও বিশেষরূপে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল।...পরে যাহারা পরমহংস মশাইয়ের কাছে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রথমে সাধারণ সমাজে যাতায়াত করিতেন।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, পৃঃ ২৫—মহেন্দ্রনাথ দত্ত)।
ঠাকুরের বেশির ভাগ অন্তরঙ্গ ও চিহ্নিত ভক্তদের দক্ষিণশ্বরে আগমন আরম্ভ হয় ১৮৭৮-৭৯ সাল থেকে। তার আগে কেবল বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (নেপালের উচ্চ রাজকর্মচারী। ঠাকুর কথিত 'কাপ্তেন), সিঁথির গোপালচন্দ্র ঘোষ (অদ্বৈতানন্দ। সকল শিষ্যদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলতেন 'বুড়ো গোপাল'), মহেন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী এবং মহিমাচরণ চক্রবর্তী ঠাকুরের কাছে আসেন।

রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র ও গোপাল মিত্র—এই তিন গৃহী ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে ১৮৭৯, নভেম্বরের শেষ দিকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শন করেছিলেন।

(কথামৃত, পঞ্চম ভাগ—পৃঃ ৯)।

ঠাকুরের আরো দুই বিশিষ্ট গৃহী ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (ঠাকুরের অন্যতম 'রসদ্দার') ও কেদার এলেন রাম দত্ত এবং মনোমোহন মিত্রের পরে। লাটু (অদ্ভুতানন্দ), তারক (শিবানন্দ), নিত্যগোপাল (জ্ঞানানন্দ অবধূত) ও চুনী তাঁদের পরে। তারপর নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম (প্রেমানন্দ), বলরাম, নিরঞ্জন (নিরঞ্জনানন্দ), মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), যোগীন্দ্র (যোগানন্দ) ১৮৮১ সালের শেষ ও ১৮৮২-র প্রথমে আসেন। ১৮৮৩-৮৪ সালের মধ্যে এলেন—কিশোরী, অধরলাল সেন, নিতাই, ছোট গোপাল, বেলঘরের তারক, শরৎ (সারদানন্দ), শশী (রামকৃষ্ণানন্দ) ১৮৮৪ সালে গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ), কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ), গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্র মজুমদার, শারদা, কালীপদ, উপেন্দ্র (বসুমতী সাহিত্যমন্দির প্রতিষ্ঠাতা), দ্বিজ ও হরি। ১৮৮৫ সালে সুবোধ (সুবোধানন্দ), ছোট নরেন্দ্র, পল্টু, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ এলেন। (কথামৃত, প্রথম—পৃঃ ৫)। আরো অনেক গৃহী ভক্ত এই ক বছরে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন তাঁর কাছে। সকলের নামোল্লেখ বাহুল্য। এঁদের মধ্যে অনেকে যে গায়ক কিংবা সঙ্গীতপ্রিয়, তা লক্ষ্যণীয়। তাঁদের সে পরিচয় পরবর্তী অষ্টম অধ্যায়ে দেওয়া হবে। গায়ক-রূপেই নরেন্দ্রনাথও প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে এসেছিলেন, একথাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

সুতরাং দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের বেশির ভাগ দর্শনপ্রার্থী ভক্তরা দক্ষিণেশ্বরে আসতে থাকেন ১৮৭৯ ৮০ থেকে। আর তাঁর গান গাওয়ার নানা দৃষ্টান্ত ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ শ্রীম-র তাঁর নিকটে আসা ও দিনলিপি রাখার কল্যাণে, ঠাকুরের বাহ্য অস্তিত্বের শেষ বছর চারেকের সঙ্গীত প্রসঙ্গ।

১৮৭৯-৮০ সালে তাঁর বয়স তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বছর। অর্থাৎ দেহত্যাগের ছ-সাত বছর আগেকার কথা। চিহ্নিত শিষ্য ও ভক্তদের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের বহুকাল আগেই তাঁর সঙ্গীত সংগ্রহ সমাপ্ত হয়েছে। তবু বিশেষ কথা কিছু আছে। শিল্পী-চিত্ত চির গ্রহিষ্ণু। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের নান্দনিক সত্তা সঙ্গীত বিষয়ে তৎপর ছিল অত পরিণত বয়সেও। উৎকৃষ্ট ভাবের গান শুনলে তাঁর প্রাণে সাড়া জাগতই। আর সে গান যদি প্রথম শুনতেন, আত্মস্থ করে নিতেন সাগ্রহে। সে গায়ক সামান্য লোক হলেও মনোমত গান সংগ্রহ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। তাঁর প্রধান লক্ষ্য থাকত গানের কি ভাব সেই দিকে।

সেবক রামলালকে এমনি দুখানি গান লিখে নিতে বলছেন এমন উদাহরণও পাওয়া

গেছে তাঁর প্রায় শেষ বয়সে। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, গায়ক যত সামান্য অবস্থার লোকই হোন, তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সহানুভূতি ও মমত্ব বোধ করতেন। সে সময় তাঁকে দর্শন করতে, তাঁর অমৃত বাণীতে শান্তি পেতে বহু ভক্তের দক্ষিণেশ্বরে সমাগম হয়ে থাকে। ঠাকুরের সেবা পরিচর্যার জন্যে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন তাঁর কাছে। এমন সময়কার একটি মূল্যবান সঙ্গীত প্রসঙ্গ শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র তাঁর পুস্তকে বিবৃত করেছেন—

'৪ঠা বৈশাখ, বুধবার, অন্নপূর্ণা পূজা, ১৩৩৭ সাল। রামলাল দাদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে 'কহে শিখরী' ও 'শিবের তুল্য জামাই' এই দুইখানি গান গেয়ে বললেন—

একদিন সকালে দুর্গাপূজার ৭।৫ দিন আগে আমি ঠাকুরকে নিয়ে শৌচে গেছি। আমি দাঁড়িয়ে আছি, ভূষণ মালাকর (জেলে) গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরছে আর 'কহে শিখরী জামাই নাই ভিখারী' ঐ গান গাচ্ছে, ঠাকুর শুনে সমাধিস্থ। তারপর ঠাকুর আমায় বললেন, ওরে রামলাল দেখ, কি সুন্দর গান হচ্ছিল রে, তুই শুনেছিস?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ঠাকুর বললেন, 'ওকে একবার ডাক না।'

আমি ভূষণকে ঠাকুরের ঘরে ডেকে আনলুম। সে ঠাকুরকে ঐ দুখানা গান শোনালে। তিনি শুনে চোখের জলে ভেসে গেলেন ও সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

তারপর ঠাকুর আমায় বললেন, 'ওরে ভূষণকে কিছু খাবার দে।'

আমি লুচি সন্দেশ প্রচুর পরিমাণে দিলুম।

ঠাকুর তাকে বললেন, 'তুমি রবিবারে এসে গান শুনিও আর প্রসাদ পাইও। তোমায় কিছু পাইয়ে দেব। এখানে অনেক ধনী ভক্তেরা আসে।'

রামলাল দাদা—'বলরাম, সুরেশবাবু ও অন্যান্য ভক্তদের কাছে টাকা পয়সা তুলে ভূষণকে প্রায় ৮,১০ টাকা দেওয়া হল।'

ঠাকুর আমায় বললেন, 'ওরে রামলাল, ভূষণের কাছ থেকে গানগুলো লিখে নে।'

আমি লিখে নিলুম ও ঠাকুরকে মধ্যে মধ্যে গেয়ে শোনাতুম। আর তিনিও গাইতেন:—

কীর্তন

কহে শিখরী জামাই নাই ভিখারী।
শিবের এখন স্বর্ণপুরী।
সে যে রত্নময় কাশী
(শিখরী তাতে উমাশশী)।
(তথায় দেখে এলাম)
অন্নপূর্ণা নামে রাজরাজেশ্বরী।...

আলাইয়া-একতালা

শিবের তুল্য জামাই আছে কার।
তুমি জাননা শিখরী কত পুণ্য করি
শিবকে দান করেছি প্রাণের কুমারী,
এখন আমায় গৌরী রাজরাজেশ্বরী
কাশীধামে চমৎকার ॥...'

(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৮৪—কমলকৃষ্ণ মিত্র)।

ঠাকুরের সঙ্গীত শিক্ষা বা সংগ্রহের বৃত্তান্ত এই পর্যন্ত। কারো কাছে কখনো শিক্ষা না করেও গায়ন-শিল্পী তিনি। অথচ গায়করূপে চিরদিন গ্রহিষ্ণু-চিত্ত। ভাবোদ্দীপক গান শুনলেই তা সযত্নে সঞ্চয় করেন সঙ্গীত ভাণ্ডারে। আপন ভাবে সমন্বিত করে নেন। আবার সঙ্গীতাঞ্জলি দেন ভাব-মুখে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রোতারূপে

যিনি ঈশ্বর ভক্তি প্রচারের জন্যে অবতীর্ণ, সকলকে ভগবদ্-মুখীন করবার জন্যে যাঁর জীবন সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, সঙ্গীতক্রিয়া যেমন তাঁর বাণীর বাহন, তেমনি তিনি ভাবাত্মক গানের শ্রোতা হন পরম ভাব তথা রস আস্বাদনের জন্যে। কোনো দিব্য প্রসঙ্গে যেমন তাঁর ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়, অনুরূপ গান শুনেও তেমনি তিনি ভাবস্থ বা সমাধিস্থ হন। সঙ্গীত তাঁর ভগবদ্ আরাধনার, ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। যেমন স্বয়ং গায়করূপে, তেমনি শ্রোতার ভূমিকাতেও। সঙ্গীত সম্পর্কে এক স্বরূপের দুই প্রকাশ। গায়ক এবং শ্রোতারূপে অভেদ-সত্তা। যখন বাহ্যত সঙ্গীত ক্রিয়াশীল নন, তখনো অপরের গানে সমভাবেই ঝঙ্কৃত তাঁর নন্দন-আত্মা।

নাদের মহিমা শ্রীরামকৃষ্ণের সু-জ্ঞাত। আত্মস্বরূপে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে নাদ সাধনা কিংবা নাদ অনুসন্ধান একটি উৎকৃষ্ট উপায়। এক মতে, নাদ থেকেই বিশ্বের সৃষ্টি। সৃষ্ট বিশ্বের অন্তরে নাদই প্রাণ বা জীবনী-শক্তি রূপে নিহিত। ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ধারায় সেই নাদের মাহাত্ম্য ধ্বনিত। ভারতীয় প্রজ্ঞার প্রাণবন্ত প্রতিভূ শ্রীরামকৃষ্ণও গায়ক-রূপে এবং সঙ্গীতের শ্রোতারূপে নাদ সাধক। সঙ্গীতে তাঁর নাদব্রহ্মের উপলব্ধি। সুরের তুরীয় লোকে 'ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ।'

ব্রহ্ম রসস্বরূপ। রসের উৎস। ব্রহ্মবিদ্ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে সেই রসাস্বাদন করেন শ্রোতারূপেও। গায়নে ও শ্রবণে অভিন্ন তাঁর রসিক সত্তা। এক নন্দন প্রকৃতিরই যুগ্মরূপ এবং রূপান্তরও। আপনার এবং অপরের গানে তার একই নাদ ব্রহ্মের উপাসনা। গীত-শিল্পী কিংবা গীত-শ্রোতা উভয়ত স্পন্দমান শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর-নির্ভর ললিত মানস। বাণী, সুর ও ছন্দের ত্রিবেণী সঙ্গমে তাঁর অবগাহন।

সঙ্গীতের আবাহনে বরণে আদর্শ শ্রোতা তিনি। একান্ত, তদ্গত, অঙ্গাঙ্গী।

শ্রোতা ও গায়কের সুনিবিড় সংযোগে ও হৃদয়ের অনুভবে সার্থক হয় গান। সকল সঙ্গীতানুষ্ঠানে গায়কের সঙ্গে মরমী শ্রোতাও সমভাবাপন্ন, সমান দায়িত্বপূর্ণ। সমস্ত গানের ক্রিয়াকর্মে শ্রোতারূপে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই পরিচয়ই সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

'একাকী গায়কের নহে ত গান, মিলিতে হবে দুই জনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে।

বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্মর ফুটে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় সুরধুনী-তীরে সেই তানের উচ্ছ্বাস জাগবার নানা নিদর্শন তাঁর জীবন-কাহিনীতে বিকীর্ণ হয়ে আছে। 'কথামৃত' গ্রন্থাবলীতে বিবৃত ১৭৯টি দিন-লিপির মধ্যে অনেক দিনেই তা উল্লিখিত। অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে তাঁর তুল্য সঙ্গীতের এমন গভীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার আধারও বিরল-দৃষ্টান্ত। শ্রোতারূপে অতিশয় সংবেদনশীল শ্রীরামকৃষ্ণ। আদর্শ শ্রোতার সর্ব গুণে অলঙ্কৃত। সঙ্গীতের যত আসরে তিনি উপস্থিত থেকেছেন তার প্রতিবেদনের ছত্রে ছত্রে তা সুপ্রকাশ।

এমনি কটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করা হলো নমূনা স্বরূপ।

একদিন বিকালে (১৮৮২, মার্চ ৫) ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের ঘরে রয়েছেন। রবিবার বলে অনেক ভক্ত এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে। অতি সহজ সুবোধ্য কথায়, উপমায়, গল্পে এবং গানেও তিনি গূঢ় অধ্যাত্ম তত্ত্ব খানিকক্ষণ যাবত ব্যাখ্যা করলেন। তারপর 'সভা ভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এদিক ওদিক পায়চারী করিতেছেন।'

তার মধ্যে শ্রীম. শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষের দিকে এসে দেখলেন—

'ঘরের উত্তর দিকে ছোট বারান্দায় অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নরেন্দ্র গান গাইতেছেন। দুই চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মাস্টার আসিয়া গান শুনিতেছেন।...হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষুর পাতা নড়িতেছে না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাস্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক হইয়া তিনি ভাবিতেছেন, ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হয়? না জানি কতদূর বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে এরূপ হয়। গানটি এই—

চিন্তয় মম মানস হৃদি চিদ্ঘন নিরঞ্জন
কিবা অনুপম ভাতি মোহন মূরতি ভকত হৃদয়-রঞ্জন।
নব রাগ রঞ্জিত কোটি শশী বিনিন্দিত,
কিবা বিজলী চমকে সে রূপ আলোকে, পুলকে শিহর জীবন।

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত। চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন।...এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন?...আবার গান চলিতেছে—

হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ দিব্য দর্শন।

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য! শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ! স্তিমিত লোচন। কিন্তু

কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন। আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন!...সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুৎ ছবি হৃদয় মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাস্টার গৃহে প্রত্যাবর্তন কারতে লাগিলেন।'...(কথামৃত, পৃঃ ৩২, প্রথমভাগ)
অনুরূপ ভাবের গান শ্রবণ করেই শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব ভাবান্তর।...
সেদিনও রবিবার, ১৯ আগস্ট, ১৮৮৩। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের সেই ঘরে বিশ্রাম করছিলেন দুপুরবেলা। শ্রীম. এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। ঠাকুর বেদান্ত বিষয়ে বলতে লাগলেন তাঁকে। পরে অধরলাল, বলরাম, আরো অনেক ভক্ত এলেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি প্রারব্ধ, ভক্তের জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বলছেন, এমন সময় উপস্থিত হলেন নরেন্দ্র ও নেপালের বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ('কাপ্তেন')। নরেন্দ্রকে দেখেই ঠাকুর গান গাইতে বললেন।
'ঘরের পশ্চিম ধারে তানপুরাটি ঝুলান ছিল।...বাঁয়া ও তবলার সুর বাঁধা হইতে লাগিল।...নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন—

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদয় মন্দিরে...

'আনন্দ অমৃতরূপে' এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। আসীন হইয়া করযোড়ে বসিয়া আছেন। পূর্বাস্য। দেহ উন্নত। আনন্দময়ীর রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। লোকবাহ্য একেবারেই নাই।...স্পন্দহীন! নিমেষশূন্য। চিত্রাপিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এ রাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন।' (কথামৃত, পৃ. ৯৯। প্রথম)। সঙ্গীতের বাণী প্রসাদাৎ তাঁর বাহ্য জগৎ উত্তীর্ণ হয়ে তুরীয় লোকে অবস্থান।...

একদিন (১১ মার্চ, ১৮৮৫) গিরিশচন্দ্রের গৃহে রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিমন্ত্রণ। নিকটস্থ বলরামের বাড়ি থেকে তিনি এখানে এসেছেন। আর আরম্ভ হয়ে গেছে তাঁর ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ। গিরিশের দোতলার ঘরে নিত্যগোপাল, নরেন্দ্র, রাম দত্ত, শ্রীম. প্রভৃতিকে বলতে লাগলেন অবতারতত্ত্ব, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কালীই ব্রহ্ম প্রসঙ্গে।...'এইবার নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—মোহিলে প্রাণ।...

গান শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণের বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতেছে। আবার নিমীলিত নেত্র। স্পন্দহীন দেহ। সমাধিস্থ!...' (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২০৪)
উপযুক্ত গানের সমূহ প্রভাব অবধারিত তাঁর চিত্তক্ষেত্রে।...
আরেকদিন সকালবেলা (৮ মার্চ, ১৮৮৩)। তিনি দক্ষিণেশ্বরের ঘরে রয়েছেন ভক্তদের সঙ্গে। রামলালকে গান গাইতে বললেন। পর পর পাঁচখানি গান শোনালেন

রামলাল। শেষের গানটি—'প্যারী! কার তরে আর গাঁথো হার যতনে…শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিসিন্ধু মধ্যে মগ্ন হইলেন। ভক্তেরা একদৃষ্টে অবাক হইয়া ঠাকুরের দিকে দেখিতেছেন। আর সাড়াশব্দ নাই। ঠাকুর সমাধিস্থ! হাত জোড় করিয়া বসিয়া আছেন, যেমন ফটোগ্রাফকে দেখা যায়। কেবল চক্ষের বাহিরের কোণ দিয়া আনন্দধারা পড়িতেছে।…' (কথামৃত, পৃঃ ৩৩-৩৪, দ্বিতীয় ভাগ)

তাঁর এমন অপরূপ আনন্দের আস্বাদ—সঙ্গীত শ্রবণের মাধ্যমে।

ঠাকুর (২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪) বীডন স্ট্রীটের স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখছেন। তখন বিদ্যাধরী ও মুনি-ঋষিদের গান হচ্ছে মঞ্চে—'কেশব কুরু করুণা দীনে…বিদ্যাধরীগণ যখন গাইলেন—নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখীপাখা, রাধিকা হৃদি·রঞ্জন' তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধি মধ্যে মগ্ন হইলেন। কনসার্ট (ঐকতান) হইতেছে। ঠাকুরের কোনো হুঁশ নাই।'…তারপর নিমাইকে 'দেবগণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বেশে স্তব করিতেছেন 'চন্দ্রকিরণ অঙ্গে, নমো বামন রূপধারী…ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইলেন।…গৌরাঙ্গের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিতাই গান গাইতেছেন—কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণসই!…শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন।…'

অভিনয় শেষে যখন গাড়িতে উঠছেন, তখনই সেই স্মরণীয় উক্তিটি তিনি করলেন, কথার উত্তরে।

'একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখলেন? ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আসল নকল এক দেখলাম।' (কথামৃত, পৃঃ ১১৭-১২২, দ্বিতীয় ভাগ)

'তিনিই সব হয়েছেন'—এই তত্ত্বের রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করলেন, 'চৈতন্যলীলা'র উৎকৃষ্ট গীতাবলী শ্রবণ করে।…

সেদিন মহাষ্টমী, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪। অধরলালের বাড়িতে দুর্গোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিমন্ত্রিত। সেখানে যাবার আগে তিনি রাম দত্তের গৃহে এসেছেন। এখানে সঙ্গে আছেন বিজয়কৃষ্ণ, নরেন্দ্র, বাবুরাম, শ্রীম. প্রমুখ অনেকে। ঠাকুরের মহাকারণ, ঈশ্বর-কোটি, নিত্যসিদ্ধ প্রভৃতি প্রসঙ্গ, কেদারের গান ইত্যাদির পর—'নরেন্দ্র গান গাইতে লাগিলেন—'আমায় দে মা পাগল করে আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে—গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ।

সমাধি-ভঙ্গের পর ঠাকুর গিরিরাণীর ভাব আরোপ করিয়া আগমনী গাইতেছেন।
…ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান গাইতেছেন।

গানের পর ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন, 'আজ মহাষ্টমী কিনা; মা এসেছেন! তাই এত উদ্দীপন হচ্ছে।'… (কথামৃত, পৃঃ ১২৯-১৩৩, দ্বিতীয় ভাগ)

মহাষ্টমী লগ্নে তাঁর হৃদয়ে জগজ্জননী ভাবের প্রজ্বলন হলো নরেন্দ্রনাথের ভক্তিগীতি শোনার উপলক্ষ্যে।

গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে আরেকদিন (২৪ এপ্রিল, ১৮৮৫) শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তনীয়াদের পদাবলী শুনছেন। 'আরে মোর গোরা দ্বিজমণি!' 'কহ কহ সুবদনী রাধে!' 'পহিলে শুনি অপরূপ ধ্বনি, কদম্ব কানন হৈতে...'

'আহা সকল মাধুর্যময় কৃষ্ণনাম!' এই কথা শুনিয়া ঠাকুর আর বসিতে পারিলেন না। একেবারে বাহ্যশূন্য, দণ্ডায়মান। সমাধিস্থ! ডান দিকে ছোট নরেন দাঁড়াইয়া। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মধুর কণ্ঠে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই কথা সাশ্রুনয়নে বলিতেছেন।... কীর্তনীয়া আবার গাইতেছেন।...ঠাকুর আবার উঠিলেন, নরেন্দ্রাদি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উচ্চ সংকীর্তন করিতেছেন—

(১) যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে তা'রা তা'রা দুভাই এসেছে রে...

(২) নদে টলমল টলমল করে গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে...

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ!

ভাব উপশম হইলে আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—'কোন্ দিকে সুমুখ ফিরে বসেছিলুম, এখন মনে নাই।'... (কথামৃত, পৃঃ ২০৯-২১১, দ্বিতীয় ভাগ)

এখানে কীর্তন শুনতে শুনতে তিনি তদ্‌ভাবে একান্ত ভাবিত হলেন। ক্রমে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন দণ্ডায়মান অবস্থাতেই। তারপর স্বয়ং আরম্ভ করলেন গৌরাঙ্গ ভাবের পদগান। শ্রোতারূপে আর নিষ্ক্রিয় না থেকে, গান-ক্রিয়ায় মগ্ন হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রোতা থেকে গায়ক-গানের অন্তে পুনরায় সমাধি লাভ করলেন। অবশেষে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে আপন শরীরের অবস্থানই ধারণা করতে তিনি অসমর্থ।

তাঁর আনন্দস্বরূপে মগ্ন হওয়ার এমন গান হয়েছিল, কীর্তনীয়াদের পদাবলী গীত।...

একদিন (৬ এপ্রিল, ১৮৮৫) ঠাকুর ভক্ত দেবেন্দ্রের বাড়ি এসেছেন, আহিরীটোলায়। এইবার খোল-করতাল লইয়া সংকীর্তন হইতেছে। কীর্তনীয়া গাহিতেছে—

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটিরে...

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। কীর্তনীয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা গোপীর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

ব্রজগোপী মাধবীকুঞ্জে মাধবের অন্বেষণ করিতেছেন—

রে মাধবী! আমায় মাধব দে!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন,—

(সে মথুরা কতদূর! যেখানে আমার প্রাণবল্লভ!)

ঠাকুর সমাধিস্থ। স্পন্দহীন দেহ। অনেকক্ষণ স্থির রহিয়াছেন।

ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ ; কিন্তু এখনও ভাবাবিষ্ট। এই অবস্থায় ভক্তদের কথা বলিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কথা বলিতেছেন।'…

(কথামৃত, পৃঃ ১৩২-১৩৩, তৃতীয় ভাগ)

এখানে তিনি ঈশ্বরীয় সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন—গানের শ্রোতা থেকে। অপরের কীর্তনে আপনি আখর যোগ করে গেয়েছেন। তারপর সাক্ষাৎ করছেন মহাকালীকে। আর ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে তাঁর সঙ্গেও বাক্যালাপ করছেন। প্রথমে গৌরাঙ্গ বিষয়ে, পরে কৃষ্ণলীলার পদগান শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উদ্দীপন।

সেদিন (৯ মে, ১৮৮৫) বলরাম মন্দিরে তিনি অনেক ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তাঁর নানা প্রসঙ্গের পর গান আরম্ভ করলেন নরেন্দ্র। পর পর দশখানি গান শোনালেন। তারপর আবার 'নরেন্দ্র নিজের মনে গান গাহিতেছেন—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥

সমাধির এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন।

নরেন্দ্র আর একবার সেই গানটি গাইতেছেন—

হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। উত্তরাস্য হইয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়া পা ঝুলাইয়া তাকিয়ার উপর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে উপবিষ্ট।' (কথামৃত, পৃঃ ১৬৭-১৬৮, তৃতীয় ভাগ)।

আরেকদিন (২৫ মে, ১৮৮৪) দক্ষিণেশ্বরে কীর্তনের আসর বসেছে, পঞ্চবটীতলায়। কীর্তনী সহচরী গাইছেন। ঠাকুর শুনছেন ভক্তদের সঙ্গে। হঠাৎ ঝড় উঠতে, সকলে তাঁর ঘরে এলেন। এখানে গৌর সন্ন্যাস গাইতে লাগলেন সহচরী—

'(নারী হেরিবে না!) (সে যে সন্ন্যাসীর ধর্ম!')
(জীবের দুঃখ ঘুচাইতে,) (নারী হে রবে না!)
(নইলে বৃথা গৌর অবতার!)

ঠাকুর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-কথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। অমনি ভক্তেরা গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন। ভবনাথ রাখাল ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন, পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর উত্তরাস্য। বিজয়, কেদার, রাম, মাস্টার, মনোমোহন, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা মণ্ডলাকার করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।…অল্পে অল্পে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। ঠাকুর সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। 'কৃষ্ণ' এই কথা এক একবার উচ্চারণ করিতেছেন। আবার এক এক

বার পারিতেছেন না।'… (কথামৃত, পৃঃ ২৪, চতুর্থ ভাগ)।

অধরলাল সেনের বেনেটোলার বাড়িতে সেদিন (৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪) শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন। ভক্তদের সঙ্গে তিনি দোতলার বৈঠকখানায় রয়েছেন, দুপুরবেলা। প্রথমে নরেন্দ্র তিন চারখানি গান গাইলেন। তারপর গান আরম্ভ করলেন বৈষ্ণবচরণ—

চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি)…

'শ্রীরামকৃষ্ণ—'হরি হরি বল রে বীণে' ঐটে একবার হোক না।

বৈষ্ণবচরণ গাইতেছেন—

হরি হরি বল রে বীণে !

শ্রীহরির চরণ বিনে পরম তত্ত্ব আর পাবি নে ॥…

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাববিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—আহা ! আহা ! হরি হরি বল !

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন ও দর্শন করিতেছেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কীর্তনীয়া ঐ গান সমাপ্ত করিয়া নূতন গান ধরিলেন—

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়

কীর্তনীয়া যখন আখর দিতেছেন 'হরিপ্রেমের বন্যা ভেসে যায়', ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার বসিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া আখর দিতেছেন —(একবার হরি বল রে)।

ঠাকুর আখর দিতে দিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন ও হেঁট মস্তক হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। তাকিয়াটি সম্মুখে। তাহার উপর শিরোদেশ ঢলিয়া পড়িয়াছে।'

কীর্তনীয়া পুনরায় গাইছেন—

'হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে…'

তারপর আরেকটি—

হরি বলে আমার গৌর নাচে।

নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে…

'ঠাকুর আবার উঠিয়াছেন ও আখর দিয়া নাচিতেছেন—

(প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রে)।

সেই অপূর্ব নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।

নাচিতে নাচিতে ঠাকুর এক একবার সমাধিস্থ হইতেছেন। তখন অন্তর্দশা। মুখে একটি কথা নাই। শরীর সমস্ত স্থির। ভক্তেরা তখন তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া

নাচিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অর্ধবাহ্য দশা—চৈতন্যদেবের যেরূপ হইত—অমনি ঠাকুর সিংহ বিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। তখনও মুখে কথা নাই—প্রেমে উন্মত্তপ্রায়।

যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন—অমনি একবার আখর দিতেছেন।

আজ অধরের বৈঠকখানার ঘর শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে। হরিনামের রোল শুনিতে পাইয়া রাজপথে অসংখ্য লোক জমিয়া গিয়াছে।

ভক্ত-সঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ। সেই অবস্থায় নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—সেই গানটি—'আমায় দে মা পাগল করে।'

সেটি শোনাবার পর নরেন্দ্রকে পর পর ঠাকুর আরো তিনটি গানের নাম করে গাইতে বললেন। শেষ গানটিতে—'হরিরস মদিরা পিয়ে—আবার স্বয়ং আখর দিতে লাগলেন—

প্রেমে মত্ত হয়ে হরি হরি বলি কাঁদ রে।
ভাবে মত্ত হয়ে হরি হরি বলি কাঁদ রে।…

তারপর ঠাকুর আবার নরেন্দ্রকে গাইতে বললেন। পরে নিজেও দুখানি গান গাইলেন —'ভুবনরঞ্জন রূপ নদে গৌর কে আনিল রে' ও 'শ্যামের নাগাল পেলুম না রে সই।'… (কথামৃত, পৃঃ ১২৬-১২৯, চতুর্থ ভাগ)।

এমনিভাবে সেদিন তাঁর কথনো গান শুনে সমাধিস্থ, কথনো ভাবোন্মত্ত হয়ে নৃত্য, কখনো বিশেষ বিশেষ গান শোনাতে অনুরোধ, কখনো স্বয়ং গান গাওয়া—অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশায় অপূর্ব দিব্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল অধরলালের বৈঠকখানায়। শ্রোতা-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ব্যক্তিত্ব সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সঞ্জীবিত রেখেছিল।

আরেকদিন (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪) দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে অনেক ভক্ত সমাগম হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে জ্ঞান অজ্ঞান, গুরু-বাক্যে বিশ্বাস এমনি কোনো কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে বলছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

তারপর গানের পালা আরম্ভ হলো। প্রথমে গাইলেন কোন্নগরের একটি ভক্ত। তিনি 'কালোয়াতি গান' শোনালেন।

তারপর নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।

…ঠাকুর তক্তাপোষের উত্তরে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। বেলা ৩টা-৪টা হইবে।'…নরেন্দ্র তারপর 'মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়' গানটি গেয়ে

আবার গাহিতেছেন—

স্বন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।

বরষে অমৃতধার জুড়ায় শ্রবণ ও প্রাণরমণ হে ॥

গভীর বিষাদরাশি নিমেষে বিনাশে যখনি তব নাম সুধা শ্রবণে পরশে।

হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে ॥

নরেন্দ্র যাই গাহিলেন 'হৃদয় মধুময় তব নাম গানে', ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ! সমাধির প্রারম্ভে হস্তের অঙ্গুলি, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলি স্পন্দিত হইতেছে।'....

গানখানি শেষ করে নরেন্দ্র (রবীন্দ্রনাথের) 'দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে রচেছি আসন' গানটি শোনালেন। তখন 'ঠাকুর ভাবাবেশে নীচে নামিয়া মেজেতে নরেন্দ্রের কাছে বসিলেন।' তারপর নরেন্দ্র আরেকটি গান ধরলেন—

'চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।

উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে ॥

জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়।

'জয় দয়াময়' এই নাম শুনিয়া ঠাকুর দণ্ডায়মান, আবার সমাধিস্থ।'

কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হলেন। কিন্তু ভাবাবেশের মধ্যেই নিজে পর পর দুখানি গান গাইলেন—'আমি ঐ খেদে খেদ করি শ্যামা' ও 'এবার আমি ভালো ভেবেছি।'

তারপর আবার নরেন্দ্রের গান হলো। পুনরায় নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিকাল পাঁচটায় তিনি উঠলেন। কলকাতায় যাবেন বলে জামা গায়ে দিয়ে, 'নরেন্দ্রকে বলছেন, তুই আগমনী গেয়েছিস?' তারপর গোল বারান্দা থেকে নেমে, 'নরেন্দ্র ও মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে এলেন 'গঙ্গার পোস্তার উপর।' 'নরেন্দ্র তখন আরম্ভ করলেন, আগমনী।

'নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন,

কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল না তাই।...

ঠাকুর দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট।'...

(কথামৃত, পৃঃ ১৬৯-১৫৪, চতুর্থ ভাগ)।

শ্রোতারূপে গানের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ একাত্মতার নিদর্শন এমনি নানাদিনের অনুষ্ঠান।

যাত্রাপালায় বিখ্যাত গায়ক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের গান শুনেও ঠাকুরের সমাধিস্থ হবার কথা শ্রীম. উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সেই ঘরে, ১৮৮৪ সালের ৫ই

অক্টোবর।

'ঠাকুর ছোট তক্তপোশের উপর নিজের আসনে গিয়া বসিয়াছেন। নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন, একটু মায়ের নাম শুনবো।

নীলকণ্ঠ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গান গাইতেছেন—

গান—শ্যামাপদ আশ, নদীর তীরে বাস।

গান—মহিষমর্দিনী

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ।'...

(কথামৃত, পৃঃ ২০৭, চতুর্থ ভাগ)

নাট্যজগতের বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যাল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তীর (নুলো নামে সুপ্রসিদ্ধ) এক কৃতী শিষ্য রামতারণ। তবে সাধারণ সঙ্গীতক্ষেত্রে অবস্থান না করে, তিনি বাংলার নাট্যশালার সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত থাকেন। প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন সঙ্গীত-পরিচালক এবং গানের সুরযোজক ও শিক্ষকরূপে। বিশেষভাবে গিরিশচন্দ্র পরিচালিত নাট্যমঞ্চে সান্যাল মহাশয়কে সমধিক দেখা যায়। 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের সমস্ত নাটকাদিতেই রামতারণবাবু সুর সংযোজনা করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'মলিন মালা' গীতিনাট্যখানি গিরিশচন্দ্র রামতারণবাবুকে উপহার প্রদান করেন। উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছিলেন—

'ব্রাহ্মণ!—তোমার অনুকম্পায় আমার পুস্তকগুলি উজ্জ্বল হইয়াছে। এখানির তুমিই অধিকারী, তোমার চরণে উপহার রাখিলাম। সেবক শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।'

(গিরিশচন্দ্র, পৃঃ, ২৫২-২৫৩ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।)

গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ বধ' 'সীতার বনবাস', 'অভিমন্যু বধ', 'সীতাহরণ', 'মলিন মালা' প্রভৃতি নাটকের তিনি সঙ্গীত পরিচালক। গিরিশচন্দ্রের বহু গানের সুর-সংযোজক-স্বয়ং মঞ্চে অবতীর্ণও হয়েছেন নানা গীত-প্রধান ও অন্যান্য ভূমিকায়।

যেমন—'মলিনমালা' গীতিনাট্য লহরকুমারের ভূমিকায়। তা ছাড়া 'রামের বনবাস' নাটকে শত্রুঘ্ন, 'সীতাহরণে' ব্যোমচর, 'প্রফুল্ল' নাটকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার চরিত্রেও রামতারণ মঞ্চাবতরণ করেছেন। সবই গিরিশচন্দ্রের নাট্যশালায়।

সেদিন (১৮৮৫, অক্টোবর ২৩) সান্যাল মশায় গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাতে এসেছেন। ঠাকুরের শরীর তখন কাল ব্যাধিতে অসুস্থ। তিনি শ্যামপুকুর বাড়িতে রয়েছেন চিকিৎসার জন্যে। তাঁর ঘরে সে সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, লাটু (অদ্ভুতানন্দ), শশী (রামকৃষ্ণানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ), ছোট নরেন, শ্রীম.,

ভূপতি, গিরিশ প্রভৃতি অনেক ভক্তরা উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধাই ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলবার পর

'এইবার রামতারণের গান হইতেছে—

আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার…'

তারপর তিনি গাইতে লাগলেন—

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই,

কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই ?…

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।'

গিরিশচন্দ্র রচিত ওই দুখানি উচ্চ ভাবের গান সুস্বরে গেয়ে রামতারণ অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। ঠাকুরও তাই ভাবস্থ।

কিন্তু তারপরই গায়ক ধরলেন—

কোঁ কোঁ কোঁ বহরে ঝড়…

বিচক্ষণ শ্রোতা, রসিক এবং সমালোচক শ্রীরামকৃষ্ণ। এমন বিসদৃশ সঙ্গীত পরিবেশনে তাঁর ভাব বিপর্যস্ত হলো। তিনি প্রতিবাদ করলেন গান শেষ হওয়ামাত্র। এমন সুপ্রতিষ্ঠিত গুণীকেও রস ক্ষুণ্ন করবার জন্যে অভিযোগ করতে কুণ্ঠিত হলেন না।

'এই গানটি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বলিতেছেন, 'এ কি কবলে। পায়েসের পর নিমঝোল।'

রামতারণ পুনরায় শোনালেন দুখানি উপযুক্ত বিষয়ের গান। ঠাকুরও গভীর ভাবে বিভোর হলেন।

'রামতারণ আবার গাইতেছেন—

(১) দীনতারিণী দুরিতহারিণী সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণধারিণী,

সৃজন পালন নিধন কারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী !

(২) ধরম করম সকলি গেল, শ্যামা পূজা বুঝি হলো না !

মন নিবারিতে নারি কোনো মতে, ছি ছি কি জ্বালা বল না।

এই গান শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন।'…(কথামৃত, পৃঃ ২৬১-২৬২. চতুর্থ ভাগ)।

শ্রোতারূপে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ তাঁকে দেখা গেল রামতারণ সান্যালের অনুষ্ঠানে। এত বিখ্যাত গায়ককেও বিসমভাবের গান পরিবেশনের জন্যে ভৎর্সনা করলেন। অসামঞ্জস্যের উল্লেখ করলেন বিপরীত ব্যঞ্জনের উপমা যোগে। আবার গায়ন-শিল্পীর সুযোগ্য সঙ্গীতের কালে ভাবগ্রাহী হৃদয়ের আবেশে মগ্ন হয়ে গেলেন।

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বেলঘরে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসেছেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩। সঙ্গে আছেন নরেন্দ্র, রাম দত্ত, শ্রীম. প্রমুখ ভক্ত, প্রতিবেশীরাও। কিছুক্ষণ

কথাবার্তার পর আরম্ভ হলো কীর্তন। সকালেই ঠাকুর নরেন্দ্রদের সঙ্গে সংকীর্তন ও নৃত্যে মেতে উঠলেন।

তারপর দুপুরে তিনি প্রসাদ পেতে বসেছেন ভক্ত সঙ্গে। বৈঠকখানা বাড়ির দোতলা ঘরের বারান্দায়।

'…নীচের প্রাঙ্গণে একটি ভক্ত গান ধরিলেন—

জাগ জাগ জননী,
মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হল কুলকুণ্ডলিনী।

ঠাকুর গান শুনিয়া সমাধিস্থ! সমস্ত শরীর স্থির, হাতটি প্রসাদ পাত্রের উপর যেরূপ ছিল, চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিল। খাওয়া আর হইল না। অনেকক্ষণ পরে ভাবের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বলিতেছেন, 'আমি নীচে যাব, আমি নীচে যাব।'

একজন ভক্ত তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে নীচে লইয়া যাইতেছেন। প্রাঙ্গণেই সকালে নাম সংকীর্তন ও প্রেমানন্দে ঠাকুরের নৃত্য হইয়াছিল। এখনও সতরঞ্চ ও আসন পাতা রহিয়াছে। ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট; গায়কের কাছে আসিয়া বসিলেন। গায়ক এতক্ষণে গানথামাইয়াছিলেন। ঠাকুর অতি দীনভাবে বলিতেছেন, 'বাবু, আর এক-বার মায়ের নাম শুনব।'

গায়ক আবার গান গাহিতেছেন—

জাগ জাগ জননী……

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট।' (কথামৃত পৃঃ ২৮-৩০, পঞ্চম ভাগ)

ভগবানের অবতাররূপে তিনি যখন এত ভক্তজনের মাননীয় হয়েছেন, তখনো শুধু গান শোনবার জন্যে তাঁর কি 'দীনভাবে' অনুরোধ গায়কের কাছে! শ্রোতারূপে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্চর্য নিরভিমানতা! তারপর গান শুনতে শুনতে পুনরায় সমাধিস্থ হয়ে যাওয়া। গায়কের পক্ষে এমন শ্রোতাই পরম কাম্য।

আরেকদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের ঘরে রয়েছেন। সকালবেলা, ১৮৮৩ সালের ২৭ মে। রবিবার বলে এসেছেন শ্রীম. প্রমুখ অনেক ভক্ত।

অপর কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ভালো নয়, নিষ্ঠা ভক্তি থাকা ভালো, ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়—এইসব প্রসঙ্গের পর তিনি কালীমন্দিরে পূজা করতে গেলেন। অনেকক্ষণ পূজার পর উঠলেন ভাবে বিভোর হয়ে। মা কালীর নাম মুখে নিয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। তারপর—'ঠাকুর নিজের ঘরের পশ্চিম বারান্দায় আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। কাছে রাখাল, মাস্টার, নকুড় বৈষ্ণব প্রভৃতি…ঠাকুর ভাবাবেশে গান গাইতেছেন—' পর পর তিনি ছ'খানি গান গাইলেন এই অবস্থায়:

(১) সদানন্দময়ী কালী (মহাকালের মনোমোহিনী)।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ মা আপনি দাও মা করতালি ॥
আদিরূপা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালি।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন (তুই) মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।
যেমন করাও তেমনি করি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি ॥
নির্গুণে কমলাকান্ত দিয়ে বলে মা গালাগালি।
সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম দুটো খেলি ॥
(২) আমার মা ত্বং হি তারা তুমি ত্রিগুণাধারা পরাৎ পরা।
আমি জানি মা ও দীন-দয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুখহরা ॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী, গো মা,
তুমি অকুলের ত্রাণকর্ত্রী সদাশিবের মনোহরা ॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্য মূলে গো মা ;
আছ সর্ব ঘটে অক্ষ পুটে সাকার আকার নিরাকারা ॥
(৩) গোলেমালে মাল রয়েছে, গোল ছেড়ে মাল বেছে নাও……
(৪) মন চলে যাই আর কায নাই, তারার ও তালুকে রে……
(৫) পড়িয়ে ভবসাগরে ডোবে মা তনুর তরী……
(৬) মায়ে পোয়ে দুটো দুখের কথা কই……'

তারপর ভক্তদের সঙ্গে কিছু সৎ প্রসঙ্গ করে—'ঠাকুর আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতে না করিতে মনোহরসাঁই গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত।

গোস্বামী পূর্বরাগ কীর্তন গান করিতেছেন। একটু শুনিতে শুনিতেই ঠাকুর রাধার ভাবে ভাবাবিষ্ট।…

গোস্বামী আবার গাইতেছেন—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আসে যায়
কিবা মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে যায়।
(রাই, এমন কেন বা হ'ল গো !)

গানের এই লাইনটি শুনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবের অবস্থা হইতেছে। গায়ের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

কীর্তনীয়া যখন গাইতেছেন—

শীতল তছু অঙ্গ।
তনু পরশে, অমনি অবশ অঙ্গ।

ঠাকুরের মহাভাবে কম্প হইতেছে।

(কেদার দৃষ্টে) ঠাকুর কীর্তনের সুরে বলিতেছেন, 'প্রাণনাথ, হৃদয়বল্লভ তোরা কৃষ্ণ এনে দে ; সুহৃদের তো কায বটে ; হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে চল ; তোদের চিরদাসী হব।'

গোস্বামী কীর্তনীয়া ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি কর-জোড়ে বলিতেছেন, 'আমার বিষয়-বুদ্ধি ঘুচিয়ে দিন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'সাধু বাসা পাকড় লিয়া।' তুমি এত বড় রসিক ; তোমার ভিতর থেকে মিষ্টি রস বেরুচ্চে।' (তদেব, পৃঃ ৪০-৪২, পঞ্চম)।

শ্রীচৈতন্য-তুল্য মহাভাবের অবস্থা, কীর্তনের প্রভাবে এমন আপ্লুত হওয়া, শ্রোতারূপে ঠাকুরের এক অনবদ্য পরিচয়।

গান ও সুরের আবেদনে তাঁর দেহ মনে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। অতিশয় স্পর্শকাতর নন্দন-সত্তা শ্রীরামকৃষ্ণের। নিতান্ত সংবেদনশীল হৃদয়তন্ত্রী। যে উপলক্ষ্য অন্যের নিকটে হয়ত তুচ্ছ, তাঁর কাছে তা হতে পারে অসামান্য ব্যঞ্জনাময়। তার উদাহরণ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত বিবরণে :—

দক্ষিণেশ্বরে একদিন 'ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দাটিতে বসিয়া আছেন। রাত্রি ৯টা হইবে। মাস্টার কাছে বসিয়া আছেন, রাখাল প্রভৃতি এক একবার ঘরের ভিতর যাতায়াত করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—দেখ, এখানে যারা আসবে সকলের সংশয় মিটে যাবে, কি বল ?

মাস্টার—আজ্ঞা হাঁ।

এমন সময় গঙ্গাবক্ষে অনেক দূরে মাঝি নৌকা লইয়া যাইতেছে ও গান ধরিয়াছে। সেই গীত ধ্বনি, মধুর অনাহত ধ্বনির ন্যায় অনন্ত আকাশের ভিতর দিয়া গঙ্গার বক্ষ যেন স্পর্শ করিয়া ঠাকুরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ঠাকুর অমনি ভাবাবিষ্ট। সমস্ত শরীর কণ্টকিত। ঠাকুর মাস্টারের হাত ধরিয়া বলিতেছেন,—'দেখ দেখ আমার রোমাঞ্চ হচ্চে। আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ।' তিনি সেই প্রেমাবিষ্ট কণ্টকিত দেহ স্পর্শ করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। 'পুলকে পূরিত অঙ্গ।' উপনিষদে কথা আছে যে তিনি বিশ্বে আকাশে 'ওতপ্রোত' হয়ে আছেন, তিনিই কি শব্দরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতেছেন ? এই কি শব্দ ব্রহ্ম ?'…

(তদেব, পৃঃ ৬০, পঞ্চম ভাগ)

উদার অম্বরতলে নৌচালকের সহজ সরল সুরের স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ রোমাঞ্চিত ! গানের কি অতুলনীয় প্রভাবের প্রতিমূর্তি তিনি। সঙ্গীতৈকপ্রাণ ঠাকুরের

কণ্টকিত শরীর দেখে শ্রীম.-র মনে জেগেছে শব্দ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা। বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই বাণী মহেন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন—ব্রহ্মাণ্ডে গগনে যিনি ওতপ্রোত হয়ে আছেন! তিনিই কি শব্দরূপে স্পর্শ করছেন ঠাকুরকে? শ্রীম-র এই মহা প্রশ্নের উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রোতারূপে প্রকাশমান!

'আর একদিন ঠাকুর কলিকাতায় বেনেটোলায় অধরের বাড়িতে আসিয়াছেন। আষাঢ় শুক্লা দশমী, ৪ই জুলাই, ১৮৮৩, শনিবার। অধর ঠাকুরকে রাজনারাণের চণ্ডীর গান শুনাইবেন। রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি সঙ্গে আছেন। ঠাকুর দালানে গান হইতেছে। রাজনারা'ণ গান ধরিলেন—

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি!...

ঠাকুর খানিক শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট, দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়া গান গাইতেছেন।

ঠাকুর আখর দিতেছেন, 'ওমা, রাখ মা'। আখর দিতে দিতে একেবারে সমাধিস্থ। বাহ্যশূন্য, নিস্পন্দ! দাঁড়াইয়া আছেন। গায়ক আবার গাহিতেছেন—

সমর আলো করে কার কামিনী
সজল জলদ্ জিনিয়া কায় দশনে প্রকাশে যামিনী!

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ!... (তদেব, পৃঃ ৬১, পঞ্চম ভাগ)

এখানে তাঁর চণ্ডীর গান শুনে ভাবাবেশ, তারপর স্বয়ং গায়ক হয়ে পূর্ব গায়কদের সঙ্গে গানে যোগদান, আখর দেওয়া, পুনরায় সমাধিস্থ হওয়া, আবার গান ইত্যাদিব বিবরণ পাওয়া গেল। শ্রোতা ও গায়কের অতি নিকট অবস্থান তাঁর মধ্যে। সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে প্রায়স তাঁর এই দুই স্বরূপ স্থান পরিবর্তন করে পরস্পর।...

অন্য একদিনের লিপি থেকে জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের কথা। দক্ষিণেশ্বরে কেমনভাবে তাঁর জন্মতিথি সেকালে পালন করা হতো, যখন স্বয়ং তিনি বাহ্যরূপে বর্তমান। আর তাঁর অন্তরঙ্গ, প্রিয় শিষ্যরা সেই শুভ অনুষ্ঠানের উদ্‌যোক্তা। দেখা যায়, ভজনে কীর্তনে ঈশ্বরীয় কথোপকথনে ভক্তসমাগমে নিষ্ঠায় ভক্তিতে আন্তরিকতাময় সরল অনাড়ম্বর উৎসব—ঠাকুরকে কেন্দ্র করে। সেদিন সেখানে সঙ্গীতের এক মুখ্য স্থান।

'শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উত্তর-পূর্ব লম্বা বারান্দায় গোপীগোষ্ঠ ও সুবল মিলন কীর্তন শুনিতেছেন। নরোত্তম কীর্তন করিতেছেন। আজ রবিবার ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, ১২ই ফাল্গুন, ১২৯১, শুক্লাষ্টমী। ভক্তেরা তাঁহার জন্মমহোৎসব করিতেছেন। গত সোমবার ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া তাঁহার জন্মতিথি গিয়াছে। নরেন্দ্র,

রাখাল, বাবুরাম, ভবনাথ, সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, বিনোদ, হাজরা, রামলাল, রাম, নিত্যগোপাল, মণি মল্লিক, গিরিশ সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তের সমাগম হইয়াছে। কীর্তন প্রাতঃকাল হইতেই হইতেছে, এখন বেলা ৮টা হইবে। মাস্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া কাছে বসিতে বলিলেন।

কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।...

কীর্তনীয়া আবার গাহিতেছেন।...ঠাকুর বসিয়া ভক্তসঙ্গে কীর্তন শুনিতেছেন। হঠাৎ নরেন্দ্রের দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল"। নরেন্দ্র কাছেই বসিয়াছিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। নরেন্দ্রের জানু এক পা দিয়া স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।...

কীর্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রকে আদর করিয়া মিঠাই খাওয়াইতেছেন।

গিরিশের বিশ্বাস যে ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনার সব কায শ্রীকৃষ্ণের মতো। শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোদার কাছে ঢঙ্ করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার। নরলীলায় ঐরূপ হয়। এদিকে গোবর্ধন গিরি ধারণ করেছিলেন, আর নন্দের কাছে দেখাচ্ছেন, পিঁড়ে বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

গিরিশ—বুঝেছি, এখন আপনাকে বুঝ্‌ছি।

ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। বেলা ১১টা হইতে। রাম প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরকে নববস্ত্র পরাইবেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'না, না।'...ভক্তেরা অনেক জিদ করাতে ঠাকুর বলিলেন, 'তোমরা বলছ, পরি।'

ভক্তেরা ঐ ঘরেতেই ঠাকুরের অন্নাদি আহারের আয়োজন করিতেছেন।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাইতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র গাহিতেছেন—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি...

নরেন্দ্র যাই গাইলেন, 'সমাধিমন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বসি!' ঠাকুর অমনি বাহ্যশূন্য, সমাধিস্থ! অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গের পর ভক্তেরা ঠাকুরকে আহারের জন্য আসনে বসাইলেন।...'

কোন্নগরের ভক্তেরা নৌকায় এসে, কীর্তন করতে করতে প্রবেশ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। কীর্তনান্তে তাঁরা জলযোগ করতে বাইরে গেলেন। কিন্তু ঠাকুরের ভালো লাগেনি তাঁদের গান। নিষ্প্রাণ, নীরস মনে হয়েছিল। নরোত্তম কীর্তনীয়া তখন তাঁর ঘরে বসে। তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'এদের যেন ভোজা-ঠেলা গান। এমন গান হবে যে সকলে নাচবে।'

এই বলে তিনি স্বয়ং তিনখানি গান গাইলেন—

(১) নদে টলমল টলমল করে…

(২) যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দু ভাই এসেছে রে…

(৩) গৌর নিতাই তোমরা দু ভাই, পরম দয়াল হে প্রভু…

'এইবার ভক্তেরা প্রসাদ পাইতেছেন।…'

তারপর হাস্যকৌতুকের মধ্যে নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হলো। পুনরায় নরেন্দ্রের গানের পালা। 'নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া শুনিতেছেন।…

(১) অন্তরে জাগিছ ওমা অন্তরযামিনী…

(২) গাওরে আনন্দময়ীর নাম…

(৩) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।…

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রের কাছে বসিয়া শুনিতেছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া কথা কহিতেছেন।…

'গান গাইব? আচ্ছা গাইলেও হয়। জল স্থির থাকলেও জল আর হেললে দুললেও জল।'…

আবার কিছু প্রসঙ্গের পর তিনি গাইলেন—

এই সংসার মজার কুটি…'

এমন কি, উৎসবান্তে সন্ধ্যার পরেও তিনি শোনালেন আরো চারখানি গান। কোনো কোনো গান গাইবার সময় গিরিশচন্দ্রের গায়ে হাত দিয়ে রইলেন—

(১) 'মা কি আমার কালো রে…'

(২) গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়…

(৩) এবার আমি ভালো ভেবেছি…

(৪) অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি…

তাবপর আবার ঈশ্বরীয় কথা বলতে লাগলেন রাত্রি পর্যন্ত। এমনিভাবে তাঁর দেহত্যাগের আগের বছরের জন্মোৎসব পালিত হলো।

(তদেব, পৃঃ ১২৮-১৩৭, পঞ্চম ভাগ)।

এইদিনে তিনি স্বয়ং গাইলেন সাতখানি গান। আর নরেন্দ্রনাথ তিনটি গান শোনালেন।

গান শুনে সমাধিস্থ হবার নানা দৃষ্টান্তই আছে শ্রীম-র বিবরণীতে। এমন কি যন্ত্রসঙ্গীত শুনেও যে তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন, তাও দেখা গেছে বীণ্‌কার মহেশচন্দ্র সরকারের সঙ্গে। সানাই বাজনা শুনেও ভাবস্থ হবার কথা ঠাকুর নিজে একবার জানিয়েছেন। সেদিন স্টার থিয়েটারে 'ধূমকেতু' অভিনয় দেখেছেন ভক্তদের সঙ্গে। নাটকের শেষে রঙ্গমঞ্চের বিশ্রামঘরে তিনি গিরিশচন্দ্র, নরেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে রয়েছেন।

'এখনও ঐকতান বাদ্যের (কন্‌সার্ট) শব্দ শুনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—এই বাজনা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) সানাই বাজত, আমি ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতুম ; একজন সাধু আমার অবস্থা দেখে বলত, এ সব ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ।'

ভাবস্থ বা সমাধিস্থ হবার বিষয়ে তাঁর নিজেরই আরেকদিন (২৬ অক্টোবর, ১৮৮৫) কথা হয় ডাক্তার মহেন্দ্রলালের সঙ্গে। প্রসঙ্গত তাও এখানে উল্লেখ্য। অত বড় বৈজ্ঞানিক-মনা চিকিৎসক, 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ্‌ সায়েন্স' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক মহেন্দ্রলাল বৈষ্ণবীয় 'ভাবটাব ভালোবাসেন না।' কিন্তু প্রায়শ ভাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে কতখানি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন, তাও জানা যায় এই কথোপকথন থেকে :—

'শ্রীরামকৃষ্ণ (হাত জোড় করে)—আমি কি করবো ? সেই অবস্থাটা এলে বেহুঁশ হয়ে যাই ! কি করি কিছুই জানতে পারিনা।

ডাক্তার—সাবধান হওয়া উচিত ··

শ্রীরামকৃষ্ণ—তখন কি আমি কিছু করতে পারি ?—তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর ? যদি ঢং মনে কর তবে তোমার সায়েন্স মায়েন্স ছাই পড়েছ।

ডাক্তার—মহাশয়, যদি ঢং মনে করি তাহলে কি এত আসি ? এই দেখ, সব কাজ ফেলে এখানে আসি ; কত রোগীর বাড়ি যেতে পারি না, এখানে এসে ছয় সাত ঘণ্টা ধরে থাকি।'

সঙ্গীতে তাঁর সমাধিলাভের আর বেশি উল্লেখ বাহুল্য।

কেবল একটি শেষের প্রসঙ্গ এখানে উদ্ধৃত করা হলো। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের গল-ক্ষত খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতায় চিকিৎসার সুবিধা বলে, দক্ষিণেশ্বর থেকে তাঁকে আনা হয়েছে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে। এখানে বাসাবাড়িতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল নিয়মিত এসে তাঁর ঔষধাদির ব্যবস্থা ও দেখাশুনা করছেন। শিষ্য ও ঘনিষ্ঠ ভক্তরাও আসেন সকলে। এমন যন্ত্রণাদায়ক রোগ সত্ত্বেও ঠাকুরের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ এবং সদানন্দ ভাব পূর্ববৎ। তবে শিষ্য-সেবকদের ঐকান্তিক অনুরোধে তাঁর গান গাওয়া বন্ধ আছে। কিন্তু অপরের গান শুনে তিনি ভাব সংবরণ করতে অপারগ হন আগের মতনই। তাও তাঁর শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল এবিষয়ে তাঁকে সতর্ক করে রাখেন। এমন এক সময়ের কথা।

সেদিন (২৭ অক্টোবর, ১৮৮৫) তাঁর ঘরে 'নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু, গিরিশ-চন্দ্র, ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র, রাখাল, শ্রীম. প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। মহেন্দ্র-লাল ডাক্তার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

পীড়া সম্বন্ধীয় কথার পর ও শ্রীরামকৃষ্ণের ঔষধ সেবনের পর ডাক্তার বলিলেন, 'তবে শ্যামবাবুর সঙ্গে তুমি কথা কও, আমি আসি।'
শ্রীরামকৃষ্ণ ও একজন ভক্ত বলিয়া উঠিলেন, 'গান শুনবেন?'
ডাক্তার—'তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে ওঠ। ভাব চেপে রাখতে হবে।'
ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন নরেন্দ্র মধুর কণ্ঠে গান করিতেছেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতেছে। গাহিতেছেন—

(১) চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার।
শোভার আগার বিশ্বসংসার।...
(২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।...

ডাক্তার মাস্টারকে বলিলেন, 'It is dangerous to him.'
(এ গান ঠাকুরের পক্ষে ভালো নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে)।
শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলছে?
তিনি উত্তর করিলেন, ডাক্তার ভয় করছেন পাছে আপনার ভাব সমাধি হয়।
বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ একটু ভাবস্থ হইয়াছেন, ডাক্তারের মুখ পানে তাকাইয়া করজোড়ে বলিতেছেন, 'না, না, কেন ভাব হবে?'
কিন্তু একথা বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন, নয়ন স্থির! অবাক! কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট! বাহ্যশূন্য! মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মানুষ নয়। নরেন্দ্রের মধুর কণ্ঠে গান চলিতেছে—'
(তদেব, পৃঃ ২৪৫-২৪৬, প্রথম ভাগ।)

অসুস্থ শরীরে এই ভাবাবেশ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং একদিন মন্তব্য করেন গুপ্ত মহেন্দ্রনাথের কাছে:
'শ্রীরামকৃষ্ণ—এক একবার ভাবি দেহটা খোল মাত্র, সেই অখণ্ড (সচ্চিদানন্দ) বই আর কিছু নাই।
ভাবাবেশ হলে গলার অসুখটা একপাশে পড়ে থাকে। এখন ঐ ভাবটা একটু একটু হচ্ছে, আর হাসি পাচ্ছে।' (তদেব, পৃঃ ৬৫৩, পঞ্চম ভাগ।)
গানের এমনই দুর্দমনীয় প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্তে। শরীর যতই ভঙ্গুর ও অপটু হোক, সঙ্গীতে উদাসীন থাকা অসম্ভব তাঁর শিল্পীহৃদয়ের পক্ষে। গানের সংবেদনে যখন গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে তাঁর অন্তরাত্মা, তখন দেহের ওই মারাত্মক পীড়া বোধও যেন লয় পেয়ে যায়।
সঙ্গীতকে আপন সত্তায় শ্রীরামকৃষ্ণ এমন নিবিড় ভাবে গ্রহণ করেন যে সমাধিস্থ হয়ে যান কখনো কখনো। আবার গীতের সংস্পর্শে কখনো সক্রিয় গায়ক ও নৃত্যপর হয়ে

ওঠেন। স্বয়ং যোগ দেন গায়কের গানের সঙ্গে। কীর্তনের আসর হলে নিজস্ব আখর দেন। কোনো কোনো সময় আরম্ভ করেন স্বতন্ত্র গান। নিষ্ক্রিয় শ্রোতা থাকতে অসমর্থ হন। তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কোনো কোনো দিনের সমাধি প্রসঙ্গে। এখানে আরো কয়েকটি উদ্ধৃত করা হলো।

ঠাকুর সেদিন এসেছেন ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাঁকুড়গাছির বাগানে। সেদিনকার মহোৎসবে কীর্তনের আসর বসেছে সকাল থেকেই। কীর্তনীয়ারা মাথুর গাইছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনছেন ভক্তদের সঙ্গে। 'শীতল তছু অঙ্গ হেরি সঙ্গসুখ লালসে,' 'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব', 'ধনি ভেল মুরছিত হয়ল গেয়ান', 'মধুপুর নাগরী, হাঁসি কহত ফিরি' প্রভৃতি গান শোনালেন কীর্তনীয়ারা। তারপর 'রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। কীর্তনীয়ারা ঐ ভাবের গান গাহিতেছেন। (আর শ্রোতা হয়ে থাকতে পারলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ)।

ঠাকুর আখর দিতেছেন—

ধনি দাঁড়ালো রে।
অঙ্গ হেলাইয়া ধনি দাঁড়ালো রে।
শ্যামের বামে ধনি দাঁড়ালো রে।
তমাল বেড়ি বেড়ি ধনি দাঁড়ালো রে।'…

(তদেব পৃঃ ১১৯-১২১, প্রথম ভাগ)।

গানের সঙ্গে শ্রোতারূপে যে কতখানি যুক্ত থাকতে পারেন, এমন অন্তরঙ্গভাবে আখর দেওয়া তার মনোরম নিদর্শন।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরের ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রিয় প্রসঙ্গ করেছেন। জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত ঈশ্বরকে ভালোবাসা, এ বিষয়ে বল্‌ছেন গুপ্ত মহেন্দ্রনাথকে। রাখাল, লাটু, রামলালও আছেন। কথার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ গানও শোনাতে বলছেন রামলালকে।

'ঠাকুর মণিকে (শ্রীম.-র ছদ্মনাম) বলিতেছেন, কথাটা এই—তাঁকে ভক্তি করা, তাঁকে ভালোবাসা। রামলালকে গাইতে বলিলেন। তিনি মধুরকণ্ঠে গাইতেছেন।

ঠাকুর এক একটি গান ধরাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর বলাতে রামলাল প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গাইতেছেন—

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগৌরাঙ্গ মুরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে…'

রামলাল গানখানি সম্পূর্ণ গাইবার পর

'ঠাকুর বলিলেন, সেই গানটি গা তো

(১)—আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,

শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই···

(২)—রাধার দেখা কি পায় সকলে,
রাধার প্রেম কি পায় সকলে···

(৩)—নবনীরদবর্ণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে,
করেতে বাঁশি অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো করে···

ঠাকুর রামলালকে আবার বলিতেছেন—সেই গানটি গা—গৌর নিতাই তোমরা দুভাই।'

রামলাল গান আরম্ভ করতে শ্রীরামকৃষ্ণও আর শ্রোতা থাকতে অপারগ হলেন। গাইতে লাগলেন রামলালের সঙ্গে একযোগে—

গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পরম দয়াল হে প্রভু
(আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ)

আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন কাশী বিশ্বেশ্বরে, ও সে পরব্রহ্ম শচীর ঘরে, (আমি চিনেছি হে, পরব্রহ্ম)।···' (তদেব পৃঃ ৯১-৯২, দ্বিতীয় ভাগ)।

সুদীর্ঘ এই গানখানি সম্পূর্ণ করে সেদিনের প্রসঙ্গ শেষ হলো।

একদিন রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে এসেছেন, ১১ সিমলা স্ট্রীটে। ঘরে অনেক ভক্ত রয়েছেন। প্রথমে ঠাকুর গান গাইতে বললেন কেদারকে। তাঁর তিনখানি গানের পর নরেন্দ্র একটি গাইলেন।

তাঁদের গান শুনতে শুনতে গায়কে পরিণত হলেন মহান শ্রোতা। আপনার ভাবে গাইতে আরম্ভ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথমে একখানি আগমনী গান শোনালেন। তারপর গাইলেন—তারে কি পেলাম সই, হলাম যার জন্য পাগল।

ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল আর পাগল শিব···

গানটি শেষ পর্যন্ত গেয়ে, 'আবার ভাবে মত্ত হইয়া ঠাকুর গাহিতেছেন—

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা, সুধা-তরঙ্গিণী।

ঠাকুর গান করিতেছেন। হঠাৎ 'হরিবোল হরিবোল' বলিতে বলিতে বিজয় দণ্ডায়মান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবোন্মত্ত হইয়া বিজয়াদি ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।'··· (তদেব পৃঃ ১৩১-১৩৩, দ্বিতীয় ভাগ)

বোসপাড়ায় বলরাম বসুর বৈঠকখানায় সেদিন তিনি রয়েছেন। গিরিশচন্দ্র, শ্রীম., বলরাম, মহেন্দ্র ও প্রিয় মুখুজ্যে, রাম দত্ত, ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন প্রমুখ অনেক ভক্ত উপস্থিত। চিকের আড়ালে আছেন ভক্তিমতী মহিলারা। নানা গভীর অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন অতি সহজ ভাষায়, কখনো প্রাঞ্জল উপমা কখনো বা চিত্তাকর্ষক গল্প সহযোগে। সেই সঙ্গে, মাঝে-মাঝেই হাস্য হরিহাসে

সকলকে রসসিক্ত করছেন। অনেকক্ষণ কাটল এইভাবে।

তারপর একসময় গানের পালা আরম্ভ হলো। বাইরে থেকে যখন গায়ক উপস্থিত, তখন তাঁর গান তো হবেই ঠাকুরের সামনে। সঙ্গীতের এমন পরম অনুরাগীকে শুনিয়ে গায়ন-শিল্পীর নিজেরও তৃপ্তি।

ত্রৈলোক্যনাথ এখন গান গাইবেন। আগের একদিন তাঁর সঙ্গীত অত্যন্ত ভালো লেগেছিল ঠাকুরের। মর্মজ্ঞ শ্রোতা তিনি। তাই আজ সেকথা স্মরণ করে পুনরায় সে গানটি সান্যাল মহাশয়কে শোনাতে অনুরোধ করলেন।

'শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা, তুমি আনন্দময়ীর গান সেদিন করলে,—কি গান! আর সব লোকের গান আলুনি লাগে।...সেইটে অমনি অমনি হোক না।'

ত্রৈলোক্যনাথ গাইতে লাগলেন—

জয় শচীনন্দন গৌর গুণাকর,
প্রেম পরশমণি ভাব-রস-সাগর।
কিবা সুন্দর মূরতিমোহন,
আঁখিরঞ্জন কনকবরণ ;
কিবা মৃণাল নিন্দিত আজানুলম্বিত,
প্রেম প্রসারিত কোমল যুগল কর॥...'

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে এই দুখানি গান গাইতে অনুরোধ করলেন—'কত ভালোবাস গো মা মানব সন্তানে' ও 'আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।'

তার পরে তিনি রাম দত্তের কথায় গাইলেন—'মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল।'

পুনরায়, প্রথমে গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ ও পরে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে ত্রৈলোক্যনাথ গাইতে লাগলেন—

গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পরম দয়াল হে প্রভু...

ভক্তরাও কণ্ঠ মেলালেন এই গানের সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণেরও সঙ্গীতের উদ্দীপন হলো। তিনি আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারলেন না শ্রোতা হয়ে।

'ঠাকুরও যোগদান করিলেন। সমাপ্ত হইলে আর একটি ধরিলেন—

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝুরে তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে তারা দুভাই এসেছে রে...'

এখন তিনি গৌরাঙ্গের ভাবে এবং সঙ্গীতের রসে পরিপূর্ণ। ওই গানটি শেষ করেও তিনি স্তব্ধ হলেন না। আবার একখানি ধরলেন—

নদে টলমল টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে…

সেটি শেষ করে পুনরায় গাইতে লাগলেন—

কে হরিবোল হরিবোল বলিয়ে যায় ?
যা রে মাধাই জেনে আয়।
বুঝি গৌর যায় আর নিতাই যায় রে ।
যাদের সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়।
যাদের ন্যাড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথা রে।
যেন দেখি পাগলের প্রায়।'

শ্রোতা থেকে কখন তিনি অনুষ্ঠানের মূল গায়ক হয়ে উঠেছেন স্বাভাবিক সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বে!

এই গানটি শেষ হতে, ছোট নরেন বিদায় নিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, 'তুই বাপ-মাকে খুব ভক্তি করবি। কিন্তু ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে মান্‌বিনি। খুব রোক করবি…'

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ এই তরুণ ভক্তকে যে উপদেশ দিলেন, তাতে দেখা গেল, ঠাকুরের আশ্চর্য বাস্তব জ্ঞান। এতক্ষণ গানের ভাবের জোয়ারে তিনি ভাসমান ছিলেন, বোধ হচ্ছিল। শ্রোতা ও গায়করূপে কি গভীর ভাবজগতে অবস্থান করছিলেন তিনি। অথচ ছোট নরেন চলে যাবার সময় সচেতনভাবে তাঁকে তখনি স্মরণ করিয়ে দিলেন— জীবনের পরম লক্ষ্য কি এবং পিতামাতার দিক থেকে বাধা এলেও তা গ্রাহ্য না করতে। মাতাপিতাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেও আপনার উদ্দেশ্যের দিকে অটল থাকবার নির্দেশ দিলেন, অমন নিরন্তর সঙ্গীতের পরিবেশেও। আবার শিষ্য যাওয়ামাত্র ঠাকুর গানের জগতে ফিরে এলেন।

একটু পরে ত্রৈলোক্যকে বললেন, 'সেই গানটি আর একবার।'

তিনি গাইলেন—জয় শচীনন্দন গৌর গুণাকর…

গানখানি শেষ করতে ঠাকুর তাঁকে 'অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছেন, 'একবার সেই গানটি!—কি দেখিলাম রে।'

ত্রৈলোক্য গাইতেছেন—

'কি দেখিলাম রে কেশবভারতীর কুটীরে…' (পৃঃ ১৫০-১৫৩। তৃতীয় ভাগ)

গায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ কখন শ্রোতায় রূপান্তরিত—অবিচ্ছিন্ন সত্তা!…

ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ নানা দিনে হয়েছে। কখনো দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। কখনো কেশবচন্দ্রের রাজাবাজারস্থ গৃহ কমলকুটীরে। কখনো কেশবচন্দ্রের সদলে স্টীমার-যাত্রায়। কখনো শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম প্রমুখ ঘনিষ্ঠ ভক্তের

ভবনে। তার মধ্যে যত দিনের বিবরণ পাওয়া যায় তার প্রত্যেক দিনেই গান গেয়েছেন দুজনেই, কিংবা একজন। তাঁদের পারস্পরিক যোগাযোগ সঙ্গীতবিহীন কখনো ঘটে নি। কোনোদিন আপন ভাবে, কোনোদিন শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে গান গেয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ।

তাঁর গানের অনুষঙ্গে শ্রোতা শ্রীরামকৃষ্ণের সক্রিয় হবার একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হলো। ভাবাবেগে তাঁর নৃত্যগীত।

ঠাকুর সেদিন (২ এপ্রিল, ১৮৮২) এসেছেন কমলকুটীরে। বিকালবেলা বৈঠকখানায় তিনি বসলেন। সংবাদ পেয়ে, কেশবচন্দ্র এলেন ভিতরের ঘর থেকে।

তিনি কেশবকে বললেন, 'তোমার অনেক কাজ, আবার খপরের কাগজে লিখতে হয়; সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবার অবসর নাই; তাই আমিই তোমায় দেখতে এসেছি।...'

সেখানে প্রতাপ মজুমদার, ব্রহ্মব্রত সমাধ্যায়ী, ত্রৈলোক্যনাথ, গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ (তিনি আগে থেকেই কেশবের অনুগামী ছিলেন, এ সময় ঠাকুরের কাছে এসেছেন মাসখানেক মাত্র আগে) প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তরা তখন ছিলেন।

কেশবচন্দ্র ও অন্যান্যের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হলো কিছুক্ষণ। তারপর—'শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাইতেছেন। গান গাইতে গাইতে সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হইল, গান চলিতে লাগিল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান—আর মার নাম জপ করিতে করিতে সমাধিস্থ। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজেই নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন—

> সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী ব'লে,
> মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
> গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে;
> জ্ঞান-শুঁড়িতে চোঁয়ায় ভাঁটি পান করে মোর মন-মাতালে॥
> মূল মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা;
> প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে॥

শ্রীযুক্ত কেশবকে ঠাকুর স্নেহপূর্ণ নয়নে দেখিতেছেন। যেন কত আপনার লোক, ...তাঁহার দিকে তাকাইয়া আবার গান ধরিলেন—

> কথা বলতে ডরাই; না বললেও ডরাই।
> মনে সন্দ হয়; পাছে তোমা ধনে হারাই হারাই॥
> আমরা জানি যে মন-তোর; দিলাম তোরে সেই মন্তোর।
> এখন মন তোর, যে মন্ত্রে বিপদেতে তরী তরাই॥'

(পৃঃ ১১-১২, পঞ্চম ভাগ)

ত্রৈলোক্যনাথের গান উপলক্ষ্যে তিনি উদ্দীপিত হয়েছিলেন। তার সুফলে শোনালেন মহামন্ত্রের গান।...

ঠাকুরের শেষ অসুখের সময়কার আরেকটি উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন তাঁর গান শোনায় সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সঙ্গীতের প্রভাবে আবেগ-উত্তেজনার আশঙ্কা। তখন তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠ একপ্রকার অবরুদ্ধ। প্রাণের গানকে মুক্ত করতে অসমর্থ। সেই অবস্থায়ও নৃত্য করে উঠেছেন শ্রোতা শ্রীরামকৃষ্ণ। ১৮৮৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। বৌবাজারের রাখাল ডাক্তারকে শ্রীম. এনেছেন, ঠাকুরকে দেখাবার জন্যে। তিনি পরীক্ষা করবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন।

একজন ভক্ত তাঁকে বললেন, 'আপনি যদি মাকে বলেন, মা এই রোগটা সারিয়ে দাও, তাহলে শীঘ্র সেরে যায়।' •

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'রোগ সারাবার কথা বলতে পারি না ;...আজকাল 'আমি'টা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখছি তিনিই এই খোলটার ভিতরে রয়েছেন।'

তখনো, দক্ষিণেশ্বরে সেই শেষ মাসের অবস্থানকালেও গায়কদের আনা হয় তাঁর জন্যে। এত বছর যাবৎ তাঁর প্রায় নিত্য-সঙ্গী সঙ্গীত। অন্তত শ্রোতারূপেও তার সান্নিধ্য লাভ করে ঠাকুরের আনন্দ। নিতান্ত সঙ্গীতবিহীন থাকা তাঁর পক্ষে কষ্টকর। তাই সেদিন 'কীর্তনের জন্য গোস্বামীকে আনা হইয়াছে। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কীর্তন কি হবে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ, কীর্তন হইলে মত্ততা আসিবে ; এই ভয় সকলে করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'হোক একটু। আমার নাকি ভাব হয়, তাই ভয় হয়। ভাব হলে গলার ঐখানটা গিয়ে লাগে।'

কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাব সংবরণ করিতে পারিলেন না ; দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার রাখাল সমস্ত দেখিলেন ;...তিনি ও মাস্টার গাত্রোত্থান করিলেন, কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে উভয়ে প্রণাম করিলেন।

(শরীরের এই অবস্থার মধ্যেও ঠাকুরের মনে পড়ে প্রিয় শিষ্যের আহারের কথা। তাই তিনি শ্রীম-কে জিজ্ঞেস করেন—)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে মাস্টারের প্রতি)—তুমি কি খেয়েছ ?...(ঐ, পৃঃ ১৫১-১৫২, প্রথম ভাগ)।

শ্রোতারূপে তিনি কত আগ্রহী, বিভিন্ন গানের সঙ্গে তাঁর যে কি একাত্মতা, প্রিয় গানগুলি অপরের কণ্ঠে শুনতেও যে তিনি কত উৎসুক তা জেনে গায়করা প্রেরণা পান তাঁকে গান শোনাতে। শ্রোতা গানের সঙ্গে যত অন্তরঙ্গতা দেখান, গায়ন-

শিল্পী ততই আপনার অনুষ্ঠানকে সার্থক জ্ঞানে তৃপ্তি পান। কোনো গায়ককে বিশেষ বিশেষ গানের অনুরোধ বা ফরমায়েসে আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সাঙ্গীতিক পরিবেশ। নরেন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কেদার, রামলাল প্রভৃতি অনেককেই শ্রীরামকৃষ্ণ ফরমায়েস করে গান শুনেছেন। কখনো তাঁদের গাওয়া গান ভালো লেগেছে বলে, গাইতে বলেছেন পুনরায়। কখনো নিজের কোনো প্রিয় গান তাঁদের কণ্ঠে শুনতে চেয়েছেন। নীলকণ্ঠ, নরেন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ কিংবা অন্য কোনো গুণীকে বিশেষ বিশেষ গান শোনাতে অনুনয় বিনয়ও করেছেন নিরহঙ্কার স্বভাবে। এত সব নির্দিষ্ট গীত শোনবার জন্যে তাঁর অনুরোধ থেকে বোঝা যায়, বিস্তর গান তিনি নিজেই জানতেন। অন্য দিনে সেই গানগুলির গায়করূপে দেখা গেছে তাঁকে।

সঙ্গীতের আসরে ফরমায়েস বা অনুরোধের স্থান যেমন মনোজ্ঞ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো বিশিষ্ট গান গাইতে অনুরুদ্ধ হলে, গায়ক সম্মানিত, পুরস্কৃত বোধ করেন। এটি তাঁর সঙ্গীত-কৃতির স্বীকৃতিও। আবার অনুরোধকারীও গণ্য হন বোদ্ধা-রূপে। অন্য শ্রোতাদের নিরিখে ফরমায়েসকারীকে গায়কের সঙ্গে অধিকতর সহযোগী ও গানের সঙ্গে সমধিক ঘনিষ্ঠ বোধহয়। গায়ন-শিল্পী এবং এই অন্তরঙ্গ শ্রোতার পারস্পরিক সহযোগিতায় আরো স্ফূর্তিলাভ করে সঙ্গীতানুষ্ঠান।

যতদিন শ্রীরামকৃষ্ণের গান শোনবার বিবরণ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে নানা দিনেই তিনি বিশেষ বিশেষ গানের ফরমায়েস করেছেন। আগে তার কিছু কিছু উল্লিখিত হয়েছে প্রাসঙ্গিকভাবে। এখানে আরো কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়। এগুলির সন তারিখ নির্দিষ্ট করা হলো না অপ্রয়োজন বোধে।

ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রকে বললেন, 'চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে' এই গানটি একবার গা না।'

নরেন্দ্র গাইতে আরম্ভ করলেন। অন্য ভক্তরা বাজাতে লাগলেন খোল করতাল। প্রেমদাস ভণিতায় রচিত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের এই সপ্তদশ পঙ্‌ক্তির দীর্ঘ কীর্তনটি নরেন্দ্র গাইতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গীত-কণ্ঠও ভাবাবেগে যুক্ত হলো তাঁর সঙ্গে। শুধু তাই নয়, কীর্তনের সঙ্গে ঠাকুর নৃত্য করতে লাগলেন।...

একদিন গিরিশচন্দ্র বাড়িতে উৎসব করছেন ঠাকুরকে নিয়ে। অনেক ভক্তদের তিনি নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। আর কীর্তনীয়ার দলও এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে কীর্তন শোনাতে।

গান আরম্ভ করবার আগে তাঁরা ঠাকুরের অনুমতি চাইলেন। তখন রামদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বলুন এঁরা কি গাইবেন?'

কি বিষয়ে ঠাকুরের কীর্তন শোনবার ইচ্ছা তা জানতে আগ্রহী কীর্তনীয়ারা। এমন

শ্রোতাকে তাঁর প্রিয় ভাবের গান শুনিয়ে তৃপ্ত করতে তাঁরা আগ্রহী। শ্রীরামকৃষ্ণ যে পদাবলী কীর্তনের বিভিন্ন বিষয় বা পালা সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞাত ছিলেন, তা তাঁকে রামচন্দ্রের প্রশ্ন থেকে ধারণা করা যায়। রাম দত্ত নানা দিনে আপন আবাসে, বলরাম ভবনে, দক্ষিণেশ্বরে ও অন্যান্য ভক্তদের গৃহে পরিচয় পেয়েছেন—ঠাকুর স্বয়ং কি অভিজ্ঞ কীর্তন-গায়ক এবং কত বিভিন্ন বিষয়ের কীর্তন তিনি শুনিয়েছেন ভক্তদের। এখন রাম দত্ত ও কীর্তনীয়াদের অনুরোধ ঠাকুর রাখলেন, বিষয়বস্তু নির্বাচন করে দিয়ে।

'শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি বলবো ? (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, অনুরাগ।'

কীর্তনীয়ারা পূর্বরাগ গাইতে লাগলেন।...

একদিন শ্যামপুকুর বাড়িতে, অর্থাৎ সেই রোগ-জর্জর শরীরে, কণ্ঠ যখন প্রায় রুদ্ধবাক, ঠাকুর শ্রীম. ও একটি ভক্তকে বললেন, রামপ্রসাদের গান শোনাতে। তাঁরা পর পর চারখানি রামপ্রসাদী গাইলেন। (১) মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে। (২) কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন। (৩) মন রে কৃষি কায জান না। (৪) আয় মন বেড়াতে যাবি।

তারপর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রকে বললেন, 'তোমার ঐ গানটি বেশ—বীণের গান—বুদ্ধ চরিতের।'

শুনে, শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে গিরিশচন্দ্রকে গাইতে বললেন। গিরিশ ও কালীপদ একযোগে গাইতে লাগলেন—পর পর পাঁচখানি গান তাঁরা সম্পূর্ণ শোনালেন, ঠাকুরের ইচ্ছায়—

(১) আমার এই সাধের বীণে যত্নে গাঁথা তারের হার...

(২) জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই,...

(৩) আমায় ধর নিতাই। আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন...

(৪) প্রাণ ভরে আয় হরি হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই...

(৫) কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়...

সেই অবস্থায়ও শ্রোতারূপে এমন সচেতন, সপ্রতিভ তিনি।

আরেক দিনের কথা। তখন অবশ্য তাঁর সুস্থ দেহ। কিন্তু নরেন্দ্রের অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁকে গান গাওয়ালেন।

সেদিন বলরামের বাড়িতে তিনি ভক্তদের সঙ্গে রয়েছেন। দোতলায়, বৈঠকখানার উত্তর পূর্ব ঘরটিতে। নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, শ্রীম. ও আরো কয়েকজন উপস্থিত। কদিন আগে কেশবচন্দ্রের নব বৃন্দাবন নাটক অভিনয় দেখেছিলেন তাঁর বাড়িতে। সে বিষয়ে কিছু কথা হলো।

'নরেন্দ্রের শরীর তত সুস্থ নয়, কিন্তু তাঁহার গান শুনিতে ঠাকুরের বড় ইচ্ছা। তিনি

বলিতেছেন—'নরেন্দ্র, এরা বলছে একটু গা না।'
নরেন্দ্র তানপুরা লইয়া গাইতেছেন—'

(১) আমার প্রাণ পিঞ্জরের পাখি, গাও না রে।
ব্রহ্ম কল্পতরু পরে বসে রে পাখি, বিভুগুণ গাও দেখি…

(২) বিশ্বভুবনরঞ্জন ব্রহ্ম পরম জ্যোতি।
অনাদিদেব জগৎপতি প্রাণের প্রাণ॥

(৩) ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও,…

(৪) গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে…

(৫) চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে…

এই পাঁচটি গান নরেন্দ্র শোনালেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়। ভবনাথও গায়ক। তাই এবার তাঁকে তিনি গান করতে বললেন।

'নরেন্দ্রের গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ভবনাথকে গান গাহিতে বলিতেছেন। ভবনাথ গাহিতেছেন—

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী।
সুখে দুঃখে সম, বন্ধু এমন কে, পাপ-তাপ ভয়হারী।…

(ঐ, পৃঃ ১৩-১৪, চতুর্থ ভাগ)

জ্ঞাত সুকণ্ঠ গায়কদের কেবল নয়। কোনো অপরিচিত ব্যক্তি গায়নক্ষম জানলেও শ্রীরামকৃষ্ণ গান শোনাতে বলেন তাঁকে। এতই তাঁর সঙ্গীত প্রীতি যে কোনো গায়ক উপস্থিত থাকলেই তিনি তাঁর গান শুনতে আগ্রহী। গায়কের সঙ্গে ঠাকুরের অন্তরের সাযুজ্য। অপরিচয়ের কোনো বাধা সেক্ষেত্রে মানেন না তিনি।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরদাদা নামে এক ব্যক্তি তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর দু একজন বন্ধু।

সাধন সম্পর্কে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু বললেন।

তারপর 'ঠাকুরদাদা'র বন্ধু জানালেন—ইনি বেশ গান গাইতে পারেন।

ঠাকুর অমনি বললেন, 'একটা গান গাওনা গো।'

ঠাকুরদাদা গাইতে লাগলেন—

প্রেম গিরি কন্দরে যোগী হয়ে রহিব।
আনন্দ নির্ঝর পাশে যোগ-ধ্যানে থাকিব॥…
কভু ভাব শৃঙ্গ পরে পদামৃত পান করে,
হাসিব কাঁদিব (আবার) নাচিব গাইব॥

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা, বেশ গান! আনন্দ নির্ঝর। তত্ত্বফল। হাসিব কাঁদিব নাচিব

গাইব।

তারপর গায়ককে শুভ কামনা জানালেন—'তোমার ভিতর থেকে এমন গান ভালো লাগছে—আবার কি!'

এমনি অকুণ্ঠ প্রশংসা তাঁর শ্রোতারূপে, খ্যাত অখ্যাত নির্বিশেষে।

আরেকদিন শ্রীরামকৃষ্ণ অধরলালের বৈঠকখানায় বসে আছেন। অনেক ভক্তদের মধ্যে রয়েছেন নরেন্দ্রনাথ। তাছাড়া, ঠাকুরকে গান শোনাবার জন্যে অধরলাল কীর্তনীয়া বৈষ্ণবচরণকেও আনিয়েছেন। সুতরাং কিছু প্রসঙ্গের পর আরম্ভ হলো গানের পালা।

প্রথমে নরেন্দ্র আরম্ভ করলেন। গাইলেন—'সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে' ও 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।'

দ্বিতীয় গানটি শুনেই শ্রীরামকৃষ্ণের মনে পড়ল। এটি নরেন্দ্র গেয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন।

ঠাকুর তাই সহাস্যে হাজরাকে বললেন, 'প্রথম এই গান করে।'

তারপর নরেন্দ্রের আরো গান হলো। এবার বৈষ্ণবচরণ ধরলেন—

চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি),
ওহে বঙ্কু রায় ভুলে আছ মথুরায়…

গানখানি শুনে তিনি ফরমায়েস করলেন, 'হরি হরি বল রে বীণে' ঐটে একবার হোক না।'

বৈষ্ণবচরণ সেটি গাইলেন। শুনতে শুনতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে বলতে লাগলেন—'আহা, আহা'। তারপর সমাধিস্থ হলেন।

গানখানি শেষ করে বৈষ্ণবচরণ আরম্ভ করলেন নতুন গান—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব নটবর…।

ঠাকুর সমাধিভঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন গানের সঙ্গে। তারপর আখর দিতে লাগলেন।

বৈষ্ণবচরণের আরো দুখানি গান হলো। তার সঙ্গেও মাঝে মাঝে আখর দিলেন ঠাকুর। ভাবাবেগে নৃত্য করতে লাগলেন।

তারপর আসন নিলেন ভাবাবেশের মধ্যেই। সেই অবস্থায় আবার নরেন্দ্রকে ফরমায়েস করলেন—'সেই গানটি—আমায় দে মা পাগল করে।'

নরেন্দ্র গানখানি শোনালেন।

তখন ঠাকুর বললেন, 'আর ঐটি—চিদানন্দ সিন্ধুনীরে।'

নরেন্দ্র গাইলেন গানটি।

আবার শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আর চিদাকাশে?—না, ওটা বড় লম্বা, না? আচ্ছা, একটু আস্তে আস্তে!'

নরেন্দ্র এটিও গাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় ফরমায়েস করলেন, 'আর ঐটে—হরি রস মদিরা?'

নরেন্দ্র এ গানখানিও শোনালেন।

তারপর আবার নরেন্দ্রের অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ গাইলেন—ভুবনরঞ্জন রূপ নদে গৌর কে আনিল রে (অলকা আবৃত মুখ ...

এ গানটি শেষ করে আরেকটি দীর্ঘ কীর্তন গাইতে লাগলেন—

শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই···

এমনিভাবে সেদিন সঙ্গীতের মহোৎসব চলে অধরলালের বৈঠকখানায়। শ্রীরাম-কৃষ্ণ নিজে দুখানি কীর্তন গাইলেন। আবার আখর দিলেন নরেন্দ্র ও বৈষ্ণবচরণের গানের সঙ্গে। আর ফরমায়েস করে নরেন্দ্র ও বৈষ্ণবচরণকে পাঁচখানি বিশেষ গান গাওয়ালেন।···

তাঁর শ্যামপুকুরে অন্য একদিনের কথা। তখন ঘরে কয়েকজন ভক্ত আছেন তাঁর কাছে। তাঁদের সঙ্গে তিনি নানা কথা বলছেন। এমন সময় এলেন মিশ্র নামে একজন খৃষ্টান ভক্ত। তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতে করতে ভাবাবিষ্ট হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ডাক্তার মহেন্দ্রলালও সেখানে উপস্থিত। শরীরের এমন বিষম যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায়ও শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ বিশেষ গান শুনতে চাইলেন।

'এত অসুখের উপর ঠাকুরের ভাবাবেশ হইতেছে দেখিয়া ভক্তেরা চিন্তিত হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,—'ঐ গানটি হলে আমি থামবো,—হরিরস মদিরা।'

নরেন্দ্র কক্ষান্তরে ছিলেন, তাঁকে ডাকান হইল। তিনি তাঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠে গান শুনাইতেছেন—

হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে···

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর সেইটি? 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে?'

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী···

তারপর আরো একখানি শোনালেন—

চিন্তয় মন মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন···'

এমনিভাবে তাঁর দুবার ফরমায়েসে নরেন্দ্রনাথের বেশ কিছুক্ষণ গান হলো। তারপর সেদিনের বৈঠক মধুরে সমাপন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে গানে নয়। সরস রসিকতায়, গল্পাকারে সুনিপুণ উপমার প্রয়োগে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল নিজেই প্রকাশ

করতেন যে তিনি ভাবপ্রবণ ব্যক্তি নন। 'ভাব টাব' তাঁর ভালো লাগে না। এখন শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় নরেন্দ্রের 'চিদানন্দ' গানখানি অতি ভালো লাগে তাঁর। সেকথা তিনি জানাবামাত্র তাৎক্ষণিক কৌতুকে শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে মাতিয়ে দিলেন, ভাবের সমর্থনে।

নরেন্দ্রের গান 'ডাক্তার একমনে শুনিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন, 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে, ঐটি বেশ।'

ডাক্তারের আনন্দ দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—'ছেলে বলেছিল, 'বাবা একটু (মদ) চেখে দেখ, তারপর আমায় ছাড়তে বল ত ছাড়া যাবে।' বাবা খেয়ে বল্লে; 'তুমি বাছা ছাড় আপত্তি নাই, কিন্তু আমি ছাড়ছি না।'...(ডাক্তার ও সকলের হাস্য)। (ঐ, পৃঃ ২৭৯, চতুর্থ ভাগ)।

আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে সেদিন এসেছেন শ্রীম., বলরামের পিতা, বেণী পাল, মণি মল্লিক প্রভৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের ভক্তি ও সিদ্ধির বিষয়ে বোঝাচ্ছিলেন, নিজের উদাহরণ দিয়ে।

'...মার কাছে আমি কেবল শুদ্ধা ভক্তি চেয়েছিলাম ; সিদ্ধাই চাই নাই'—একথা বলতে বলতে তিনি সমাধিস্থ হলেন।

সমাধি ভঙ্গের পর গাইতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—

হলাম যার জন্য পাগল তারে কৈ পেলাম সই...

গানটি গেয়ে, এবার রামলালকে গান আরম্ভ করতে বললেন।

রামলাল প্রথমে গাইলেন—গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস—

কি দেখিলাম রে কেশব ভারতীর কুটীরে...

শ্রীচৈতন্যের এই প্রেমোন্মাদ বর্ণনার গান শুনে, ঠাকুর এবার ইঙ্গিতে ফরমায়েস করলেন—গোপীদের উন্মাদ অবস্থার গান গাইতে।

রামলাল গাইতে লাগলেন—

ধোরো না ধোরো না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে।
যে চক্রের চক্রী হরি যাঁর চক্রে জগৎ চলে।...

তারপর ধরলেন—নব নীরদ বর্ণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে,
করেতে বাঁশি অধরে হাসি রূপে ভুবন আলো করে...

(ঐ, পৃঃ ৮৮-পঞ্চম ভাগ)

কখনো কখনো তাঁকে দেখা গেছে, শোনা গানের অংশীভূত হয়ে পুনরায় ফরমায়েস করতে। কখনো বা গীতের কোনো বাক্য ব্যাখ্যা করেন। গানের বাণী তিনি কি নিবিড়ভাবে আস্বাদ করতেন, তারই এক নিদর্শন। সেদিন 'বৃষকেতু' নাটক অভিনয় দেখে

তখন তিনি মঞ্চের বিশ্রাম ঘরে রয়েছেন। সঙ্গে গিরিশ, নরেন্দ্র, শ্রীম. প্রমুখ। সেখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাইতে বললেন নরেন্দ্রকে।

তাঁর গান হতে লাগল—

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দ লহরী…

এই গানের মধ্যে নরেন্দ্র যখন গাইছেন—

'মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল দেশকাল', তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'এটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়।'

তারপর যখন নরেন্দ্র গাইলেন, 'আনন্দে মাতিয়া দু বাহু তুলিয়া বল রে মন হরি হরি', তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ঐটি দুবার করে বল্।'

(ঐ পৃঃ ১৪৬, পঞ্চম ভাগ)

এমনিভাবে ফরমায়েস করে তাঁর গান শোনার কথা নানাদিনের বিবরণে পাওয়া গেছে। আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

কি গভীর সংবেদনশীল, ভাবুক চিত্ত তাঁর। শ্রোতারূপে কি একান্ত তন্ময়তা। গানের ভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে অশ্রুপাত করেছেন কতদিন। সঙ্গীতের বাণী তাঁর অনুভবের সঙ্গে মিলে গেছে।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে রামলাল গান গাইছেন তাঁর কথায়। তার মধ্যে একটি গানের এক স্থানে আছে—

পাষাণী হয় মানবী, সেই রামের চরণে…

রাম নামের ভাবমাহাত্ম্যে বিহ্বল হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

'গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন, আর বলিতেছেন—(একদিন) 'আমি ঝাউতলায়…শুনেছিলাম, নৌকোর মাঝি নৌকোতে ঐ গান গাচ্ছে,… যতক্ষণ বসেছিলাম খালি কেঁদেছি, আমাকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে এল।'

(ঐ, পৃঃ ৪৬ ৪৭, পঞ্চম ভাগ)

একদিন কাশীপুর বাগানবাড়িতে নরেন্দ্র তাঁকে গান শোনাচ্ছেন। তাঁর দেহত্যাগের মাত্র মাস পাঁচেক আগেকার কথা।

নরেন্দ্র তখন গাইছিলেন—

কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান…

'গান শুনিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা মুগ্ধ হইয়াছেন। ঠাকুর ও রাখালের নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতেছে।…'

(ঐ, পৃঃ ২৫৪, তৃতীয় ভাগ)

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে গান গাইছেন ত্রৈলোক্য সান্যাল—

তোর কোলে লুকায়ে থাকি (মা)।

চেয়ে চেয়ে মুখপানে মা মা মা বলে ডাকি ॥

ডুবে চিদানন্দ রসে, মহাযোগে নিদ্রাবশে,

দেখি রূপ অনিমেষে নয়নে নয়নে রাখি ॥

ঠাকুর শুনিতে শুনিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতেছেন। আর বলিতেছেন, আহা, কি ভাব!

ত্রৈলোক্য আবার গাইছেন—

লজ্জা নিবারণ হরি আমার…

প্রেমদাস ভণিতায় ত্রৈলোক্যনাথের স্বরচিত এই সুদীর্ঘ (ষোল পঙ্‌ক্তির) গানখানি শুনে 'ঠাকুর আবার প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে মেজেতে আসিয়া বসিলেন। আর রামপ্রসাদের ভাবে গাহিতেছেন—

যশ অপযশ কুরস সুরস সকল রস তোমারি।

(ওমা) রসে থেকে রসভঙ্গ কেন রসেশ্বরী ॥…

(ঐ, পৃঃ ৬৩-৬৬, তৃতীয় ভাগ)

আবার কখনো শ্রীরামকৃষ্ণ পরমানন্দ ভোগ করেন গান শুনে। গায়ককে আন্তরিক প্রশংসা জানান।

একদিন নরেন্দ্র কীর্তনে মেতে উঠলেন দক্ষিণেশ্বরে। পর পর গাইতে লাগলেন—'চিন্ময় নম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন', 'সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদয় মন্দিরে,' 'আনন্দ বদনে বল মধুর ব্রহ্ম নাম'—এই সব গান। তাঁর সঙ্গে পরে অন্যান্য ভক্তরাও যোগ দিলেন। তাঁরা খোল করতাল নিয়ে কীর্তন গাইতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে।

'অবশেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধরিয়াছেন ও মত্ত হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে গাহিতেছেন—'আনন্দ বদনে বল মধুর হরি নাম।'

কীর্তনান্তে নরেন্দ্রকে ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া বার বার আলিঙ্গন করিলেন। বলিতেছেন, 'তুমি আজ আমায় যে আনন্দ দিলে।'

সেই কীর্তনানন্দের ভাবে বহুক্ষণ রইলেন সেদিন। গান শেষ হবার অনেক পরেও, রাত পর্যন্ত। উপস্থিত দর্শক শ্রীম. তারও বর্ণনা দিয়েছেন।

'আজ ঠাকুরের হৃদয় মধ্যে প্রেমের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। রাত প্রায় আটটা। তথাপি প্রেমোন্মত্ত হইয়া বারান্দায় বিচরণ করিতেছেন। উত্তরের লম্বা বারান্দায় আসিয়াছেন ও দ্রুতপদে একবার এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্যন্ত পাদচারণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন।'…(ঐ, পৃঃ ৪-৫, দ্বিতীয় ভাগ)

এমনিভাবে সেদিন শ্রোতা শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ময় থাকেন গানের ভাবে।…

প্রিয় গায়ককে তিনি প্রশংসা জানান অকুণ্ঠ চিত্তে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ত্রৈলোক্য সান্যালকে সুখ্যাতি করলেন, 'আহা, তোমার কি গান।' ত্রৈলোক্য তানপুরা লইয়া গান করিতেছেন—

'তুঝ্‌সে হাম্‌নে দিল্‌কো লাগায়া, যো কুচ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়…'

তারপর গাইলেন—

তুমি সর্বস্ব আমার (হে নাথ !) প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার॥

গান শুনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন। আর বলিতেছেন, 'আহা, তুমিই সব। আহা। আহা।' (ঐ, পৃঃ ১৯৪, তৃতীয় ভাগ)

আর একদিনও ত্রৈলোক্যকে অপূর্ব সুখ্যাতি করেছিলেন তাঁর গান শুনে—'আহা তোমার কি গান! তোমার গান ঠিক ঠিক। যে সমুদ্রে গিয়েছিল সেই সমুদ্রের জল এনে দেখায়।'

কখনো গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ তার বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

এমনি কয়েকটি বিবরণ উদ্ধৃত করবার যোগ্য।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে এক গায়ক এসেছেন বেলঘর থেকে। ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'তুমি কিছু গান কর।'

গায়ক তিনখানি গান শোনালেন পর পর—

(১) দোষ কারু নয় গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা…

(২) ছু সনে রে শমন আমার জাত গিয়েছে…

(৩) জাগ জাগ জননী,
মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হলো কুল কুণ্ডলিনী।
স্বকার্য সাধনে চল মা শির মধ্যে,
পরম শিবে যথা সহস্র দল পদ্মে,
করি ষড়চক্র ভেদ ঘুচাও মনের খেদ, চৈতন্যরূপিণী।

'শ্রীরামকৃষ্ণ—এই গানে ষড়চক্র ভেদের কথা আছে। ঈশ্বর বাহিরে আছেন, অন্তরেও আছেন। তিনি ভিতর থেকে মনের নানা অবস্থা করছেন। ষড়চক্র ভেদ হলে মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। এরই নাম ঈশ্বর দর্শন। মায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না।…' (ঐ পৃঃ ৫০-৫১ পঞ্চম ভাগ)।

সেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরের ঘরে আছেন। নানা ভগবৎপ্রসঙ্গে উপদেশ দিচ্ছেন মণি-

লাল মল্লিক ও আরো কজন ভক্তকে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা, আন্তরিক ভক্তি ও দেখানো ভক্তি, সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা, চৈতন্যের লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে বলছেন। নিজে গানও গাইছেন তার মধ্যে। যেমন—'দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা...' আর 'একি বিকার শঙ্করী, কৃপা-চরণতরী পেলে ধন্বন্তরী।...' আবার ঈশ্বর প্রসঙ্গ করছেন।

খানিকক্ষণ পরে—'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতে বলিলেন। রামলাল ও কালীবাড়ির একটি ব্রাহ্মণ কর্মচারী গাহিতেছেন। সঙ্গতের মধ্যে একটি বাঁয়ার ঠেকা—

(১) হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি...

(২) নবনীরদবর্ণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে...

(৩) শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়িতেছিল...

তাঁরা গান তিনটি গাইবার পর ঠাকুর প্রসঙ্গ করতে লাগলেন। প্রথমে বললেন বদ্ধ জীবের কথা। যারা কেবল কামিনী কাঞ্চন নিয়ে থাকে, ঈশ্বরের কথা একবারও ভাবে না। তারপর মুক্ত জীব। তারা কামিনী কাঞ্চনের বশ নয়। সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধের ব্যাখ্যাও করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এবার বলছেন অনুরাগের কথা। গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ।

'আবার গান হইতে লাগিল। রামলাল গাহিতেছেন--

নাথ! তুমি সর্বস্ব আমার। প্রাণাধার সারাৎসার...

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আহা কি গান! 'তুমি সর্বস্ব আমার।'...এই ভালবাসা। ভগবানের জন্য এই ব্যাকুলতা।'

আবার গান চলিতে লাগিল।' (ঐ, পৃঃ ৩৩-৩৪, দ্বিতীয় ভাগ)।

এমনিভাবে তিনি ঈশ্বরীয় কথা বলতে লাগলেন গানের অনুষঙ্গে। গীতের সঙ্গে তার বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা।...

নিবিষ্ট শ্রোতারূপে তাঁকে এই ভূমিকায়ও নানা উপলক্ষে দেখা গেছে। গান তন্ময় হয়ে শুনেই শুধু তৃপ্ত নন তিনি। তার তত্ত্ব ও বিষয়বস্তু প্রাঞ্জলভাবে ভক্তদের বুঝিয়ে দেন। ঈশ্বর প্রসঙ্গ করেন গানের বাণী অবলম্বনে।

আরেকদিন অধরলাল সেনের বাড়িতে তিনি ভক্তদের সঙ্গে রয়েছেন। এখানেও গান শোনাচ্ছেন রামলাল।

অন্যান্য গানের পর তিনি যখন গাইছেন—

'তদূর্ধেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল,
ধূম্রবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল,
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজ আকাশ,

সে আকাশ্ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।

'তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলিতেছেন—'

'এই শুন, এরই নাম নিরাকার সচ্চিদানন্দ দর্শন। বিশুদ্ধচক্র ভেদ হলে সকলি আকাশ।'

মাস্টার—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই মায়া জীব জগৎ পার হয়ে গেলে তবে নিত্যেতে পৌঁছান যায়। নাদ ভেদ হলে তবে সমাধি হয়। ওঁক'র নাদ করতে করতে নাদ ভেদ হয় আর সমাধি হয়।' (ঐ, পৃঃ ৩৭-৩৮, তৃতীয় ভাগ)।

কা'বপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ। বাণীর মর্মজ্ঞ। গানে তত্ত্ব বা তাৎপর্য যেমন ব্যাখ্যা করে দেন, তেমনি গুণবিচার করেন তার ভাব ও কবিত্ব শক্তির। তখন রীতিমত বোদ্ধা সমালোচিত তাঁর প্রশংসা ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

একদিন বলরাম বসুর বাড়িতে—

'ঠাকুর গান শুনিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বলরামের বৈঠকখানায় এক ঘর লোক। সকলেই তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন—কি বলেন, শুনিবেন, কি করেন দেখিবেন। শ্রীযুক্ত তারাপদ গাহিতেছেন—

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী…

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি —আহা, বেশ গানটি। তুমিই কি সব গান বেঁধেছ? একজন ভক্ত (তিনিই শ্রীম.—বর্তমান লেখক)—হাঁ, উনিই চৈতন্য লীলার সব গান বেঁধেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—এ গানটি খুব উৎরেছে।'

(ঐ, পৃঃ ১৯৩, প্রথম ভাগ)।

আটপৌরে ভাষায় গীত-রচয়িতাকে এ তাঁর প্রভূত সুখ্যাতি, স্বীকৃতি।

গানের গুণাগুণ বিচারে সমদর্শী তিনি। প্রশংসায় তিনি মুক্তকণ্ঠ হন। তার বিপরীত ভাবও প্রকাশ করেন। গান যদি সার্থক না হয়, তার নিরপেক্ষ সমালোচনা করেন স্পষ্ট ভাষায়। গায়ক তাঁর অতি প্রিয় হলেও প্রিয় অসত্য বলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। গানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিখ্যাত গায়ক রামতারণ সান্যালের প্রতি মন্তব্যে তা আগে দেখা গেছে। এখানে আরেকদিনের কথা।

সেদিন ঠন্‌ঠনিয়ায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বাড়িতে তিনি এসেছেন। নরেন্দ্র, রাখাল, রাম দত্ত, শ্রীম., হাজরা, প্রমুখ অনেক ভক্ত সেখানে উপস্থিত। নানা অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে ঠাকুর অতি মূল্যবান উপদেশ দিচ্ছেন সকলকে। কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞান-যোগ। ব্রহ্মজ্ঞান। তিন প্রকার আচার্য। ঈশ্বরের আদেশ ও লোকশিক্ষা। উপদেশ দেবার যোগ্য পাত্র প্রভৃতি বিষয়।

তারপর নরেন্দ্রের সেদিনকার গানের কথা উঠল। এই এক ঘর লোকের সামনে ঠাকুর তাঁকেই বললেন—

'শ্রীরামকৃষ্ণ—তোর গান শুনছিলুম—কিন্তু ভালো লাগল না। তাই উঠে গেলুম। বললুম, উমেদারী অবস্থা—গান আলুনি বোধ হলো।'

(ঐ, পৃঃ ১৪৪, প্রথম ভাগ)।

'নরেন্দ্র লজ্জিত হইলেন, মুখ ঈষৎ আরক্তিম হইল। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।'... এমন মার্জিত-কণ্ঠ, শিক্ষিতপটু গায়ক নরেন্দ্র। কতদিন তাঁর কত গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু—রাগ রসুই আর পাগড়ি, কভি কভি বন্ যায়। অর্থাৎ (রাগ) গান, রান্না আর পাগড়ি সব দিন ঠিক ওৎরায় না। নরেন্দ্রের সেদিন গানও ভালো হয় নি কোনো কারণে। হয়ত উপযুক্ত মানস ছিল না। কিন্তু সঙ্গীত যেহেতু 'আলুনী বোধ হলো' অর্থাৎ রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি, শ্রীরামকৃষ্ণ কঠিন সমালোচনা করলেন একেবারে 'উমেদারী অবস্থা' বলে।

নরেন্দ্রের গান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ওই একবারই তিনি করেছিলেন।

পরন্তু নানা দিনে তাঁর সুখ্যাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে আগেই। এখানে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। সেদিন ঠাকুরের জন্মোৎসবে (১৮৮৫) নরেন্দ্রের গান-গুলি শুনে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন তিনি। সেই অবস্থায়ই বলেছিলেন, 'আগুন জ্বেলে দিলে; সে ত বেশ!'...তার অনেকক্ষণ পরের কথা। নরেন্দ্র ও অন্য ভক্তরা প্রায় সকলে চলে গেছেন। সন্ধ্যার আরতিও হয়ে গেল কালী মন্দিরে। তখনো 'ঠাকুর আবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ পূবের লম্বা বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। মাস্টারও সেই-খানে দণ্ডায়মান আছেন ও ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাস্টারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'আহা নরেন্দ্রের কি গান।'

মাস্টার—আজ্ঞা, 'নিবিড় আঁধারে' ওই গানটি?

শ্রীরামকৃষ্ণের—হাঁ, ও গানের খুব গভীর মানে। আমার মনটা এখনও যেন টেনে রেখেছে।'...

(ঐ, পৃঃ ১৩৬, পঞ্চম ভাগ)।

সেদিন দুপুরেই কোন্নগরের ভক্তরা যে কীর্তন গেয়েছিলেন, তা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি, রসহীন বলে। সে প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য শোনা গেছে 'ওদের যেন ডোঙ্গা ঠেলা গান। এমন গান হবে যে সকলে নাচবে।'...

আবার একদিন কোন্নগরেরই এক গায়কের গানে তৃপ্ত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অথচ শিল্পী রাগ-সঙ্গীত গেয়েছিলেন। রীতিমত আলাপচারী শুনিয়েছিলেন গানের আগে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রশংসা করেন। কারণ ঠাকুর শুদ্ধ সঙ্গীতেরও অনুরাগী, রসিক শ্রোতা। যার পরিচয় পাওয়া গেছে তাঁর বারাণসীতে মহেশচন্দ্র সরকারের তিন

ঘণ্টা ব্যাপী বীণা-বাদন শোনা থেকে। সানাই বাদন শুনে তাঁর মুগ্ধ হবার কথাও উল্লেখনীয়। এখন সেই কোন্নগরের গায়ককে তিনি একটি ভক্তিগীতি গাইবার জন্যেও অনুরোধ জানান। এই ঘটনারও প্রতিবেদন পাওয়া যায় 'কথামৃত'-তে—

'ঠাকুর 'কোন্নগরের গায়কের কালোয়াতি গান ও রাগিণী আলাপ শুনিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন।'

বিনীতভাবে গায়ককে বলিতেছেন, 'বাপু, একটি আনন্দময়ীর নাম!'

গায়ক—মহাশয়। মাপ করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গায়ককে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতে করিতে)—'না বাপু। একটি, জোর করতে পারি।'

এই বলিয়া গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় বৃন্দার উক্তি কীর্তন গান গাইয়া বলিতে-ছেন—

রাই বলিলে বলিতে পারে! (কৃষ্ণের জন্যে জেগে আছে!)
(সারা রাত জেগে আছে!) (মান করিলে করিতে পারে!)

'বাপু! তুমি ব্রহ্মময়ীর ছেলে! তিনি ঘটে ঘটে আছেন। অবশ্য বলবো। চাষা গুরুকে বলেছিল—মেরে মন্ত্র লবো।'

গায়ক (সহাস্যে)—জুতো মেরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীগুরুদেবকে উদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে সহাস্যে)—অত দূর নয়।

আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—'প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ, তুমি কি সিদ্ধ, না সিদ্ধের সিদ্ধ?—আচ্ছা, গান কর।'

গায়ক রাগিণী আলাপ করিয়া গান গাহিতেছেন—মন বারণ!*

রামকৃষ্ণ (আলাপ শুনিয়া)—বাবু! এতেও আনন্দ হয়, বাবু।'

গান সমাপ্ত হইল।'… (ঐ, পৃঃ ১৫১-১৫২, চতুর্থ ভাগ)

সমালোচক রূপে তাঁর আরো কিছু পরিচয় দশম অধ্যায়ে দেওয়া হবে। সঙ্গীত সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের বিবিধ মন্তব্য এবং মতামতেরও আলোচনা থাকবে সেই পরিচ্ছেদে। এখানে শ্রোতারূপে তাঁর আরো কটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলো। সাধারণ ভাবে গান এবং গায়কদের সম্বন্ধে ঠাকুরের সহৃদয়তা ও অন্তরঙ্গতার পরিচয় পাওয়া যাবে এই

---

*সম্ভবত গানখানি হবে—বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন/তাঁহারে কেন ডাক না। যদু ভট্ট রচিত ও ছায়ানট ঝাঁপতালে গঠিত। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন গানটি শোনবার এক বছর আগে (১৮৮৩) যদু ভট্ট পরলোকগত হয়েছিলেন।

যদু ভট্টের এই গান প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্য যোগ করা যায়। নরেন্দ্র 'বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন' গানটি একদিন গেয়েছিলেন বলরাম বসুর গৃহে (৯ মে, ১৮৮৫): বলরাম মন্দিরের দোতলায়, বৈঠকখানায়। সেদিন শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিবরণে। সঙ্গীতের দরদী শ্রোতারূপে শ্রীরামকৃষ্ণ।
গায়কদের তিনি কতখানি মর্যাদা দিতেন, গায়ন-শিল্পী বলে তাঁদের প্রতি তাঁর কি প্রীতি ও সহানুভূতি ছিল, তা সুন্দরভাবে একেকদিন প্রকাশ পেয়েছে। গায়ক যত অখ্যাত এবং সামান্য ব্যক্তিই হোন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সমাদরের পাত্র।
নিচের প্রসঙ্গটি তাঁর দেহত্যাগের আগের বছর। তখন তিনি রোগাক্রান্ত শরীরে শ্যামপুকুরের বাসাবাড়িতে আছেন। ১৮৮৫ সালের ২৭ অক্টোবর। সেদিনও দোতলার ঘরে বসে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে বলছেন ভক্তদের। তাঁর সামনে রয়েছেন শ্রীম., নরেন্দ্র প্রমুখ। তীব্র বৈরাগ্য কেমন, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু—এমনি বিষয় বোঝাচ্ছেন। 'তীব্র বৈরাগ্য হলে…'টাকা জমাবো', 'বিষয় ঠিকঠাক করবো', এসব হিসাব আসে না।'
কথনো সুনিপুণ উপমা যোগে, কথনো প্রাকৃত ভাষায় গল্পাংশ জুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বক্তব্য জানাচ্ছেন সপরিহাসে।
'একটা মাগীর ভারী শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে,—তারপর 'ওগো! আমার কি হলো গো।' বলে আছড়ে পড়লো। কিন্তু খুব সাবধান, নৎটা না ভেঙ্গে যায়!'
সকলে হাসছেন তাঁর কথা শুনে।
এমন সময় ওপর থেকে শোনা গেল, নীচে কোনো বৈষ্ণবের গান হচ্ছে। ঠাকুর শুনতে লাগলেন সেই গান। শুনে অত্যন্ত আনন্দ পেলেন। ভিক্ষার্থী বৈষ্ণবকে কিছু পয়সা দিতে বললেন গানের শেষে।
একজন ভক্ত পয়সা দেবার জন্যে নীচে গেলেন।
তারপর এ সম্বন্ধে ঠাকুর জানতে চাইলেন, 'কি দিলে?'
আরেক জন ভক্ত জানালেন, 'তিনি দু পয়সা দিয়েছেন।'
শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে অপ্রসন্ন হলেন। প্রখর বাস্তববাদীর নিরিখে দাতার চরিত্র বিশ্লেষণ করে বললেন, 'চাকরি করা টাকা কিনা।—অনেক কষ্টের টাকা—খোসামোদের টাকা। মনে করেছিলাম, চার আনা দেবে।' (ঐ, পৃঃ ২৭২-২৭৩, চতুর্থ ভাগ)।
সুপরিচিত ভক্তের উদ্দেশে এমন শ্লেষাত্মক বাক্য উচ্চারণ করলেন, অপরিচিত গায়কের প্রতি অন্তরের দাক্ষিণ্যে।…
আরেক দিনের কথা, নরেন্দ্র সম্পর্কে। তখন অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর নিবাসী। সেদিন ঠনঠনিয়ায় ভক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসেছেন। ঈশানচন্দ্র নিমন্ত্রণ করে এসেছেন তাঁকে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ভাগবতের এক পণ্ডিত সহ ভাটপাড়ার

দুয়েকজন ব্রাহ্মণ এবং গৃহকর্তার বন্ধু-বান্ধবও আছেন। আর নরেন্দ্র, শ্রীম.ও। তখন বেলা এগারটা। ঠাকুরের আগমন উপলক্ষ্যে গান বাজনারও আয়োজন করেছেন ঈশানচন্দ্র। পাখোয়াজ, তবলা, তানপুরা ইত্যাদি প্রস্তুত। নরেন্দ্র ভিন্ন অন্য গায়করাও উপস্থিত। গৃহকর্তার ইচ্ছা, নরেন্দ্র গান শোনান।

এদিকে সদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলছেন সকৌতুকে। ভাগবতের পণ্ডিত একটি চমৎকার রসিকতায় উদ্ভট শ্লোক বলে তার ব্যাখ্যা করলেন।

শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'ইনি রসিক।'

আসরে পাখোয়াজ বাঁধা ছাঁদা হয়ে গান আরম্ভ করেছেন নরেন্দ্র।

কিন্তু গান একটু হতে না হতে, ঠাকুর বিশ্রাম করতে ওপরের বৈঠকখানায় চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীম. এবং ঈশানচন্দ্রের পুত্র শ্রীশ। তাঁদের সঙ্গে তিনি নানা কথা বলতে লাগলেন, প্রধানত অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে।

খানিকক্ষণ পরে, তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল—নীচে গান গাইছেন গায়করা। আর তিনি চলে এলেন! অসৌজন্য হলো নাকি? গায়কদের সম্মান স্বীকৃতি সম্পর্কে অপরাধ বোধ জাগল যেন।

শ্রীম-কে তিনি বললেন, 'আমরা কি অন্যায় করলাম? ওরা গাচ্চে—নরেন্দ্র গাচ্চে—আর আমরা সব পালিয়ে এলাম।' (ঐ, পৃঃ ১৩৫-১৩৫, প্রথম ভাগ)

ভগবদ ভাবের বাহন-স্বরূপ তিনি জ্ঞান করতেন—গানের বাণীকে। বিশেষ বিশেষ গান সে জন্যে তাঁর অত প্রিয়। উপযুক্ত পাত্রে যেন সেই সব গানের ভাব গৃহীত, রক্ষিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য দিতেন। তার অন্যতম নিদর্শন রূপে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ-যোগ্য।

তাঁর শ্যামপুকুরে অবস্থান কালের কথা। সেদিন শ্রীম-র প্রতি তাঁর দুটি আদেশ ছিল। প্রথমটি অনুসারে মহেন্দ্রনাথ এনেছেন, সিদ্ধেশ্বরী কালীর প্রসাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তি ভরে প্রসাদ নিয়ে মাথায় স্পর্শ করলেন।

তাঁর দ্বিতীয় আদেশ ছিল, 'রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানের বই কিনে আনবে।' ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে দিতে হবে সেই গীতাবলী। তাঁর দুই প্রিয়তম শ্যামা-সঙ্গীত রচয়িতার গান। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ইচ্ছা।

শ্রীম. ঠাকুরকে বললেন, 'এই বই এনেছি। রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গানের বই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'এই গান সব (ডাক্তারের ভিতর) ঢুকিয়ে দেবে।'

(১) মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।

(২) কে জানে কালী কেমন। যড়দর্শনে না পায় দরশন।

(৩) মন রে কৃষি-কায জাননা।

(৪) আয় মন বেড়াতে যাবি।

'মাস্টার বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর ও গানটাও বেশ।—'এ সংসার ঠোকার টাটী। আর 'এ সংসার মজার কুটি। ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি।' (ঐ, পৃঃ ২৩৫, তৃতীয ভাগ)।

কত গান যে তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, কি লোকোত্তর স্মৃতিশক্তির অধিকারী যে তিনি সে সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাঁর স্মরণ শক্তির আর একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। এটি থেকে বোঝা যায়, শ্রোতারূপে কি অটট মনোযোগী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

তখন তিনি শ্যামপুকুর বাড়িতে আছেন। তাঁর কথায় একজন ভক্ত গান শোনাচ্ছেন তাঁকে।

'কে জানে কালী কেমন' গানখানি তখন গায়ক গাইছিলেন।

গানের শেষ পঙ্‌ক্তিটি তিনি গাইতে লাগলেন এইভাবে—'আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝেনা, ধরবে শশী হয়ে বামন।'

শুনতে শুনতেই ঠাকুর বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'উঁহু উল্টোপাল্টা হচ্ছে।' আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝেনা,' এই হবে।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩২১—স্বামী সারদানন্দ)।

গায়কের এই একটি সামান্য ভুলও শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রুতি এড়াতে পারে নি, এমন একান্ত মনে শুনছিলেন তিনি। আর তাও তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বে। মারাত্মক ব্যাধি-কবলিত অবস্থায়ও এইসব গান তাঁর এত কণ্ঠস্থ ছিল!

কখনো তিনি কৌতুক করে মন্তব্যও করেছেন গান শুনতে শুনতে। এই বিবৃতি থেকে বোঝা যায়, গানের বাণী তাঁর কি কণ্ঠস্থ ছিল। গায়ক এখানে প্রিয় নরেন্দ্র। তবু শ্রীরামকৃষ্ণ সমালোচনা করেছেন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে। শ্লেষাত্মক বাক্যে নরেন্দ্রের মনে যথার্থ করণীয়টি গ্রথিত করতে চেয়েছেন।

নরেন্দ্র সে সময় কিছুদিন মাত্র আসছেন ঠাকুরের কাছে। তাঁর ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত তখনো আছে। সেদিন তিনি গান গাইছেন দক্ষিণেশ্বরের ঘরে। অনেক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে উপস্থিত।

'(সেই) এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর রে'—ব্রহ্মসঙ্গীতটি নরেন্দ্র তন্ময় হয়ে গাইছিলেন।

গানের শেষ পঙ্‌ক্তিতে আছে—'ভজন সাধন কর হে নিরন্তর চিরভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে।'

ঠাকুর ওই কথাগুলি নরেন্দ্রের হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত করবার জন্যে, ওই পঙ্‌ক্তিটি গাইবার সময় বলে উঠলেন—'না, না, বল্—ভজন সাধন কর হে দিনে দুবার।' কাযে যা করবি না, মিছিমিছি তা কেন বল্‌বি ?'

তাঁর কথায় সকলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। কারণ নরেন্দ্র তখনো যেতেন ব্রাহ্ম-সমাজে। সেখানে উপাসনা ও ধ্যান দিনে দুবার নির্দিষ্ট ছিল, সকালে ও সন্ধ্যায়। নরেন্দ্র অপ্রতিভ হলেন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ)।

শ্রোতা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গের উপসংহারে কাশীপুর ভবনের একটি শেষ বিবরণী দেওয়া হলো। বিবৃতিকার দত্ত মহেন্দ্রনাথ—

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পীড়া ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং আরোগ্যের কোনো আশা রহিল না। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রাত্রে উদ্দাম কীর্তন শুরু করিলেন। চীৎকার ধ্বনিতে বাড়ি কাঁপিতে লাগিল। অনেকে মনে করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অল্পদিনের মধ্যেই দেহ রক্ষা করিবেন। এই সব ছোঁড়াদের আমোদ আহ্লাদ স্ফূর্তি দেখ, বয়সটা জোয়ান কিনা, তাই বুদ্ধি শুদ্ধি কম। শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তনীর দলের ভিতর থেকে একজনকে ডাকালেন এবং ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, 'তোরা ত বেশ রে, কেউ মরে আর কেউ হরিবোল বলে।'

উপস্থিত লোকটি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পরক্ষণেই অতি আহ্লাদ করিয়া বলিলেন, 'ওর সুরটা এইরকম, অমুক জায়গায় এক কলি তোরা ভুলেছিলি। ঐখানে ওই কলিটা দিতে হয়।' উপস্থিত যুবকটি প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতৃবৃন্দকে সেই বিষয় বলিলেন ও সুর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ও কলিটি সংশোধন করিয়া উদ্দাম কীর্তন শুরু করিলেন। কীর্তনের আনন্দে সকলে বিভোর হইয়া অনেকরাত্রি অতি-বাহিত করিলেন। মহাশোকের ভিতরেও মনটাকে কিরূপে বৈরাগ্যভাব দিয়া ভগ-বানে লইয়া যাওয়া যায় ইহা তাহার দৃষ্টান্ত।' (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮-১১—মহেন্দ্রনাথ দত্ত)।

শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরের সেই অবস্থায় শ্রুত গানের বাণী ও সুরের বিচ্যুতি সংশোধন করে দিলেন—তাও এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত!

শ্রোতা রূপে এমনি বহু বিচিত্র তাঁর পরিচয়। কি সর্বতোভাবে লিপ্ত-চিত্তে তাঁর গান শোনা। সঙ্গীত শুনতে শুনতে কথনো তিনি ভাবাবিষ্ট, সমাধিস্থ হয়ে যান। কথনো উদ্দীপিত, সক্রিয় হয়ে ওঠেন সহযোগী গায়ক-রূপে। শ্রুত সঙ্গীতের অনুষঙ্গে স্বয়ং গানের পর গান করতে থাকেন। কীর্তনের আসর হলে, যোগ দেন নব নব আখর রচনা করে। কখনো গানের ভাবে প্রেমানন্দে নৃত্য করে ওঠেন। তাঁর ভাবোন্মত্ত নৃত্যে প্রাণবন্ত হয় অনুষ্ঠান। কখনো তিনি সঙ্গীতের প্রভাবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করেন।

অবিচ্ছিন্ন তাঁর গীতি-প্রকৃতি ও শ্রুতি-প্রকৃতি : নন্দন-সত্তার আন্তঃ-পরিবর্তনশীল দুই রূপ। সফল গায়কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন কখনো। গানের অসার্থকতায় তেমনি হতাশ। আবার নিরপেক্ষ সমালোচক। উপযুক্ত পাত্রে অনুরোধের পর অনুরোধে বিশেষ বিশেষ গান শোনেন তন্নিষ্ঠ চিত্তে। কখনো শিষ্য-সন্নিধানে গানের বাণীর ব্যাখ্যা করে দেন। কখনো সুচিন্তিত মন্তব্যে গানের ভাব সুপরিস্ফুট করেন। গায়ন-শিল্পীর প্রতি স্বীকৃতি, সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শনে অকৃপণ। অন্যমনস্কে গানের আসর ত্যাগ করে এসে অপরাধী বোধ করেন নিজেকে। গানের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা ও অন্তরঙ্গতায়, তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বে সঞ্জীবিত হয়ে থাকে গীতবাদ্যের স্থান।
সঙ্গীতের আদর্শ শ্রোতা শ্রীরামকৃষ্ণ।

অষ্টম অধ্যায়

সঙ্গীতে পার্ষদবৃন্দ

পূর্বতন অবতার শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য। তার অন্যতম প্রধান, ভাবজীবনে উভয়েরই দিব্যোন্মাদ অবস্থা তথা অর্ধ বাহ্য-দশা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে শুদ্ধাভক্তির প্রসঙ্গে ঈশানচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'উর্জিতা ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়। যদি কারু এমনি ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো, ঈশ্বর স্বয়ং বর্তমান। চৈতন্যদেবের ঐরূপ হয়েছিল।'

এই কথার উল্লেখ করে শ্রীম. লেখেন, 'ঠাকুর বলিতেছেন, প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়'; এ তো শুধু চৈতন্যদেবের অবস্থা নয়, ঠাকুরের তো এই অবস্থা। তবে কি এই-খানে স্বয়ং ঈশ্বর সাক্ষাৎ বর্তমান?'

সে আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। তবে তাঁদের ভাব-জীবনের এক আনুষঙ্গিক সঙ্গীত প্রসঙ্গে আশ্চর্য সমত্ব লক্ষ্যণীয়। ধর্ম সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ স্বরূপ যে সঙ্গীত তা উভয়েরই লীলায় সুপ্রকাশ। সঙ্গীতে তাঁদের সৌসাদৃশ্য বিভিন্নভাবে প্রকটিত।

প্রথমত, শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের গায়ন গুণ। উভয়েই সুকণ্ঠ, হৃদয়স্পর্শী গীতকাব। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং নাম সকীর্তনের প্রচলন-কর্তা। তা ভিন্ন, লীলাকীর্তন ও গুণকীর্তনেরও গায়ক তিনি। 'শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের সঙ্গে এই তিন প্রকার কীর্তন করিতেন'। শ্রীচৈতন্য-চরিতের উপাদন, পৃঃ৬০৮—বিমানবিহারী মজুমদার)। শ্রীরামকৃষ্ণের গায়করূপে পরি-চয় প্রথম চারটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, গীত ও নৃত্য দুজনেরই সঙ্গীত ক্রিয়ায় অঙ্গাঙ্গী। নৃত্য সহযোগে গান এবং অপরের কীর্তনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের যোগদান একটি লক্ষণীয় সাদৃশ্য। তাঁদের সঙ্গীতের আবেগ, অনুরাগ, আনন্দ স্ফুরিত হয়ে ওঠে নৃত্যে। সেই উদ্দীপিত, নৃত্যপর রূপ ভক্তজনমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করে তোলে। নৃত্যশীল গৌরাঙ্গ বিগ্রহ অপরূপ, অক্ষয় হয়ে আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণেরও যত কীর্তনের আসরে উপস্থিতি ঘটেছে সবই তাঁর ভাবে-বিভোর নৃত্য অনুষ্ঠানে সঞ্জীবিত। পেনেটির মহোৎসবে, বলরাম মন্দিরে রথযাত্রা উৎসবে ও নানাদিনে তাঁর ভাবৈশ্বর্যময় নৃত্যের বর্ণনায় 'কথামৃত'কার শ্রীচৈতন্যের সদৃশ নৃত্যকথা স্মরণ করেছেন। অধিক উল্লেখ বাহুল্য।

তৃতীয়ত, গান তাঁদের ভাব প্রচারের এক প্রধান বাহন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয়

বৈষ্ণবধর্ম কীর্তন গানের মাধ্যমে বহুজনপ্রাণে সাড়া জাগায়। তাঁর প্রেমধর্ম সমধিক প্রচারিত এবং প্রসারিত হয় সঙ্কীর্তন অবলম্বনে।

শ্রীচৈতন্যের সংস্কৃতভাষায় রচিত 'শিক্ষাষ্টকে'র প্রথম পদই হলো—শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্তন চিত্তরূপ দর্পণের পরিমার্জনকারী।' গৌরাঙ্গ কথিত রাগানুগা বৈষ্ণবীয় ভক্তির সঙ্গে কীর্তন গান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর প্রবর্তনায় ধর্মের 'নাম সংকীর্তন' গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টান্তে সমবেত কণ্ঠে কীর্তনে অনুপ্রাণিত হন তাঁর শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ। তাঁর সরল অথচ মনোমুগ্ধকর গানে কৃষ্ণভক্তির আবেদন জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছিল। চৈতন্যধর্মের এক বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে ওঠে পুরীতে রথযাত্রা এবং বাংলায় জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসবে আয়োজিত দলবদ্ধ সংকীর্তন। আর তার আনুষঙ্গিক নৃত্য। মহাপ্রভু স্বয়ং শিষ্যদের সংকীর্তন শিক্ষা দিতেন হাতে তালি দিয়ে এবং সুমধুর কণ্ঠে বাণী শুনিয়ে : 'হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥'

'শিষ্যগণ বলেন—'কেমন সংকীর্তন ?'
আপনি শিখায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥
'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥'
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লইয়া ॥'

(চৈতন্য ভাগবত— বৃন্দাবন দাস)

শ্রীচৈতন্যের তুল্য কোনো বিশিষ্ট ধর্মমত কিংবা সম্প্রদায়ের প্রচলন শ্রীরামকৃষ্ণ করেন নি বটে, ভারতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত সনাতন ধর্মকে তিনি নানা বিকৃতি, গ্লানি ও বিসদৃশ পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্ত করে যুগোপযোগী ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর তাঁর সেই সর্বাত্মক ভাবধারা শিষ্য ও ভক্তদের নিকটে প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হয়েছে, সঙ্গীত।

নানা সময়ে গানে গানে তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেছেন বিভিন্ন গীতি রচয়িতাদের বাণীর সাহায্যে শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন গভীর তত্ত্ব-কথা। সুর ছন্দে তাঁর বক্তব্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সকলের চিত্তপটে।

বিবিধ পরিবেশে, নানা অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের গান গাওয়া এবং অনুগামীদের সঙ্গীতে প্রবুদ্ধ করার বহু দৃষ্টান্ত বর্তমান পুস্তকের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তার মধ্যে দেখা গেছে, তাঁর অনুষ্ঠিত এবং প্রিয় গানগুলির অন্যতম প্রধান হলো, পদাবলী কীর্তন। শ্রীকৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ গান।

শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে হরিনাম কীর্তন অভ্যাসের তিনি যে উৎসাহ, নির্দেশাদি

দিতেন তার আরো কিছু তথ্য বিবরণ দেওয়া হবে বর্তমান অধ্যায়েও। কাউকে তিনি স্বয়ং কীর্তনের ধরন-ধারণে কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, এমন ঘটনাও জানা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৃহী-ভক্ত ও সেবক রামচন্দ্র দত্ত এক তরুণ কীর্তনীয়াকে নিযুক্ত রেখেছিলেন ঠাকুরকে গান শোনাবার জন্যে। তাকে কীর্তনের সময়কার ভঙ্গিমা ঠাকুর শিখিয়েছিলেন, একথা স্বামীজীর অনুজ মহেন্দ্রনাথ বিবৃত করেছেন; 'রাম দত্ত গৃহে আহারের পর, গাড়ির বিলম্ব হলে ঠাকুর কীর্তন-গায়ক যুবককে (তাকে রাম দত্ত ভাড়া করে আনেন। ঠাকুর কিছুদিন আসা যাওয়ার পর তাঁকে গান শোনাবার জন্যে) 'কি করিয়া হাত নাড়িতে হয়, কোমর বাঁকাইয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহা শিখাইতেছিলেন। ছেলেটিও দু' একবার কণ্ঠ করিয়া তাহা অভ্যাস করিতে লাগিল।'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, পৃঃ ৪৩—মহেন্দ্রনাথ দত্ত)

চতুর্থত, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যের পরিকরবর্গের অধিকাংশই গায়ক। মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলায় অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, গদাধর, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ প্রমুখ পার্ষদবৃন্দ সকলেই কীর্তনীয়া। গৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে এবং পরেও তাঁরা সংকীর্তনে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের ধর্মজীবন ও সাধনের অঙ্গাঙ্গী থাকে, কীর্তন সঙ্গীত। এইভাবে মহাপ্রভুর উত্তরলীলায়, অর্থাৎ নীলাচল পর্বে, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রমুখ অন্তরঙ্গ পরিকরগণও গায়নগুণী।

তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পার্ষদ ও শিষ্যমণ্ডলীর অনেকেই গায়ক। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গীতপ্রসঙ্গ বর্তমান অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। তাঁদের এই সঙ্গীত-জীবন সম্পর্কে তাঁদের গুরুও বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

সে আলোচনার আগে, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকটি সৌসাদৃশ্যও প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করবার যোগ্য। তা হলো, ব্যাপক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উভয়ের সংযোগ ও প্রভাব প্রতিপত্তি।

তাঁরা দুজন কেবল ধর্মীয় নেতা নন। দেখা গেছে, সমকালীন সংস্কৃতি জগতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত ভাবাদর্শের তথা তাঁদের অলৌকিক চরিত্র-মাহাত্ম্যের অনুগামী। উভয়েরই শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের নানদিক গুণসম্পন্ন জন লক্ষ্যণীয় সংখ্যায় বর্তমান।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুসারীদের প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য। প্রথমে উল্লেখ করা যায় শ্রীচৈতন্যের এই দিক সম্পর্কে। মহাপ্রভুর জীবনচরিতের স্মরণীয় গবেষক বিমানবিহারী মজুমদার এ বিষয়ে তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিবৃত করেছেন, 'রূপদক্ষ ও নৃত্য গীতাদি কলাকুশলী ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।'

(ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৬৬০)। আচার্য বিমানবিহারী নির্দিষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, চৈতন্য-দেবের ৪৯০ জন পরিকরের মধ্যে ৬৬ জন ছিলেন লেখক। অন্যান্য সাংস্কৃতিক বৃত্তি-ধারী পার্ষদ ও অনুগামীদের সম্বন্ধে অনুরূপ তথ্য মজুমদার মহাশয় দেন নি। যদি তা দিতেন, গায়কদের সংখ্যা তাহলে লেখকদের তুলনায় অধিকতর হতো নিঃসন্দেহে। কারণ গৌরাঙ্গের ভক্তবৃন্দ প্রায় সকলে সমবেত কণ্ঠে সঙ্কীর্তনে (যথা নগর সংকীর্তন) অভ্যস্ত ছিলেন।

তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে সমাগত হতেন নানা গণ্যমান্য পণ্ডিত, গ্রন্থকার, কবি, শিক্ষাবিদ্, নাট্যকার, গীতকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী প্রভৃতি তাঁর লোকোত্তর চরিত্র ও মধুর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে। সে এক বিস্তৃত বৃত্তান্ত। তাঁদের মধ্যে কেবল তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ শিষ্য ও পার্ষদদের গীত-বিবরণ এখানে দেওয়া হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় পরিজনদের অধিকাংশই যে গায়ক কিংবা গীতানুরাগী তা আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁদের সঙ্গীত-গুণ অনেকাংশে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব প্রভাবে। যেমন তাঁর পরিকরদের সঙ্গীতে উদ্‌বুদ্ধ করে শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টান্ত।

কত সময় ভাবানুসারী সঙ্গীতের পরিবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ অবস্থান করতেন। স্বয়ং গান শোনাতেন বিভিন্ন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে। পার্ষদবৃন্দকেও উদ্‌বুদ্ধ করতেন সঙ্গীতক্রিয়ায়। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কক্ষ নিরন্তর ধর্মকথায় ও ভজন কীর্তনে মুখর থাকত। সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা সঙ্গীত-গুণ-সম্পন্ন তাঁদের গাইতেই হতো তাঁর আগ্রহে।

এমন কি কোনো কোনা পরিজন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় ও ইচ্ছায় সঙ্গীতজীবন আরম্ভ করেছেন। এ বিষয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের বিবরণ আগেই উল্লিখিত। আরো উদাহরণ দেওয়া হবে এই অধ্যায়েই।

কেবল দক্ষিণেশ্বরেই তাঁকে কেন্দ্র করে সঙ্গীতের আবহ নয়। তিনি যখন যে-কোনো ভক্ত গৃহে উপনীত হতেন, সেখানেই সৃষ্টি করতেন সঙ্গীতের পরিমণ্ডল। তাঁকে সং-বর্ধনা তথা সমাদরের জন্যে গৃহস্থের এক প্রধান করণীয় হতো—গানের অনুষ্ঠান। রামকৃষ্ণকে গান শোনাবার জন্যে গৃহকর্তা গায়কের ব্যবস্থা করতেন। বলরাম, গিরিশ-চন্দ্র, অধরলাল, রামচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, ঈশানচন্দ্র প্রমুখ তাঁর সকল গৃহী ভক্তই এ বিষয়ে তৎপর থেকেছেন তাঁকে আমন্ত্রণ করা হলে। অনেকেরই ভবনে তিনি স্বয়ং-ও গান গেয়েছেন। অন্য গায়কদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সোৎসাহে। কীর্তনের অনুষঙ্গে ভাবে মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য করেছেন। তাঁর উপস্থিতিতেও সঙ্গীত-বিহীন, এমন গৃহ দেখা গেছে কদাচিৎ। যত অনুগামী ও অনুরাগীদের আবাসে শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকবার পদার্পণ করেছেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঞ্জীবিত হয়ে আছে তাঁর এবং পার্ষদদের গীত-স্মৃতি। ভক্ত ও শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর অনুপম কথামৃতেরই তুল্য প্রাণবন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-

কেন্দ্রিক সঙ্গীত-পরিমণ্ডল। ১

অনেক পার্ষদবৃন্দের সঙ্গীতগুণ তাঁর প্রেরণা, প্রশংসা ও আনুকূল্যে শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে। ভক্তদের গানে ঠাকুরের উৎসাহ ও স্বীকৃতি জানাবার বহু উল্লেখ আছে 'কথামৃত' গ্রন্থমালায়। তার থেকে বিভিন্ন বিবরণী দেওয়া হবে বর্তমান অধ্যায়ে। প্রথমে অন্য একটি পুস্তকের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা হলো।

রামলাল বলছেন পুস্তকলেখক কমলকৃষ্ণ মিত্রকে—(একদিন) 'ঠাকুর আমায় গান গাইতে বলেন, 'তার তারিণী।' কিন্তু আমি এক ঘর লোক দেখে লজ্জা করছি। এই না দেখে ঠাকুর আমায় বললেন '…ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। লোককে দেখে তোর লজ্জা? লোক না পোক।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'যখন যে কোনো দেবদেবীর গান গাইবি, আগে চোখের সামনে তাঁকে দাঁড় করাবি, তাঁকে শোনাচ্ছিস মনে করে তন্ময় হয়ে গাইবি। লোককে শোনাচ্ছিস কখনো ভাববি না, তাহলে লজ্জা আসবে নি।'…(পৃঃ ৩, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি—কমলকৃষ্ণ মিত্র)।

এখন তাঁর কয়েকজন শিষ্য ভক্ত সেবকের সঙ্গীত প্রসঙ্গ বিবৃত করা হবে। তা থেকে ধারণা করা যাবে, তাঁদের সঙ্গীত জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের সামগ্রীক প্রভাব। বলে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁদের যাবতীয় সাঙ্গীতিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় কারণ প্রয়োজনীয় সব তথ্যাদি পাওয়া যায় নি সকলের বিষয়ে।

প্রথমে নরেন্দ্রনাথের কথা। তাঁর সঙ্গীত প্রসঙ্গ অনেকাংশে পূর্বাশ্রম নামের সঙ্গে জড়িত। অবশ্য সন্ন্যাস অবলম্বনের পরেও তাঁর গায়ন-গুণ বর্জিত হয় নি। স্বামীজীর গায়ক-রূপ বিদ্যমান ছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত এবং সঙ্গীতের বিভিন্নবিভাগে অভিজ্ঞ ছিলেন তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত ভাবধারার শ্রেষ্ঠ ধারক বাহক প্রচারক, যাঁকে ঠাকুর 'আত্মার স্বরূপ জ্ঞান' করতেন। যিনি 'লোকশিক্ষা'র প্রয়োজনে গুরুর হাতে গঠিত, যাঁর কম্বুকণ্ঠে স্বদেশে ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সেই বাণী তথা ভারতীয় ধর্মসাধনার আদর্শ ধ্বনিত হয়েছিল, যিনি গুরুর ভাবধারা ও সনাতন ধর্মের নবরূপ প্রচার এবং শিবজ্ঞানে জীব সেবার জন্যে সাংগঠনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর সেই সর্বোত্তম শিষ্য বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞও।

বিবেকানন্দের সঙ্গীতগুণ বহুমুখীন। একধারে গায়ক, বাদক, গীত-রচয়িতা, সঙ্গীত তাত্ত্বিক তিনি। তবে প্রধানত গায়ক রূপেই তাঁর সমধিক পরিচিতি। আর গানের মধ্যে বিশেষভাবে তিনি ধ্রুপদ গীতিরীতিরই সাধক ছিলেন প্রথম জীবনে। তবু গায়ক হিসাবেও বিভিন্ন ধারায় তাঁর নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। একদিকে কীর্তন, ব্রহ্ম-

সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীতাদি বাংলা গান, অপরদিকে হিন্দী খেয়াল, টপ্পা, ভজনও গাইতেন সুদক্ষভাবে। এমন কি ঠুংরিও তিনি গেয়েছেন বলে প্রকাশ। তাঁর গীতিকণ্ঠ ছিল সুরেলা, সতেজ, সুমধুর অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ। বাদক রূপে তিনি ছিলেন প্রধানত সঙ্গত-কার। পাখোয়াজ ও তবলা সুদক্ষভাবে বাজাতেন। তাঁর হাত ছিল খোল বাদনেও। সঙ্গত করেছেন কীর্তন গানে। আবার সেতারের মতন কিছু কিছু সুরের যন্ত্রও শিক্ষা করেছিলেন।

ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ, বিশেষ গায়ক-রূপে তাঁর প্রতিভা স্বীকৃতি পায় তরুণ বয়সেই। তাঁর জীবন যদি সন্ন্যাসের পথে পরিচালিত এবং পরে বিরাট অধ্যাত্ম-কর্ম-যজ্ঞে উদ-যাপিত না হতো, তিনি একজন প্রথম সারির গায়নগুণী রূপে স্মরণীয় থাকতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে গায়করূপেই তিনি প্রথম আসেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভবনে। ঠাকুরকে গান শোনাবার জন্যে সেদিন গায়ক সন্ধান করা হয়। তখন কে নিয়ে আসেন প্রতিবেশী নরেন্দ্রকে। তাঁর বয়স সে সময় সম্ভবত উনিশ বছর। ১৮৮১ সালের শেষ কিংবা ১৮৮২-র প্রথম দিকের কথা। সেই প্রথম সাক্ষাতকার সম্পর্কে বরাহনগর মঠে শ্রীম. একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তিরোধানের পরের বছরে—'প্রথম দেখার দিনটি তোমার বেশ স্মরণ পড়ে?'

নরেন্দ্র—সেদিন দুটি গান গেয়েছিলাম—'মন চল নিজ নিকেতনে, আর 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।'

মাস্টার—গান শুনে কি বললেন?

নরেন্দ্র—তাঁর ভাব হয়ে গিছলো। রামবাবুদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ছেলেটি কে? আহা কি গান।' আমায় আবার আসতে বললেন।'...

তারপরেও নানাদিনে তাঁর গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশংসা করেছেন উচ্ছ্বসিত ভাবে। নরেন্দ্রের গানের অতি অনুরাগী শ্রোতা তিনি। দক্ষিণেশ্বরে বা কোনো ভক্ত-গৃহে পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটেছে অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গাইতে বলেন নি এমন হয়েছে কচিৎ। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রতিবারই গান শুনিয়েছেন কয়েকটি করে। ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্ম সঙ্গীত, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, ভজন ও অন্যান্য ভক্তি-গীতি। একদিন (৯ই মে, ১৮৮৫) বলরাম মন্দিরে তিনি দশখানি গান ঠাকুর ও ভক্তদের কাছে গেয়েছিলেন। প্রথম থেকেই নরেন্দ্র যে-সব গুণে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেন তার একটি প্রধান হলো—সঙ্গীত। শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন 'নরেন্দ্র খুব ভালো আধার। একাধারে কত গুণ—গাইতে, বাজাতে, লেখাপড়ায়।'

শ্রোতারূপে তিনি একটি চরম কথা বলেছিলেন নরেন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে—ঠাকুরের অন্তরাত্মা কি তদ্‌গত হয়ে তাঁর গান শুনত। নরেন্দ্র স্বয়ং তা শ্রীম-কে একদিন

বলেছিলেন ঠাকুরের প্রসঙ্গে, বরাহনগর মঠে : 'বলতেন, বোধহয় মনে আছে, 'তোর গান শুনলে (বুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) এর ভিতর যিনি আছেন, তিনি সাপের ন্যায় ফোঁস করে যেন ফণা ধরে স্থির হয়ে শুনতে থাকেন।' (কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট—বরাহনগর মঠ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ তুল্য নরেন্দ্রনাথের সঙ্গেও সঙ্গীত যেন ওতোপ্রোত জড়িত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে সমাগত তাঁর ভক্ত ও চিহ্নিত শিষ্যদের কথায় শ্রীম. জানিয়েছেন, 'নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন, এলেই আনন্দের হাট। নরেন্দ্র তাঁহার দেব-দুর্লভ কণ্ঠে ভগবানের নাম-গুণগান করেন, অমনি ঠাকুরের নানাবিধ ভাব ও সমাধি হইতে থাকে। একটি যেন উৎসব পড়িয়া যায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে একদিন একটি গানের বাণী শিখিয়েছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-জীবন অনেকাংশে নির্ধারিত হয়ে যায় সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনটিতে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। যেদিন তিনি দেবী ভবতারিণীর নিকটে, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় প্রার্থনা করতে গিয়েছিলেন। সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুর একটি গান শিক্ষা দেন শিষ্যকে, তাঁরই অনুরোধে। বিবেকানন্দ-জীবনে সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি এই যে, তিনি কালী মূর্তির কাছে অর্থ প্রার্থনা করতে অসমর্থ হলেন। পরন্তু তিনি চাইলেন, 'বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি এরূপ করে দাও।' তারপর শ্রীরামকৃষ্ণকে এসে বললেন, 'আমায় মার গান শিখিয়ে দাও।' এ সম্পর্কে ঠাকুর স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে জানিয়েছেন। 'তখন আমি তাকে 'মা ত্বং হি তারা গানটি শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে।

(আমার মা) ত্বং হি তারা। তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
তোরে জানি মা ও দীন দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা ॥
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমিই আদ্যমূলে গো মা,
আছ সর্ব ঘটে অক্ষ পুটে সাকার আকার নিরাকারা ॥
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা,
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী সদাশিবের মনোহরা ॥

বৈকুণ্ঠনাথ বিবৃত এই বৃত্তান্তটি উল্লেখ করেছেন স্বামী সারদানন্দ—'ঠাকুরের দিব্য-ভাব ও নরেন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে। (পৃঃ ২৪৬-৪৭, শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)।

নরেন্দ্রনাথের গান শুনতে ঠাকুরের আগ্রহের নানা উদাহরণ দেখা গেছে 'কথামৃত'তে—তা ভিন্ন, অন্যান্য বিবরণেও পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত প্রসঙ্গ দেওয়া হলো এখানে। সে সময় নরেন্দ্রের পিতা জীবিত। তাঁর বি. এ. পরীক্ষা

দেবার কিছুদিন আগেকার কথা। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে লেখাপড়া (এবং গানেরও) অসুবিধার জন্যে মাতামহীর ৭, রামতনু বসু লেনে তিনি তখন থাকতেন। সেবাড়ির দোতলায় একটি ছোট ঘরে। 'বি. এ. পড়িবার সময় নরেন্দ্র রামতনু বসু লেনের স্বীয় মাতামহীর ভবনে তাঁহার পাঠগৃহ নির্দিষ্টকরিয়া লইয়াছিলেন। আত্মীয় পরিজন ও অন্যান্য লোকের সমাগমে পিতৃভবন সর্বদা কলরবে মুখরিত থাকিত বলিয়া তাঁহার পড়াশুনার বিশেষ ব্যাঘাত হইত। এই কক্ষে ধনীর সন্তান হইয়াও নরেন্দ্রনাথের সামান্য শয্যায় কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক, একটি তানপুরা ও তামাক খাইবার সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য কোনো তৈজসপত্র ছিল না।' (বিবেকানন্দ চরিত,' পৃঃ ১০০, চতুর্থ সং—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)।

সে ঘরেও শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ করেন একাধিকার। তার মধ্যে একদিনের বিবরণী উল্লেখনীয়। সেদিন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দুই বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্যালও ছিলেন :—

'একদিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন অনেকদিন তাঁহার নিকটে না যাওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য রামলালের সঙ্গে কলিকাতায় নরেনের 'টঙে' আগমন করেন।'… (নরেনের কুশল সংবাদ নিয়ে, তাঁকে সঙ্গে আনা সন্দেশ মুখস্থ করিয়ে) 'শ্রীরামকৃষ্ণ তৎপরে বলিলেন, 'ওরে তোর গান অনেকদিন শুনিনি, গান গা।' অমনি তানপুরা লইয়া তাহার কান মলিয়া সুর বাঁধিয়া নরেন্দ্রনাথ গান আরম্ভ করিলেন—

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিনী, (তুমি) নিত্যানন্দ স্বরূপিণী,
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার পদ্মবাসিনী।…ইত্যাদি

গানও আরম্ভ হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হইতে লাগিলেন। গানের সুরে সুরে মন ঊর্ধ্বে উঠিল, চক্ষে পলক নাই, বক্ষে স্পন্দন নাই…ক্রমে মর্মর মূর্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন। নরেনের বন্ধুরা পূর্বে কোনো মানুষের এরূপ ভাব দেখেন নাই। তাঁহারা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝি বা শরীরে কোনো পীড়া হওয়ায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মহা ভীত হইলেন। দাশরথি জল আনিয়া তাঁহার মুখে সিঞ্চন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, 'জল দেবার দরকার নেই, উনি অজ্ঞান হননি, ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে শুনতেই জ্ঞান হবে এখন।'

'নরেন্দ্র এইবার শ্যামাবিষয়ক গান ধরিলেন, 'একবার তেম্‌নি তেম্‌নি করে নাচ মা শ্যামা।' শ্যামাবিষয়ক অনেক গানই হইল। গান শুনিতে রামকৃষ্ণ কখনও ভাবাবিষ্ট হইতেছেন, আবার কখনও বা সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া

গান গাহিলেন, অবশেষে গান শেষ হইলে রামকৃষ্ণ কহিলেন, 'দক্ষিণেশ্বরে যাবি? কদিন ত যাসনি, চল্ না, আবার এখনি ফিরে আসিস।' নরেন্দ্র তখনই সম্মত হইলেন। পুস্তকাদি যেমন অবস্থায় পড়িয়াছিল তেমনি পড়িয়া রহিল, কেবলমাত্র তানপুরাটি যত্নপূর্বক তুলিয়া রাখিয়া গুরুদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। বন্ধুরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।' (উদ্বোধন, ১৩১৭ সাল, ফাল্গুন সংখ্যা, 'স্বামীজীর স্মৃতি'—প্রিয়নাথ সিংহ।)

ঠাকুর সম্পর্কে গায়ক-নরেন্দ্রনাথের বহু প্রসঙ্গ আছে। তাঁর কিছু প্রকাশ করা হয়েছে শ্রোতারূপে শ্রীরামকৃষ্ণের বিবরণে। এখানে সে বিষয়ে আর উদ্ধৃত না করে সঙ্গীতজ্ঞ নরেন্দ্রনাথের অন্যান্য পরিচয় এখন বক্তব্য। তিনি গায়ন-গুণী হয়েছিলেন রীতিমত গীত শিক্ষার ফলে, সংস্কৃতিবান বংশের ধারায় এবং পারিবারিক পরিবেশে। তাঁর পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ, পিতা বিশ্বনাথ উভয়েই সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন এবং নরেন্দ্র প্রথম রাগসঙ্গীতের শিক্ষা পান পিতার নিকটে। তিনি আবাল্য গানে সুকণ্ঠ এবং শুনে নানা বাংলা গান শিখে নিতেন। জননীর সহায়তা ও দৃষ্টান্তও পেয়েছিলেন শিশুকাল থেকে। তাঁর অনুজ মহেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'পূজনীয়া মাতা ভুবনেশ্বরীর …গান বা কবিতা একবার মনোযোগ দিয়া শুনিলেই বেশ স্মরণ থাকিত।… মাতা শ্রদ্ধেয়া ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠস্বরও খুব মিষ্টি ছিল কৃষ্ণযাত্রার গান তিনি আপন মনে বেশ গাহিতেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। এইরূপ নানা দিক হইতে শক্তি আসায় স্বামীজীর সঙ্গীতের ইচ্ছা খুব প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি কলিকাতায় ধ্রুপদ গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।…' (স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন, পৃঃ ৫৪-৫৭—মহেন্দ্রনাথ দত্ত)।

পিতা নিজে সঙ্গীতশিক্ষা দেবার পরে নরেন্দ্রনাথকে পদ্ধতিগত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন বেণীমাধব অধিকারী, আহম্মদ খাঁ প্রমুখ কলাবতদের অধীনে। রাগসঙ্গীতের কৃতী গায়ক ও সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব সেকালে 'বেণী ওস্তাদ' নামে বিখ্যাত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র প্রণীত ও নির্দেশিত নানা নাটকে সঙ্গীত পরিচালনা করেন বেণীমাধব, স্টার থিয়েটারে।—'দক্ষ যজ্ঞ', 'নল দময়ন্তী', 'চৈতন্যলীলা', 'হীরার ফুল' প্রভৃতি। নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ লক্ষ্ণৌ থেকে আগত খেয়ালের গুণী, কলকাতায় বহুদিন তিনি কলাবৎ ও শিক্ষকরূপে বসবাস করেছিলেন। কথিত আছে, বারাণসীর স্বনাম-প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ-গায়ক জোয়ালাপ্রসাদ মিশ্র এবং গয়ার বিখ্যাত এস্রাজী কানাই-লাল্ ঢেঁড়ির নিকটেও যথাক্রমে ধ্রুপদ গান ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন নরেন্দ্র-নাথ। বেণী ওস্তাদ, কানাইলাল ঢেঁড়ি প্রমুখ আচার্যদের নিকটে শিক্ষাকালে এবং গৃহের সঙ্গীতচর্চাতেও নরেন্দ্রনাথের সতীর্থ ছিলেন হাবু দত্ত বা অমৃতলাল। শেষোক্ত-

জন তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা (স্বামীজীর পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ এবং অমৃতলালের পিতামহ কালীপ্রসন্ন ছিলেন সহোদর) এবং একই গৃহের বাসিন্দা (৩, গৌরমোহন মুখুজ্যে স্ট্রীট)। পরবর্তীকালে হাবু দত্ত ক্ল্যারিওনেট, এসরাজ ও সুরবাহার বাদকরূপে বিখ্যাত হন সঙ্গীত জগতে। নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর চেয়ে পাঁচ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ অমৃতলাল একই ওস্তাদের কাছে শিক্ষা করতেন একত্র থেকে। নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস-জীবনে গৃহত্যাগ করবার পরেও কিছুকাল হাবু দত্ত তাঁদের সেই ৩, গৌরমোহন মুখুজ্যে ঠিকানায় গৃহবাসী থাকেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করবার ক'দিন মাত্র আগে, নরেন্দ্রনাথ অমৃতলালকে নিয়ে যান তাঁর সন্নিধানে, কাশীপুর বাড়িতে। ঠাকুর হাবু দত্তের বুকে স্পর্শ করে শক্তিসঞ্চার করে দেন। আর একটি সংবাদ, পাশ্চাত্য জগতের স্বনামধন্য গায়িকা এবং স্বামীজীর প্রতি ভক্তিমতী মাদাম কাল্‌ভে যখন (১৯১১ সালে) বেলুড় মঠে আসেন, তাঁর সংবর্ধনা সভায় এস্রাজ বাজিয়েছিলেন অমৃতলাল। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণের মহোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে হাবু দত্তের যোগাযোগ থাকে।

নরেন্দ্র পাখোয়াজ ও তবলাবাদন কার কাছে শেখেন, নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। গুরু ভ্রাতা শরৎকে (পরে স্বামী সারদানন্দ) তিনি তবলায় ঠেকা দিতে শেখান মাত্র জীবনেই। তাঁর হাতের পাখোয়াজ যন্ত্রটি পুণ্য-স্মৃতি স্বরূপ রক্ষিত আছে বেলুড় মঠে। পাখোয়াজ ক্রোড়ে স্বামীজীর একটি দুষ্প্রাপ্য ফটোগ্রাফও দেখা গেছে।

কণ্ঠসঙ্গীতেই স্বামীজীর প্রতিভা সমধিক স্ফূর্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি ধ্রুপদ গায়ক রূপে ব্রাহ্মসমাজ পরিমণ্ডলে ও উত্তর কলকাতায় সুপরিচিত।

গীত-রচয়িতা-রূপে স্বামীজীর গভীর ভাবাত্মক শক্তির পরিচয় আছে তাঁর রচিত ছ'খানি গানে। বিশেষ তাঁর 'এক রূপ অরূপ নামবরণ' ও 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর' গান দুখানি অবিস্মরণীয়। অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারী সৃষ্টি প্রলয় এবং বিশ্বপ্রকৃতির উন্মীলন নিমীলনের মহা ভাবে এই দুটি গীত স্বামীজীর প্রকৃত অনুভূত অধ্যাত্ম-সম্পদের অতুলনীয় নিদর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বন্দনা-সূচক গান তাঁর রচনা—'খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ বন্দন বন্দি তোমায়।' গানখানি প্রতি সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ আরত্রিক রূপে গীত হয়ে থাকে।

স্বামীজী রচিত 'মুঝে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া যানে কো দে' এই হিন্দী গানটি সুমিষ্ট, মাধুর্যমণ্ডিত এবং রচনা চাতুর্যে যেন কোনো সঙ্গীত ব্যবসায়ীর সৃষ্টি মনে হয়।

'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ' গানটি স্বামীজীর গাইবার এবং তা শুনে নাট্যাচার্য গিরিশ-চন্দ্রের ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের মন্তব্য ও ধারণা সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়, যা স্মরণ-যোগ্য :—

'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্বচরাচর ॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়া দল মহা লয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
আবাঙ্ মনসোগোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার ॥

এই গানটি স্বামীজী এই সময় (সম্ভবত ১৮৮৭ সালের প্রথম দিকে অর্থাৎ বরাহনগর মঠের প্রথম যুগে—বর্তমান লেখক) রচনা করেন। গ্রীষ্মকাল, প্রাতে গিরিশবাবুর বাটীতে স্বামীজী গিয়াছিলেন এবং উপরকার ছাতের গরাদের কাছে বসিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গানটি গাহিতেছেন। অতুলবাবু (গিরিশবাবুর ভাই) জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'হ্যাঁ হে, এ গানটা নতুন দেখছি যে, কার বাঁধা ? মেজদাদার (গিরিশবাবুর) বাঁধা নয় তো ?' নরেন্দ্রনাথ কোনো কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অতুলবাবু বলিলেন, 'ওহে ভাল করে একবার গাও না।' শুনিয়া মোহিত হইয়া অতুলবাবু বলিলেন, 'এই গানটা যে বাঁধতে পারে, সে একটা বড় লোক—এই একটা গানের জন্যে সে জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবে।' নরেন্দ্রনাথ মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতে লাগলেন এবং কিছুই বললেন না। অতুলবাবুর গানটা এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি সকলকেই কাহার রচিত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে শরৎ মহারাজ ইহা নরেন্দ্রনাথের রচিত বলিয়া দিলেন। অতুলবাবু নরেন্দ্রনাথের তীব্র মেধাশক্তিতে আগেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই গানটিতে নরেন্দ্রনাথের যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আছে ও উপলব্ধি হইয়াছে, ইহা তাঁহার ধারণা হইল।' (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৬-৮৭—মহেন্দ্রনাথ দত্ত)।

স্বামীজী রচিত অপর পাঁচখানি গান এখানে দেওয়া হলো :

(১)

খাম্বাজ—চৌতাল

একরূপ অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি' 'নেতি' বিরাম যথায় ॥
সেথা হতে বহে কারণ ধারা ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি, অহমহমিতি সর্বমিতি সর্বক্ষণ ॥
সে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে, অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,

কতই রূপ, কতই শকতি, কত গতি স্থিতি কে করে গণন ॥
কোটি চন্দ্র কোটি তপন লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহা ঘোর রোলে ছাইল গগন, করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন ॥
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী, সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য তারি কিরণ, যেই সূর্য সেই কিরণ ॥

(২)

মূলতান—ঢিমা ত্রিতালী

মুঝে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া যানেকো দে।
যানেকো দে রে সৈঁইয়া যানেকো দে (আজু ভালা) ॥
মেরা বনোয়ারী, বাঁদি তুহারি ছোড়ে চতুরাই সৈঁইয়া যানেকো দে
(আজু ভালা) (মোরে সৈঁইয়া)
যমুনাকি নীরে ভরোঁ গাগরিয়া জোরে কহত সৈঁইয়া যানেকো দে ॥

(৩)

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বববম্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল ॥
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক ধক ধক মৌলি বন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক ভাল ॥

(৪)

কর্ণাটি—সুলফাক্তা

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব পিনাক-পাণি ॥
ঊর্ধ্ব জ্বলন্ত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী ॥

(৫)

মিশ্র—চৌতাল

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নর-রূপধর, নির্গুণ গুণময় ॥
মোচন-অঘ দূষণ, জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায় ॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উন্মদ প্রেম পাথার।
ভক্তার্জন-যুগল চরণ, তারণ-ভব-পার ॥

জ্ঞিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগ সহায় ॥
নিরোধন, সমাহিত মন, নিরখি তব কৃপায় ॥
ভঞ্জন-দুঃখ গঞ্জন, করুণাঘন, কর্মকাধার।
প্রাণার্পণ-জগত-তারণ, কৃন্তন-কলি-ডোর।
বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতিনিন্দিত-ইন্দ্রিয়-রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ।
নির্ভয়, গতসংশয়, দৃঢ় নিশ্চয় মানসবান।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যাজি জাতিকুলমান।
সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব-গোষ্পদ-বারি-যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন-দুঃখ যায় ॥

স্বামীজী রচিত ছ'খানি গানের মধ্যে চারটি ধ্রুপদাঙ্গ। আর প্রতি গানের সুর-সংযোজক ও প্রথম গায়কও তিনি স্বয়ং। সব গানগুলিই শ্রীরামকৃষ্ণ তিরোধানের পরে রচিত এবং অধিকাংশ নরেন্দ্রনাথের বরানগর মঠের পর্বে। গীতাবলীর সংখ্যাল্পতার চেয়ে লক্ষ্যণীয় গানের গুণ ও স্বকীয়তা : ভাব, ভাষা ও সাঙ্গীতিক গঠনের সৌকর্য। তাঁর পরবর্তী পরিব্রাজক-জীবন, বিদেশবাস ও স্বদেশে বিপুল কর্মকাণ্ড স্মরণ করলে রচনার স্বল্পতার কারণও ধারণা হয়। অর্থাৎ, উপযুক্ত অবকাশ ও পরিবেশ লাভ করলে, গায়ক এবং গান-রচয়িতা রূপেও স্বামীজী প্রতিভার দান রেখে যেতেন যোগ্য পরিমাণে।

সঙ্গীত-তাত্ত্বিক ও গীত-সংগ্রহকার রূপে নরেন্দ্রনাথের পরিচয় 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থ পর্যালোচনার সময় দেওয়া হবে। তার আগে উল্লেখ্য যে, সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ভাবুক তথা সমালোচক চিত্ত প্রকাশ পেয়েছে অন্যান্য রচনায়। উত্তরজীবনে রচিত 'ভাববার কথা', 'পত্রাবলী', 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি পুস্তকের নানাস্থানে তাঁর চিন্তাশীল মতামত ও মন্তব্যাদি থেকে এবিষয়ে জানা যায়। সে সব উল্লেখ করা সম্ভব নয় স্থানাভাবে। কেবল একটি অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

'গান হচ্চে, কি কান্না হচ্চে, কি ঝগড়া হচ্চে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য তা ভরত মুনিও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম ? সে কি আঁকা-বাঁকা ডামা-ডোল, ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ। তার ওপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে নাকের মধ্যে দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব। এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্চে, এখন ক্রমে ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাযের কথা নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে উঠবে।' (ভাববার কথা পৃঃ ১০—স্বামী বিবেকানন্দ)।

স্বামীজীকে সঙ্গীত তাত্ত্বিক বলা যায় 'সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর সুদীর্ঘ (ক্রাউন আকারের ৯০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) প্রবন্ধটির জন্যে। ভারতীয় সঙ্গীতের গায়ন ও নানা যন্ত্রের বাদন পদ্ধতি, স্বর সাধনা, পাখোয়াজ ও তবলায় বিভিন্ন তালের ঠেকা ইত্যাদি বিবিধ ক্রিয়াংশের পরিচয় তিনি দিয়েছেন স্বরলিপির সাহায্যে। যে সব গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে যদু ভট্টের 'বিপদ ভয় বারণ যে করে ওরে মন' (ছায়ানট, ঝাঁপতাল) এবং (ভৈরব রাগের সার্গম দেবার পর) রবীন্দ্রনাথের 'তুমি কি গো পিতা আমাদের' গানখানির প্রথম দু কলির স্বরলিপিও পাওয়া যায়।

'সঙ্গীত কল্পতরু' পুস্তকের দুটি অংশ। তার অন্যতম হলো, ভারতীয় সঙ্গীতের পরিচায়ক আলোচনা ও ক্রিয়াদি বিষয় সংবলিত ৯০ পৃষ্ঠা ব্যাপী উক্ত রচনা। 'সঙ্গীত ও বাদ্য' শিরোনামায় এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত আছে। অপরাংশে—বিভিন্ন বিষয় গানের সংকলন। এই গীত-সংগ্রহ, বইখানির তিন-চতুর্থ ভাগ। তার প্রায় সবই বাংলা গান, কিছু হিন্দী ভজন ও উর্দু গজলাদিও অন্তর্ভুক্ত। গানের বিষয় ও ভাব অনুসারে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত যথা—জাতীয় সঙ্গীত, ধর্মবিষয়ক সঙ্গীত, শ্যামবিষয়ক সঙ্গীত, কৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত, বৈষ্ণবদিগের গান, বিবিধ ধর্মসঙ্গীত, খৃষ্টানী সঙ্গীত, মুসলমানী গান, পৌরাণিক সঙ্গীত, ঐতিহাসিক সঙ্গীত, প্রণয় সঙ্গীত, বিবিধ সঙ্গীত ও নানাবিষয়ক সঙ্গীত।

এই গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজ নরেন্দ্রনাথ করেছিলেন তাঁর গৃহী-জীবনের শেষভাগে। তার বয়স তখন বাইশ-তেইশ বছর (১৮৮৫-৮৬ সাল)। বইখানি ১৮৮৭ সালের মধ্যভাগে যখন প্রকাশিত হয় তখন নরেন্দ্রনাথ বরানগর মঠ নিবাসী। প্রকাশনা ও পুস্তকটির সঙ্গে তাঁর আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে এ সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায়—'Naren had even written an elaborate preface on the science and philosophy of Indian music, to a big book of Bengali songs. And this he did, solely to help a poor struggling publisher.' (P. 109, The Life of Swami Vivekananda, Vol. 1 (1912)—By his Eastern western disciples. Published by the Advaita Ashram, Mayavati). জীবনের যে দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল সন্ধিক্ষণে স্বামীজী এই রচনা ও সঙ্গীত-সংগ্রহটি সম্পন্ন করেন তা মহা বিস্ময়ের ব্যাপার। তাঁর তুল্য লোকোত্তর প্রতিভার পক্ষেই তা সম্ভব। পিতার মৃত্যুতে পারিবারিক বিপর্যয়ের মধ্যে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভাবে সন্ন্যাসের পথে যাত্রার প্রাক্কালে তিনি নিবিষ্ট হতে পেরেছিলেন এই বিষয়ে।

বইটি সম্বন্ধে পরের সংবাদ, প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হয় ও পরে তার তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত তার নাম থাকে 'বিশ্ব সঙ্গীত'। স্বামীজী রচিত প্রবন্ধটিও বর্জিত হয়। পুস্তকটির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হলো, কারণ স্বামীজীর এই রচনাটি তাঁর সমগ্র বাণী ও রচনা গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত নেই এবং অনেকের নিকটে বিষয়টি অজ্ঞাত। 'সঙ্গীতে কল্পতরু' সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য প্রমাণ এবং স্বামীজীর সঙ্গীত জীবনের সম্পূর্ণ বিবরণ বর্তমান লেখকের 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু' পুস্তকে প্রাপ্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তিরোভাবের পরেও বিভিন্ন পর্যায়ে, বরাহনগর মঠে, পরিব্রাজক জীবনের নানা সময়ে, লণ্ডন প্রবাসে, বেলুড় মঠে অন্তপর্বেও তাঁর গান গাইবার প্রসঙ্গ বইটিতে বর্ণনা করা আছে। এখানে শুধু যোগ করা যায় একটি। যে রাত্রে স্বামীজী দেহত্যাগ করেন, সেদিন সকালেও তিনি গান গেয়েছিলেন বেলুড় মঠে।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে শ্রীম. নরেন্দ্রনাথের গান প্রথম শোনেন। সে সম্পর্কে গুপ্ত মহেন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করে উপসংহার করা হবে স্বামীজীর সঙ্গীত প্রসঙ্গ।

সেদিন শ্রীম-র ঠাকুরকে তৃতীয় দর্শন (৫ মার্চ, ১৮৮২)। শ্রীরামকৃষ্ণের গান তিনি প্রথম দর্শনের দিন যেমন, তেমনি তৃতীয় দিনেও শুনেছিলেন। তারপর ঐ দিনে শুনলেন নরেন্দ্রনাথের গান। দুই গীতিকণ্ঠের সমভাবে উল্লেখ করে শ্রীম. লিখেছেন, 'নরেন্দ্রনাথ গান করিতেছেন, দুই চারিজন ভক্ত দাঁড়াইয়া আছেন। মাস্টার···গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও কোথাও শুনেন নাই।'

শ্রীম-র এই উক্তি গুরুভ্রাতার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস কিংবা অব্যবসায়ীর অভিমত নয়। কারণ তিনি স্বয়ং গায়ক এবং সঙ্গীতের মর্মজ্ঞ। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান পার্ষদরূপে তাঁর গানের প্রসঙ্গটি উল্লেখণীয়। 'কথামৃত' রচয়িতার ঐতিহাসিক ভূমিকার বিষয়ে পূর্ব একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ঠাকুরের অতিশয় প্রিয় পাত্র. অন্তরঙ্গ শিষ্য ও সেবক গৃহী-সন্ন্যাসী শ্রীম.—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৫৪-১৯৩২)। এই অমর গ্রন্থাবলীতে লেখকের ব্যক্তিপরিচয় তিনি যেমন গোপন রাখতে প্রয়াসী, তেমনি গায়করূপেও। তবু গুপ্ত মহেন্দ্রের গায়ন গুণ মাঝে মাঝে ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গান গাইবার কথা। এমনই সঙ্গীতৈকপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁর কাছে কারুর গীতিকণ্ঠ রুদ্ধ থাকবার উপায় নেই। গায়করূপেও অবশ্য মহেন্দ্রনাথ আছেন 'মণি' ছদ্মনামের অন্তরালে।

তাঁর গানের উদাহরণ দেবার আগে বলে রাখা যায় যে, তিনি অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। ঠাকুর কিংবা সকলের সামনে গান গাইতে শ্রীম. বড়ই সঙ্কুচিত হতেন। এড়াতে

চাইতেন তাঁর অনুরোধও। আর যেহেতু সর্বদা ভক্তবৃন্দ পরিবৃত শ্রীরামকৃষ্ণ, তাই শ্রীম-র গানের চেয়ে না-গাইবার দৃষ্টান্তই বেশি। অথচ ঠাকুর তাঁকে গাইতেও বলতেন। না গাইলে ঠাকুর যে বিরক্ত হতেন, একথাও উল্লেখ করেছেন শ্রীম. নিজে। যেমন বলরাম মন্দিরে একদিনের কথা জানা যায়। দোতলার সেই বৈঠকখানায় তখন 'এক ঘর লোক।' তার মধ্যে ছিলেন গায়ক তারাপদ। ঠাকুর কিছুক্ষণ প্রসঙ্গ করার পর গান শুনতে চাইলেন। তারাপদ পর পর (এবং ঠাকুরের ফরমায়েসে) গাইলেন তিনখানি গান। তারপর—

'সকলে মাস্টারকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি একটি গান গাও। মাস্টার একটু লাজুক, ফিস ফিস করে মাপ চাহিতেছেন।

গিরিশ (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্যে)—মহাশয়! মাস্টার কোন মতে গান গাইছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—ও স্কুলে দাঁত বার করবে; গান গাইতে যত লজ্জা!

মাস্টার মুখটি চুন করে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন।' (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৯৪)। (মহেন্দ্রনাথ তখন ছিলেন বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান স্কুল, শ্যামপুকুর শাখার প্রধান শিক্ষক)।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম যেদিন মাস্টার মশায়ের গানের কথা শোনেন সে উল্লেখও করেছেন শ্রীম.।

ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরের কক্ষে আছেন। রাম দত্ত, তারক ঘোষাল, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি উপস্থিত। তখন কথা হচ্ছিল তাঁদের গান বাজনা শেখার বিষয়ে। নিত্যগোপাল, রাম দত্ত, তারকের শিক্ষার কথায়—

'শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—তুমি নাকি গান শিখেছ?'

(গুপ্ত মহেন্দ্রনাথের যেমন বিনীত স্বভাব, সেইভাবে উত্তর দিলেন—)

'মাস্টার (সহাস্যে)—আজ্ঞে না; অমনি উঁ আঁ করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ওটা অভ্যাস আছে? থাকে ত বল না। 'আর কায নাই জ্ঞান বিচারে, দে মা পাগল করে।'

অর্থাৎ যদি ওই গানটি শ্রীম-র জানা থাকে, ঠাকুর শুনতে ইচ্ছুক।

কিন্তু তিনি সেদিন পাশ কাটিয়ে আত্মগোপন করলেন। তবে নিতান্তই যে তিনি 'উঁ আঁ' করেন না, রীতিমত গায়ক, তার নিদর্শন আছে নানাদিনের বিবরণে। সঙ্কোচ স্বভাব সত্ত্বেও ঠাকুরের কথায় তাঁকে গান শোনাতে হয়েছে।

গুপ্ত মহেন্দ্রের তেমনি কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখনীয়।

গুপ্ত মহেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ আরো বেশি পাওয়া যায় তাঁর পরিণত বয়সে। তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে ঋষিতুল্য জীবন যাপন করছেন। নানা ভক্তজন ও জিজ্ঞাসু

ব্যক্তি তাঁর নিকটে উপনীত হন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী এবং জীবনের পরিচয় লাভ করতে। শ্রীম. অক্লান্তভাবে গুরু প্রসঙ্গ করেন, গুরু নির্দেশিত পথের সন্ধান দেন। মহেন্দ্রনাথের সেই দীর্ঘদিনের আলোচনাবলী ও সৎকথার আনুপূর্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, শ্রীম. রচিত 'কথামৃত' গ্রন্থাবলীরই আদর্শে, নির্ভরযোগ্য দিন-লিপির আকারে। সেই সুদীর্ঘ রচনাবলী স্বামী নিত্যাত্মানন্দ পরে 'শ্রীম দর্শন' নামে ষোল খণ্ডের পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থাবলীতে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শিষ্যবৃন্দ সম্পর্কে কিছু অপ্রকাশিত তথ্যও পাওয়া গেছে মহেন্দ্রনাথ প্রমুখাৎ। আর এই ষোল পর্বের পুস্তকমালায় 'শ্রীম.'র নানা দিনে গান গাইবার বিবরণও আছে। সেই সব গান তিনি গেয়েছেন বৃদ্ধ বয়সে। সুতরাং তাঁর সঙ্গীতচর্চা জীবনের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত বর্তমান ছিল। আরো দেখা যায় যে, প্রথম জীবনের লাজুক স্বভাব, সকলের সামনে গান গাইতে সঙ্কোচ ইত্যাদি ছিল না পরিণত বয়সে। 'শ্রীম. দর্শন' গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে গুপ্ত মহেন্দ্রনাথের বহু গান গাইবার কথা ব্যক্ত আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর অনেক প্রিয় গানই গেয়েছেন শ্রীম., বৃদ্ধ বয়সেও। তাঁর প্রথম জীবনের শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর স্মৃতির তুল্য তাঁদের গাওয়া গীতাবলীও মহেন্দ্রনাথের চিত্তে চির জাগরূক ছিল। তিনি সুদীর্ঘকাল পরেও উত্তর সাধকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সেইসব গান। বাহুল্য বোধে শ্রীম-র সেই পরিণত কালের সঙ্গীত প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করা হলো না।

সেদিন শ্যামপুকুর বাড়িতে অনেকে ছিলেন রামকৃষ্ণের কাছে। চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল, অধ্যাপক নীলমণি নাট্যাচার্য, গিরিশচন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, লাটু প্রভৃতি। খানিক কথাবার্তার পর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল গান শুনতে চাইলেন। ঠাকুর তখন গাইতে আদেশ করলেন শ্রীম. ও অন্য একজন ভক্তকে।

গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে চারখানি রামপ্রসাদী গীত শোনালেন। সবগুলিই শ্রীরাম-কৃষ্ণের অতি প্রিয়—

(১) মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, উন্মত্ত আঁধার ঘরে···

(২) কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন···

(৩) মন রে কৃষি কায জাননা, এমন মানব জমিন রইল পড়ে···

(৪) আয় মন বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতরু মূলে চারি ফল কুড়ায়ে লবি···

যে রাত্রে কালীপূজা। ঈশ্বর প্রসঙ্গে ও সঙ্গীতে ঠাকুরের সান্নিধ্যে তাঁরা রইলেন রাত নটা পর্যন্ত।

আরো ছ খানি গান শ্রীম. ভক্তদের সঙ্গে সেদিন গাইলেন—

'মণি গাইতেছেন ভক্তসঙ্গে—

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি ॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।
কারে দাও মা ইন্দ্রত্ব পদ, কারে কর অধোগামী ॥
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী।
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি ॥···

গান— তোমারি করুণায় মা, সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে ॥
তুমি মঙ্গল নিধান, করিছ মঙ্গল বিধান।
তবে কেন বৃথা মরি ফলাফল চিন্তা করে ॥···

গান— গো আনন্দময়ী হয়ে মা, আমায় নিরানন্দ ক'রোনা···

গান— নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি···

গান— কখন্ কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী···

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর আবার আদেশ করিতেছেন—

গান— শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা··· (তৃতীয় ভাগ পৃঃ ২৪১)

এইভাবে সেদিন শ্রীম. দশখানি গান গেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে। এত বেশি সংখ্যক গান শোনাবাব দৃষ্টান্ত একবার শুধু নরেন্দ্রনাথের দেখা গিয়েছিল।

আরেক দিনের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখে দক্ষিণেশ্বরে ফিরছেন। গাড়িতে তাঁর সঙ্গে আছেন সিঁথির মহেন্দ্র মুখুজ্যে, শ্রীম. ও আরো কজন ভক্ত। 'ঠাকুর আনন্দে যাইতেছেন ও গান আরম্ভ করিলেন—

গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পরম দয়াল হে প্রভু,
(আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ)···

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন—

আমি গিয়েছিলাম কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলেন কাশী বিশ্বেশ্বরে,
ও সে পরব্রহ্ম শচীর ঘরে (আমি চিনেছি হে, পরব্রহ্ম)···'

সেদিন অধরলালের বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে। বৈষ্ণবচরণ কীর্তনীয়া তাঁর অনুরোধে গাইছেন—

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়···

'গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর গৌরাঙ্গের ভাবে নিজে গান ধরলেন—

ভাব হবে বৈকি রে!
ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব হবে বৈকি রে!

ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়।

বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে; সমুদ্র দেখে যমুনা ভাবে!

যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গৌর (ভাব হবে)।

গোরা ফুকরি ফুকরি কান্দে, গোরা আপনার পায় আপনি ধরে।

বলে কোথা রাই প্রেমময়ী।

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন।'…

অন্য একদিন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে সঙ্গীতের পালা চলেছে। নরেন্দ্র গাইলেন দুখানি দীর্ঘ গান—

(১) এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান কর হে…

(২) চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে…

(সেই সঙ্গীতের পরিমণ্ডলে)—

'ঠাকুর নাচিতেছেন। বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন, সকলে কীর্তন করিতেছেন আর নাচিতেছেন। খুব আনন্দ। গান হইয়া গেলে ঠাকুর নিজে আবার গান ধরিলেন—

শিব সহে সদা রঙ্গে আনন্দ মগনা…

মাস্টার সঙ্গে গাহিয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বড় খুশি।

'গান হইয়া গেলে ঠাকুর মাস্টারকে সহাস্যে বলিতেছেন, বেশ খুলি হতো, তাহলে আরও জমাট হতো। তাক তাক তা ধিনা, দাক দাক দা ধিনা, এইসব বোল বাজবে।

কীর্তন হইতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।' (কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৪৫-২৪৬)।

দক্ষিণেশ্বরেই আরেকদিনের কথা। শ্রীম, তখন এখানে পঞ্চবটীর ঘরে রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে যেমন তিনি কখনো কখনো থাকতেন, সাধন ভজন ধ্যানাদির জন্যে।

'শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর ঘরে থাকিতে বলিয়াছেন। মণি ঐ ঘরে রাত্রিবাস করিতেছেন। প্রত্যুষে ঐ ঘরে একাকী গান গাহিতেছেন—

গৌর হে আমি সাধন-ভজন-হীন,

পরশে পবিত্র করো আমি দীনহীন॥

চরণ পাবো পাবো বলে হে,

(চরণ তো আর পেলাম না, গৌর!)

আমার আশায় আশায় গেল দিন!

হঠাৎ জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। 'পরশে পবিত্র করো আমি দীন হীন!' এইকথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে।

আবার একটি গান হইতেছে—

আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
আমি যোগিনীর বেশে যাবো সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রাখাল বেড়াইতেছেন।'

বলা বাহুল্য, ওই যে 'আবার একটি গান হইতেছে' সে কীর্তনটিরও গায়ক মহেন্দ্রনাথ। ঠাকুরের সেই ঘরে তাঁর আরো একদিন গানের বিবরণ আছে। এবারেও কীর্তন। এইদিনে তাঁর গান শুনে বিশেষ আনন্দিত হন রাখাল মহারাজ। দেখা যায়, শ্রীম. আপনার ভাবে যখন গান গেয়েছেন তাঁর বাহন হয়েছে কীর্তন। তাঁর প্রকৃতিতে ভক্তি প্রবণতা। ঠাকুর তা লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন বলেওছিলেন মহেন্দ্রকে— 'আমি তোমার চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ শুনেই তোমায় চিনেছি।'……

দক্ষিণেশ্বরে কয়েকজনের সামনে শ্রীম. সেদিন (১৮৮৪, জানুয়ারী ৫) গাইছেন— 'পঞ্চবটী ঘরে শ্রীযুক্ত রাখাল আরও দু একটি ভক্ত মণির কীর্তন গান শুনিতেছেন—

গান— ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়···

রাখাল গান শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বাবুরাম, হরিশ—।

রাখাল—ইনি আজ বেশ কীর্তন করে আনন্দ দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া গান গাহিতেছেন—

বাঁচলাম সখি শুনি কৃষ্ণনাম,
(ভাল কথায় মন্দও ভাল)।···'

তারপর মহেন্দ্রনাথকে নির্দেশ দিলেন, আরো কি গান গাইবেন।

'(মণির প্রতি)—এইসব গান গাইবে—সব সখি মিলি বৈঠল (এই ত রাই ভালো ছিল)। (বুঝি হাট ভাঙল)।

আবার বলিতেছেন, 'এই আর কি !—ভক্তি, ভক্ত, নিয়ে থাকা।'

ভক্ত মহেন্দ্রনাথের ভক্তির গান শুনেই হয়ত ঠাকুরের মনে ওই ভাব জেগেছিল।

শ্রীম-র আরেকদিন গানের কথা জানা যায় গুরুর সঙ্গে, যুক্তভাবে। তবে দক্ষিণেশ্বরে নয়। পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে, ঠাকুরের গৃহী-ভক্ত যদুলাল মল্লিকের ভবনে। সেদিন এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন। সঙ্গে মাস্টারমশায়, আরেকজন ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রভৃতি।

খানিক পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া হলো অন্দরমহলে।

তখন দেবেন্দ্রনাথের সামনে গুপ্ত মহেন্দ্র আপন ভাবে গান ধরলেন—

'আমার গোরার সঙ্গী হয়েও ভাব বুঝতে নারলুম রে।
গোরা বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে।
গোরা কার ভাবেতে মাতোয়ারা,
(ভাব বুঝতে নারলুম রে)।'

গান চলেছে। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত হলেন সেখানে। আর শ্রীম-র গানের সঙ্গে যোগ দিলেন—

গোরা বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে…'

তাঁদের সম্মিলিত কণ্ঠে সম্পূর্ণ হলো কীর্তনটি। (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, পৃঃ ৩৪০-৪১ —স্বামী গম্ভীরানন্দ)।

ঠাকুরের পরম গৃহী-ভক্ত উক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৪৪-১৯১১) একটি প্রসঙ্গও যোগ করা যায় এখানে : 'ঠাকুর অঙ্গুলি দ্বারা দেবেন্দ্রের জিহ্বায় কি যেন লিখিয়া দিলে দেবেন্দ্রের বিশ্বাস জন্মিল যে, ঠাকুর তাঁহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন।'

(ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪২)।

শ্রীম-র কণ্ঠস্বর মিহি, অর্থাৎ পুরুষোচিত নয়। সেজন্যে, ঠাকুর একদিন তাঁর গানের বিষয়বস্তু প্রস্তাব করলেন—

'পঞ্চবটী মূলে মণিকে আবার বলিতেছেন—'তোমার মেয়ে সুর—এই রকম গান অভ্যাস করতে পার ?—সখি সে বন কত দূর।—যে বনে আমার শ্যামসুন্দর।'…

(কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৫৯-৬০)

গানের বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণ আরেকদিনও বলে দেন মহেন্দ্রনাথকে। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সেই কক্ষে। আর সঙ্গীত উপলক্ষ্যে একটি অতি গভীর তত্ত্বও প্রকাশ করেন। যেমন সহজভাবে তিনি নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ করতেন ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে, সেদিন তেমনি গানের মাধ্যমে যোগ সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন গুপ্ত মহেন্দ্রকে। নিজেই শ্রীম. সেদিনের (২৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৩) বিবরণ দিয়েছেন—

'সন্ধ্যার পর ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।…যোগের বিষয়—ষট্‌ চক্রের বিষয়—কথা কহিতেছেন। শিব সংহিতায় সেই সকল কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—সুষুম্নার ভিতর সব পথ আছে—চিন্ময়। যেমন মোমের গাছ—ডাল পালা ফল—সব মোমের। মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছে। চতুর্দল পদ্ম। যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি

রূপে আছেন। যেমন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলিনী পাকিয়ে রয়েছে। 'প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার পদ্মবাসিনী।'

তারপর মহেন্দ্রনাথকে বললেন—ভক্তিযোগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়—

'কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে ভগবান দর্শন হয় না। গান করে করে একাগ্রতার সহিত গাইবে—নির্জনে গোপনে—

জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী! তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী,

প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার পদ্মবাসিনী।'

গান গেয়েই পরক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত সম্পর্কে নিজের চূড়ান্ত ধারণা সুস্পষ্ট ব্যক্ত করলেন, রামপ্রসাদের কথায়—

'গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়।'

(কথামৃত, চতুর্থ ভাগ পৃঃ ৫০)।

মহেন্দ্রনাথকে তাঁর গানের বিষয় নির্দেশ করার আরো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে রয়েছেন রাখাল, হাজরা, শ্রীম. প্রভৃতি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্তি ও বৈরাগ্যের কথা উঠল। তার থেকে অন্য প্রসঙ্গ হয়ে, শেষ পর্যন্ত—গানের বিষয় আর ভাবের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন মহেন্দ্রনাথকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গান তো সুরে ছন্দে ঈশ্বর প্রসঙ্গ করা। এক এক ভাবের গানে এক এক রকমে ঈশ্বরীয় আস্বাদ গ্রহণ। তাঁর 'পাঁচ রকম করে মাছ খাওয়া।' সে-দিন তেমনি বলছিলেন কীর্তন গান, ভক্তি ভাব, নিজের সমাধি অবস্থাদি সম্পর্কে।

'শ্রীরামকৃষ্ণ—সমাধি, ভাব, প্রেমের বটে। ওদেশে (শ্যামবাজারে) নটবর গোস্বামীর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল—শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের দর্শন করে সমাধিস্থ হলাম!···

জোড়াসাঁকো হরিসভায় ঐরূপ কীর্তনের সময় সমাধি হয়ে বাহ্যশূন্য। সেদিন দেহ-ত্যাগের সম্ভাবনা ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তর ঐ গোপীপ্রেমেরই কথা বলিতেছেন।

(মণি প্রভৃতির প্রতি)—গোপীদের ঐ টানটুকু নিতে হয়।

এই সব গান গাইবে—

সখি, সে বন কতদূর

(যেখানে আমার শ্যামসুন্দর)

(আর চলিতে যে নারি!)

গান— ঘরে যাবই যে না গো!

যে ঘরে কৃষ্ণ নামটি করা দায়। (সঙ্গিনীরা)

জীবনের শেষ পর্বেও শ্রীম-কে গানের কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

তখন তিনি কাশীপুর বাগানবাড়িতে আছেন। তিরোভাবের মাত্র চার মাস আগেকার কথা। ১৮৮৬, এপ্রিল ২১।

রাত প্রায় ন'টা। দোতলার বড় ঘরে ঠাকুর রয়েছেন। তাঁর পশ্চিম দিকে, বাগানের পুকুর।

'এই পুষ্করিণীটির চাতালে কয়েকটি ভক্ত খোল করতাল লইয়া গান গাইতেছেন। ঠাকুর লাটুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—'তোমরা একটু হরিনাম কর।'

মাস্টার, বাবুরাম প্রভৃতি এখনও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহারা শুনিতেছেন, ভক্তেরা গাইতেছেন—

হরি বোলে আমার গৌর নাচে।

ঠাকুর শুনিতে শুনিতে বাবুরাম, মাস্টার প্রভৃতিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—তোমরা নীচে যাও। ওদের সঙ্গে গান কর,—আর নাচবে।

তাঁহারা নীচে আসিয়া যোগদান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার লোক পাঠাইয়াছেন। বলেছেন, 'এই আখরগুলি দেবে—'গৌর নাচতেও জানে রে! গৌরের ভাবের বালাই যাই রে! গৌর আমার নাচে দুই বাহু তুলে।'… (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৯২)।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরেও মহেন্দ্রনাথের গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম মঠ গড়ে উঠেছে বরানগরের বাসাবাড়িতে। ঠাকুরের আদর্শ গৃহী শিষ্য শ্রীম. সঙ্ঘেরও অতি ঘনিষ্ঠ অনুগামী। সন্ন্যাসী গুরু-ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ। মঠে মাঝে মাঝেই আসা যাওয়া ও সাধ্য মতন পোষকতাও করেন। কখনো এখানে রাত্রি বাসও করে যান ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যদের সঙ্গে সাধন ভজনের উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং জানিয়েছেন, 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের হৃদয়ে কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইতেছেন তাহা দেখিতে মণি মাঝে মাঝে মঠ দর্শন করিতে যান।'…

একদিন বরানগর মঠে এসে—

'মাস্টার ভাবিতেছেন, 'ঠাকুর মঠের ভাইদের কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এঁরা কেমন ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল। স্থানটি যেন সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। মঠের ভাই-গুলি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। ঠাকুর বেশি দিন চলিয়া যান নাই ; তাই সেই সমস্ত ভাব বজায় রহিয়াছে!

সেই অযোধ্যা! কেবল রাম নাই!'…

তখনকার একদিনের কথায় শ্রীম. লিখেছেন—

'নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা মঠে আসছেন। শরৎ, বাবুরাম ও কালী শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছেন। নিরঞ্জন মাকে দেখিতে গিয়াছেন। মাস্টার আসিয়াছেন।…

মণি ও রবীন্দ্র মঠের এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। মণি বুদ্ধদেবের গল্প করিতেছেন।...আজকাল মঠে বুদ্ধচরিত ও চৈতন্যচরিতের আলোচনা সর্বদাই হয়। মণি সেই গান গাহিতেছেন—

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই॥...

(কথামৃত, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৫৭)

শ্রীম-র গীতিকণ্ঠের বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'তোমার মেয়ে স্বর।' অর্থাৎ মিহি বা সরু গলা। মহেন্দ্রনাথের মিহি আওয়াজের পরিচায়ক আরেকটি সমসাময়িক বিবৃতি উদ্ধৃত করে তাঁর প্রসঙ্গে ছেদ টানা হবে।

এটি দিয়েছেন দত্ত মহেন্দ্রনাথ স্বামীজীর দ্বিতীয় অনুজ। শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে প্রথম আলাপের পর নরেন্দ্রনাথ ও গুপ্ত মহেন্দ্রনাথের মধ্যে বিশেষ প্রীতি, ঘনিষ্ঠতার সূচনা হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন নরেন্দ্রনাথের গৃহে। তখন তাঁদের একযোগে সঙ্গীতও হতো। সেই ৩ সংখ্যক গৌরমোহন মুখুজ্জে স্ট্রীটের বাইরেকার ঘরে। তার শ্রোতা, দত্ত মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে উল্লিখিত আছে শ্রীম-র গান গাওয়া তথা সঙ্গীত কণ্ঠের কথা:

'মাস্টার মশায়ের বাড়ি অনতিদূরে, এইজন্য মাস্টার মশায় নরেন্দ্রনাথের কাছে সর্বদাই আসিতেন এবং বাহিরের ঘরটিতে তক্তাপোষের উপর বসিয়া দুজনে ভজন গান সুরু করিতেন। নরেন্দ্রনাথের গলার স্বর মোটা ও খাদে, মাস্টারের গলার স্বর মৃদু ও ললিত, অর্থাৎ একজনের হইল 'খাদ সুর' অপরের হইল 'মেয়েলী সুর।' দুইজনের কণ্ঠস্বর মিশ্রিত হইয়া এক মধুর শব্দ নিঃসৃত হইত এবং তক্তাপোষ থাপড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ তাল দিত।' (পৃঃ ১০, মাস্টার মশায়ের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত)। গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ সেখানে শুধু ভজন গাইতেন না। জয়দেবের গীতগোবিন্দ পদাবলীও যে গেয়েছেন, তাও জানিয়েছেন দত্ত মহেন্দ্রনাথ।

শ্রীম-র তুল্য মিহি গীতকণ্ঠের অধিকারী শরৎ মহারাজ অর্থাৎ সারদানন্দ স্বামী (১৮-৬৫-১৯২৭)। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সেবক এবং প্রিয় ত্যাগী, সন্ন্যাসী শিষ্য। পূর্বাশ্রমে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী—তাঁর নানা গুণের একটি হলো, সঙ্গীত গুণ। অতি তরুণ বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে যখন আসেন তখনই তিনি গায়ক। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক প্রধান সংগঠকরূপে তাঁর ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। স্বামীজীরই আহ্বানে তিনি লণ্ডনে গিয়েছিলেন গুরুর বাণী প্রচারের ভারপ্রাপ্ত হয়ে। স্বামীজীর প্রস্তাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

ও মিশনের প্রথম সম্পাদক হন স্বামী সারদানন্দ। আর দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবত সেই কর্তব্য পালন করেন একান্ত নিষ্ঠায়। উদ্বোধন মঠের প্রতিষ্ঠানে এবং সেখানে শ্রীমা সারদাদেবীর একনিষ্ঠ সেবক, স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পরে। তাঁর সম্পর্কে সারদাদেবীর স্মরণীয় উক্তি : 'শরতের দিল্ দেখলে ? নরেনের পর এতবড় প্রাণ আর পাব না।' শ্রীরামকৃষ্ণের তথ্যপূর্ণ, বিস্তৃত জীবনী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' স্বামী সারদানন্দরে অন্যতম অক্ষয় কীর্তি।

বিরাট কর্মজীবনের মাঝে মাঝেও তাঁর সঙ্গীত প্রসঙ্গ বিদ্যমান থেকেছে। ১৯০৩ সালে 'উদ্বোধন' ভবন নির্মাণ করে সারদানন্দ তার দোতলায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'ঠাকুর ঘর' ও শ্রীমা-র আবাস। তারপর শ্রীমাকে নিয়ে এলেন সেই নতুন গৃহে। এখানে স্বামী সারদানন্দকে ভজন-গায়ক ও গীত-শিক্ষকরূপে দেখা যায়। 'এই বাটীতে মায়ের আদেশে সন্ধ্যারতির পরে তিনি প্রায়ই ভজন গান করিতেন। এতদ্ব্যতীত কেহ কেহ তাঁহার নিকট সঙ্গীতশিক্ষাও করিত।' (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মালিকা, পৃঃ ৩২৯—স্বামী গম্ভীরানন্দ)।

বাগবাজারের উদ্বোধন মঠে গান গাওয়া বা মঠের ভাইদের গান শেখানো তাঁর উত্তরকালের কথা। সতের-আঠার বছর বয়সে যখন প্রথম তিনি ঠাকুরের কাছে আসতেন, তখন থেকেই শরৎ মহারাজের গায়ক পরিচয়।

শরৎচন্দ্রের গান শেখার কথা ও তাঁর সঙ্গীত শিক্ষকের নাম জানা যায় দত্ত মহেন্দ্রনাথের বিবরণে :

'শরৎ মহারাজ বাগবাজারের রাখাল হালদার অর্থাৎ হালদার মহাশয়ের ভাইয়ের কাছে মাস ছয়েক সঙ্গীত শিখিয়াছিলেন।' (শ্রীমৎ সারদানন্দস্বামীর জীবনের ঘটনাবলী, পৃঃ ২৯—মহেন্দ্রনাথ দত্ত)।

আর নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বেশি ঘনিষ্ঠতার এক উপলক্ষ্যও হয়, সঙ্গীত।

পরে গায়ক শরৎচন্দ্রকে তবলায় ঠেকা দিতে শেখান নরেন্দ্র। শরৎ সেসময় প্রায়ই নরেন্দ্রের বাড়ি আসতেন এবং দুজনের গান হতো। একদিন নরেন্দ্রকে গাইতে বললেন। নরেন্দ্রও রাজি হয়ে তানপুরা বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'তুই বাঁয়াটা নে।' শরৎ জানালেন, 'আমি তবলা বাজাতে জানিনা।' নরেন্দ্র তখন মুখে তবলার বোল শোনাতে লাগলেন আর তাঁকে কয়েকটি ঠেকা দিতে শেখালেন। তারপর দুজনের 'গান ও বাদ্য চলিতে লাগিল। শুধু গান অবলম্বনেই যে উভয়ের মিলন হইত তাহা নহে।'

(শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, পৃঃ ৩০৮-স্বামী গম্ভীরানন্দ)।

তারপর থেকে অনেকদিন শরৎ তবলায় ঠেকা দিয়েছেন নরেন্দ্রের গানের সঙ্গে। আবার নিজেও গান গেয়েছেন। কিন্তু সঙ্গীতের মাধ্যম ভিন্নও তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল

নিবিড়। শ্রীরামকৃষ্ণ তা সানন্দে লক্ষ্য করেছিলেন। আর স্বভাবসিদ্ধ সকৌতুক বাক-পটুত্বে সেকথা প্রকাশ করেন আশ্চর্য সহজ উপমা যোগে। হাঁড়ির মুখে সঠিক মাপের সরা যেমন : 'গিন্নী জানে, কোন্ হাঁড়ির মুখে কোন্ সরা রাখতে হয়।'

পরবর্তীকালে, স্বামীজীর আহ্বানে প্রতি দায়িত্ব-ভার স্বামী সারদানন্দ যথাসাধ্য বহন ও সম্পন্ন করেছেন। আর বলেছেন, 'স্বামীজীর আদেশ।'

সঙ্গীত বিষয়ে তিনি শুধু যে উদ্বোধন মঠেই শিক্ষা দিতেন, তা নয়। তার অনেক বছর আগে, প্রথম মঠ বরানগরেও সারদানন্দকে সঙ্গীত-শিক্ষকের ভূমিকায় দেখা যায়। তারও উল্লেখ আছে 'কথামৃত'তে।

বরানগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের সাধন-ভজন ঈশ্বর প্রসঙ্গ প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পরিচয় দিয়ে, শ্রীম. লিখেছেন—'দানাদের ঘরে বসিয়া নরেন্দ্র তাঁহার দেব-দুর্লভ কণ্ঠে ভগবানের নামগুণ গান করেন। শরৎ অন্যান্য ভাইদের গান শিখাই-তেন।' (দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট পৃঃ ২৫১)।

তাঁর একদিন গানের উল্লেখও আছে বরানগর মঠে। তা হলো, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এই প্রথম মঠ স্থাপিত হবার পাচ মাস পরের কথা। সেদিন শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে 'মঠের ভাইয়েরা উপবাস করিয়া আছেন। ঘরে এখন নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাবুরাম, তারক, হরিশ, সিঁথির গোপাল, শারদা, মাস্টার আছেন। যোগীন, লাটু শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। তাঁহারা এখনও মঠ দেখেন নাই।

আজ সোমবার, শিবরাত্রি, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭। আগামী শনিবারে শরৎ, কালী, নিরঞ্জন, শারদা, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থ পুরীধামে যাত্রা করিবেন।

শ্রীযুক্ত শশী দিনরাত ঠাকুরের সেবা লইয়া আছেন।

পূজা হইয়া গেল। শরৎ তানপুরা লইয়া গান গাইতেছেন—

শিব শঙ্কর বম্ বম্ (ভোলা), কৈলাসপতি মহারাজরাজ।
উড়ে শৃঙ্গ কি খেয়াল, গলে ব্যাল মাল,
লোচন বিশাল, লালে লাল ;
ভালে চন্দ্র শোভে, সুন্দর বিরাজে।' (চতুর্থ ভাগ পৃঃ ২৯৫-২৯৬)

শরৎ মহারাজের গীতিকণ্ঠ নিয়ে আরম্ভ করা হয়েছিল তাঁর গানের প্রসঙ্গ। এখন তা শেষও করা হবে সেই কথায়।

বরাহনগর মঠে সেদিন রাত্রিবেলা তিনি গান গাইছিলেন। তাঁর সঙ্গীত কণ্ঠের ছলনায় পাড়ার কটি কুৎসা-প্রিয় লোক কেমন অপ্রস্তুত হয় তারই বৃত্তান্ত :

'তাঁহার গলার স্বর নারীজনোচিত কোমল ছিল। তিনি যখন গান গাহিতেন তখন দূর হইতে বামাকণ্ঠ বলিয়া ভ্রম হইত। একদা রাত্রে তিনি বরাহনগর মঠে গান

ধরিয়াছেন, এমন সময় পল্লীতে কেহ কেহ স্থির করিলেন যে মঠে নিশ্চয়ই নারীর আগমন হইয়াছে। তাঁরা তখন ভণ্ড তপস্বীদের সরেজমিনে শিক্ষা দিতে এলেন প্রস্তুত হয়ে। কিন্তু—'সঙ্গীতসভায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন হইলেন।' (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, পৃঃ ৩১৩—স্বামী গম্ভীরানন্দ)।

শ্রীরামকৃষ্ণের আর একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী শিষ্য শিবানন্দ।

পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে অন্যতম নেতৃস্থানীয় তিনি। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় সভাপতিরূপে দায়িত্ব পালন করেছিলেন দীর্ঘকাল। স্বামী শিবানন্দ পূর্বাশ্রমে বারাসাতের তারকনাথ ঘোষাল (১৮৫৪/১৩৩৪)। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যবৃন্দের মধ্যে, একমাত্র অদ্বৈতানন্দ ভিন্ন, সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ তারক মহারাজ। বরানগর মঠ স্থাপনা থেকেই তিনি মঠ নিবাসী। গৃহত্যাগ করেছিলেন তারও আগে। তখন গৃহ-ত্যাগের পর তারক মহারাজ রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে অনেকদিন থেকেছেন।

তারক মহারাজ ঠাকুরের কাছে উপনীত হবার আগে থেকেই গায়ক। গুরুর সান্নিধ্যে তো বটেই, পরে সন্ন্যাস জীবনেও তিনি সঙ্গীত বর্জিত হন নি। সমকালীন নানা বিবরণে পাওয়া যায় তাঁর গান গাইবার উল্লেখ। দেখা যায়, ভক্তিভাবের সঙ্গীত তাঁর প্রিয় ছিল।

প্রথম জীবনে তারকানাথও ছিলেন ব্রাহ্মসমাজে। তখন ব্রহ্মসঙ্গীত তিনি বেশির ভাগ গাইতেন। সেকথা জানিয়েছেন দত্ত মহেন্দ্রনাথ,—'তারকনাথও বিশেষরূপে ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারকনাথ নিজ মনে সর্বদাই ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতে ভাল-বাসিত।'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, পৃঃ ২৫-মহেন্দ্রনাথ দত্ত)।

পরে তাঁর প্রবণতা দেখা যায় কীর্তনগানে। তা ভিন্ন, তিনি খোল বাজাতে শিক্ষা করছেন, এমন সংবাদও দিয়েছেন 'কথামৃত'-কার :—

'ঠাকুর মধ্যাহ্নে সেবার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। কলিকাতা হইতে রাম, তারক (শিবানন্দ) প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা মেঝেতে বসিলেন। মাস্টারও মেঝেতে বসিয়া আছেন। রাম বলিতেছেন, 'আমরা খোল বাজনা শিখিতেছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—নিত্যগোপাল বাজাতে শিখেছে?

রাম—না, অমনি একটু সাম'ন্য বাজাতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তারক?

রাম—সে অনেকটা পারবে।'...

বরানগর মঠেও তারক মহারাজের গান গাইবার কথা জানা যায় একদিন। স্বামীজী

রচিত শিবের গানখানি তিনি সেদিন গেয়েছিলেন। এই বিবৃতিও শ্রীম-র দেওয়া :—
মাস্টার বেলা নয়টার সময় মঠে উপনীত হইয়াছেন। দানাদের ঘরে প্রবেশ করিলে পর তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীযুক্ত তারক আনন্দে শিবের গান ধরিলেন—

'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা।'

তাঁহার গানের সহিত রাখালও যোগ দিলেন। আর গান গাহিয়া দুইজনেই নৃত্য করিতেছেন। এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন।

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বববম্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে দুলিছে কপাল মাল॥
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল-ত্রিশূল রাজে।
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক ভাল॥'...

(চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৯৫)।

বিদ্যাপতির পদও একদিন শিবানন্দের গাইবার প্রসঙ্গ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তিরোধানের কিছুকাল পরে এবং তাঁকেই বাহ্য দৃষ্টিতে না দেখার আকুলতায় সেই গান—
'ঠাকুরের অদর্শনে বিরহ তাপিত স্বামী শিবানন্দ এক বর্ষাকালে আকাশে বাতাসে বিরহ ঢালিয়া গান ধরিলেন—

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী মালা॥'...

তাঁর সঙ্গীত বিষয়ে আরো জানা যায় স্বামী গম্ভীরানন্দের গ্রন্থে—'ভজনাদিতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন'—অর্থাৎ ভজন গানেও সুপটু। (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, পৃঃ ২৬৯—স্বামী গম্ভীরানন্দ)।
'হরি গেও মধুপুর' পদটি তারক মহারাজের গাইবার বিবরণ দিয়েছেন দত্ত মহেন্দ্রনাথও। সেই সঙ্গে তাঁর আরো কোনো কোনো গানের উল্লেখ করেছেন—
'তাঁহার গলার স্বর অতি মিষ্ট ছিল। কালিদাস সরকার সন্ধ্যার সময় মাঝে মাঝে বলিতেন, 'তারক একটা ভজন গাওনা? তারক অতি মধুর কণ্ঠে অনেক সময় এই গানটা গাইতেন :—

মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
কেন ভ্রম অকারণে...'

একদিন বরাহনগর মঠে—'বড় ঘরটাতে তারকদা ও শরৎ মহারাজ আছেন।... দুজনের যেন মুখভাবে বিভোর ও বিষাদে পরিপূর্ণ, চক্ষুতে জল ভরে রয়েছে এবং গভীর চিন্তায় মগ্ন। খানিকক্ষণ পরে তারকদা বললেন, 'শরৎ, 'বাঁয়াটা পাড়ো তো,

ঠেকা দাও তো।'…তারকদা উঠে বসে গাইতে লাগলেন—

হরি গেও মধুপুর হাম কুল বালা,
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী মালা,
নয়নকো নিদ গেও বয়ানকে হাস,
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুখ মোরি পাশ্।…

তারকদা প্রাণের আবেগে এই বিষয়টি এমন সুন্দর গাহিতে লাগিলেন যে আমার পর্যন্ত মন দ্রব হয়ে গেল আর তারক ও শরৎ মহারাজের উভয়ের চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল—'নয়ন জলে নয়ন ভাসে।'…

দত্ত মহেন্দ্রনাথ আরো জানিয়েছেন,—'গিরিশবাবুর বুদ্ধদেব চরিতে যে বিখ্যাত গান —জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই—এইটি তারকদা ও মঠের প্রায় সকলেরই অতি প্রিয় ছিল। তারকদার মনটায় কিছু হইলেই বিভোর হইয়া এই গানটি গাইতেন এটা এমন মিষ্টি স্বরে তিনি গাইতে পারিতেন যে যতবারই শুনিতাম ততবারই ভাল লাগিত।' (মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান, পৃঃ ৯, ৪৭-৪৮, ৫০— মহেন্দ্রনাথ দত্ত)।

এমনিভাবে, শিবানন্দের নানা ধরনের গানের কথা জানা যায়। আর তাঁরও বিভিন্ন ভাবের গীত প্রসঙ্গ সারদানন্দের তুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরোক্ষ ভাবেও সম্পৃক্ত। স্বামী শিবানন্দের বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ জীবনী গ্রন্থ থেকে তাঁর আরো নানা দিনের সঙ্গীত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, বাল্যকাল থেকে সুপরিণত বয়স পর্যন্ত। বলা চলে, তাঁর গায়ক সত্তা জীবনের সর্ব পর্যায়েই প্রকাশমান ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় সন্তান রূপে মহাপুরুষ মহারাজও চিরদিন সঙ্গীত-শিল্পী। তাঁর প্রামাণিক চরিত-পুস্তক থেকে সে বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ কালানুক্রমিক উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো :—

'বালকের গলা বেশ মিষ্ট ছিল। তিনি শুনিয়া শুনিয়া অনেক ভজন গান শিখিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে উচ্চ ভাবোদ্দীপক শ্যামাসঙ্গীতাদি শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত।'

(মহাপুরুষ শিবানন্দ, পৃঃ ১০—স্বামী অপূর্বানন্দ প্রণীত)।

তাঁর জন্মস্থান চব্বিশ পরগণার বারাসত অঞ্চলের 'বড়া গ্রামটির প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অতি সুন্দর ছিল।…বালক তারকনাথ একান্তে দীঘির পাড়ে বসিয়া থাকিতেন, আর অনন্ত আকাশের পানে তাকাইয়া আপন মনে গান গাহিয়া সময় কাটাইতেন।'

(ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ১২)

তারপর, প্রথম যৌবনে তারকনাথ চাকুরি সূত্রে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ নিবাসী থাকেন কিছুকাল। 'গাজিয়াবাদে তিনি স্থানীয় এক উচ্চপদস্থ রেল কর্মচারীর সঙ্গে এক বাড়িতেই থাকিতেন এবং আপন ভাবে ধ্যান ও একতারা সংযোগে ভজন গানে

তন্ময় হইয়া যাইতেন। ঐ কর্মচারী হঠাৎ কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া মারা যান। নিকটস্থ নদী তীরে মৃতদেহ সৎকার কার্যাদি সমাপনান্তে তারকনাথ ফিরিয়া আসিয়া একতারা লইয়া গাহিতে লাগিলেন—

'দয়া ঘন তোমা হেন কে হিতকারী ;
সুখে দুঃখে সম বন্ধু এমন কে,
শোকতাপ ভয়-হারী ?' ইত্যাদি

গানটি গাহিতে গাহিতে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন।…' (তদেব, পৃঃ ১৫)

'মোগলসরাইয়ে তারকনাথ ভাবের সঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীতাদি গাহিতেন। তখন এই গানটি তাঁহার খুবই প্রিয় ছিল—

প্রেম পিঞ্জরে রাখ হে নাথ, বন্দী করে চিরদিন।
পোষা পাখি হয়ে থাকি, আর ডাকি তোমায় অনুক্ষণ।'

ইত্যাদি।' (তদেব, পৃঃ ১৬)।

পরবর্তীকালে, বারাণসীর 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম' স্বামী শিবানন্দেরই উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় লাক্‌সা মহল্লায়, ১৯০২ সালের ৪ জুলাই। সেটি তখন 'খাজাঞ্চি বাগিচা' নামে একটি পুরনো বাগানবাড়িতে ওই স্থানেই মাসিক দশ টাকায় ভাড়া নেওয়া ছিল। সে সময়ের কথা। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের (৫ জুলাই ১৯০২) অব্যবহিত পরে, তাঁর শোকে অভিভূত স্বামী শিবানন্দ—'তিনি আশ্রমে বেরুতেন না, সামনের রোয়াকেই সামান্য পায়চারি করিতেন আর আপন মনে মনে গুন গুন করে গান গাইতেন। সর্বদাই আপন ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন…'

(তদেব, পৃঃ ১২৬)।

কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী শিবানন্দ তখন সেবাশ্রমের কাজকর্ম পরিচালনা, অবৈতনিক পাঠশালা পরিদর্শন ইত্যাদি সবই করতেন। আবার,—'তাঁহার গভীর ভাবুকতা, নিঃসঙ্গ ধ্যানমগ্ন ভাব সকলের প্রাণের অন্তঃস্তল স্পর্শ করিত। অনেক সময় বিভোর প্রাণের অমৃত রস সিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে গাহিতে শোনা যাইত—

তুমি নাহি দিলে দেখা   কে তোমারে দেখিতে পায়।
তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায়॥
তুমি পূর্ণ পরাৎপর   তুমি অগম অপার,
ওহে নাথ! সাধ্য কার ধ্যানেতে ধরে তোমায়॥
মনেরে বুঝাই কত   তুমি বাক্যমনাতীত,
তবু প্রাণ ব্যাকুলিত তোমারে দেখিতে চায়॥

দিয়ে দীনে দরশন কর হে দুঃখ মোচন,
ওহে লজ্জা নিবারণ! শীতল কর হৃদয় ॥'

(তদেব, পৃঃ ১৩০-১৩১)।

তার এক যুগ পরে স্বামী শিবানন্দ রাঁচি গিয়েছিলেন (১৯১৫ সালে) শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি উৎসব পালন করতে। তখন—

'উৎসবের পর দিন তিনি আমাদিগকে লইয়া নিকটস্থ প্রান্তরে এক আম্রবৃক্ষের নীচে উপবেশন করিয়া সকলকে নানা উপদেশ দান করেন এবং একটি ভজন সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। দোল পূর্ণিমার দিন তপোবনে গমন করিয়া খুব ভাবস্থ হইয়া রাম-সীতা ও জগন্নাথদেবের দর্শন করেন এবং শ্রীমূর্তির সম্মুখে হাতে করতাল লইয়া, 'রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়' গানটি এমন মধুর ভাবে কীর্তন করিয়াছিলেন যে, আজও তাহা আমাদের কানে লাগিয়া রহিয়াছে—আর সে কি তন্ময়তা!...' (তদেব, পৃঃ ১৫২)

ওই বছরেই তাঁর আলমোড়ায় বাসকালেও আছে গানের উল্লেখ। একদিন সকালে স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ ভক্তি ভক্ত প্রসঙ্গ করছিলেন, ধ্যানের পরে।

'অতঃপর মহাপুরুষজী খুব তন্ময়ভাবে গাহিয়াছিলেন—

আর কি কায আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে
গয়া গঙ্গা বারাণসী...ইত্যাদি।' (তদেব, পৃঃ ১৫৭)

আরো ক বছর পরের কথা। সালটি সম্ভবত ১৯২০ হবে। তখন বেলুড় মঠের পরিচালন ভার নিয়েছেন স্বামী শিবানন্দ। মঠ ও মিশনের সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামীর দেহত্যাগের (১০ এপ্রিল, ১৯২২) প্রায় দু বছর আগে। সে সময়ের স্বামী শিবানন্দের দৈনন্দিন কাজকর্ম, ধ্যান ধারণা, ভজন সাধনে উপদেশ ইত্যাদিরও পরিচয় দেওয়া আছে 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' গ্রন্থে। তার মধ্যে দেখা যায় তিনি বেলুড় মঠে নিয়মিত ভজন কীর্তনের ব্যবস্থা করেছেন। সেই বিবরণ অনুসারে—'ঠাকুর খুব ভজন-প্রিয় ছিলেন; প্রার্থনা সঙ্গীতাদি সাধনার বিশেষ অঙ্গ, সেজন্য মঠে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধ্যান জপের পরে বিভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী বিষয়ক ভজন কীর্তন হইত। এইভাবে জপধ্যান, পূজাপাঠ, শাস্ত্রচর্চা, ভজন কীর্তনাদিতে মঠের আধ্যাত্মিক ভাবধারা বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।' (তদেব, পৃঃ ১৭২)।

বেলুড় মঠে প্রতিমায় দুর্গাপূজা সুচারুভাবে সম্পন্ন হলো ১৯১৯ সালে। সে প্রসঙ্গেও স্বামী শিবানন্দ প্রমুখের গান এবং নৃত্যেরও কথা পাওয়া যায়—'কয়দিন মহাপুরুষজী যেমন আনন্দে ভরপুর, তেমনি অক্লান্তভাবে কর্মে মত্ত হইয়া পূজার সমস্ত কাজকর্ম

দেখাশুনা করিয়াছিলেন। মহাষ্টমীর দিন কলিকাতা হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠে আসিলেন এবং দ্বাদশী পর্যন্ত ছিলেন। নবমীর দিন আসিলেন স্বামী সারদানন্দ। নবমীর রাত্রে দেবীর সম্মুখে ভজনগানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ এবং সারদানন্দ তিনজনেই যোগদান করিয়াছিলেন। একটা দিব্য গম্ভীর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল —জমজমাট ভাব। ভজন চলিতে লাগিল।...'খ্যাপার হাট বাজার মা তোদের খ্যাপার হাট বাজার' ইত্যাদি গানটি যখন গীত হইতেছিল তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য সকলেও ভাবে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন এবং প্রাণে প্রাণে দেবীর আবির্ভাব অনুভব করিতেছিলেন। পরে রাখাল মহারাজের আদেশে যখন— 'সমরে নাচে রে কার এ রমণী, নাশিছে তিমিরে তিমিরবরণী...' এই গানটি গাওয়া হইতেছিল তখন সকলেই একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। ভাবের আতিশয্যে প্রথমে স্বামী ব্রহ্মানন্দ দাঁড়াইয়া পড়িলেন, দেখিতে দেখিতে মহাপুরুষজী এবং শরৎ মহারাজও উঠিয়া দাঁড়াইলেন আর তিনজনে মুদিত নয়নে তালে তালে করতালি দিয়া মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সমবেত ভক্তবৃন্দ—কেহ তানপুরা, কেহ বা অন্য অন্য বাদ্যযন্ত্র হাতে করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দের সমবেত ভাবময় নৃত্য! মনে হইতেছিল যেন তিনটি দেব বালক মাতৃনাম গানে মাতোয়ারা হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। কী মধুর দৃশ্য!...অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেই আনন্দ নৃত্যগান চলিয়াছিল।'... (তদেব, পৃঃ ১৭৮)।

আরো পরিণত বয়সে স্বামী শিবানন্দ 'গদাধর আশ্রম' উদ্বোধন করেন দক্ষিণ কলিকাতায়, আদি গঙ্গার ধারে। সেখানে তাঁর শুধু কীর্তনে যোগ দেওয়া নয়, খোল বাজাবারও উল্লেখ পাওয়া যায়—'ঐ উপলক্ষ্যে মহাপুরুষজীও আঠার উনিশ দিন তথায় বাস করায় বহু লোক তাঁহার পূত সঙ্গ লাভের সুযোগ পাইয়াছিল। একদিন সান্ধ্য আরতি ও জপ ধ্যানাদির পর তিনি জনৈক ভক্তকে বলিলেন, 'দেখ, বহুজন হিতায় ঠাকুর এখানে বসেছেন। ঠাকুর বড়ই ভজনপ্রিয়, এখন রোজ আরতির পর খানিক ভজন কীর্তন চালাও। দাও ত দেখি আমার খোলটা। আর 'চিন্ময় মম মানস হৃদি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন'—এই গানটি গাও।' ভক্তটি কীর্তন আরম্ভ করিলেন, মহাপুরুষজী খোল বাজাইতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে 'এমন রূপ আর হেরি নাই রে' ইত্যাদি আখর দিয়া স্বয়ং সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন।' (তদেব, পৃঃ ১৮৪)

শরীরের প্রায় শেষ অবস্থায়, অশীতিপর বয়সে যখন বেলুড় মঠে অবস্থান করছেন, তখনো স্বামী শিবানন্দ সঙ্গীত বর্জিত হন নি—'দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেল আনন্দ ও উদ্দীপনা দেখিবার মত ছিল। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠাম পূজার পর হইতেই 'মা মা' করিয়া তিনি পাগলপ্রাণের আবেগে তিনি গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে-

ছেন, 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা নাকি বড় কেঁদেছে।' আবার কখনো মঠের সাধুদিগকে কোনো বিশেষ বিশেষ আগমনী গানের সুর বলিয়া দিতেছেন। ১৯৩০ সালে দুইজন প্রাচীন সাধু প্রত্যহ সকালে তাঁহার ঘরে বা উহার সামনে তখনকার অফিসঘরে খানিকক্ষণ আগমনী গান গাহিতেন। মহাপুরুষজী শুনিয়া খুব খুশী—ভাবে মাতোয়ারা হইয়া যাইতেন।...'

১৯৩১ সালের বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান প্রসঙ্গেও স্বামী শিবানন্দের গানের কথা আছে—'রাত্রে কালীকীর্তন হইতেছে। আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছেন।...'

তখন তাঁর বয়স ৮১ বছর।

এমনিভাবে, মহাপুরুষ মহারাজের আয়ুষ্মান জীবনের অন্তিম পর্বেও সঙ্গীত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। তাঁর সঙ্গীতকণ্ঠ অটুট ছিল শেষ পর্যন্ত।

'শিবানন্দ বাণী' নামে তাঁর সম্পর্কিত আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থেও তাঁর আরো গান গাইবার বিবরণ আছে। অধিক উল্লেখ বাহুল্য।

ঠাকুরের গৃহী শিষ্য সেবকবৃন্দের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলেন রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১-১৮৯৮)। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নানাপ্রকারে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তার একটি হলো—সঙ্গীত। অতি ঘনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবকরূপে রাম দত্ত যেসব গুরুর আশীষ-প্রাপ্ত, তেমনি বয়োজ্যেষ্ঠ রূপে গুরুভ্রাতাদেরও শ্রদ্ধার পাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে নানাভাবে তিনি স্মরণীয় স্থানের অধিকারী। চিহ্নিত ভক্ত-স্বরূপ তিনিই সম্ভবত সর্বাগ্রে গুরুসমীপে উপনীত হন, ১৮৭৯ সালে।

শিষ্য ও ভক্তগণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবানের অবতাররূপে রাম দত্তই প্রথম ধারণা ও প্রচার করেছিলেন।

গুরুর প্রথম জীবনী-পুস্তক রচনারও গৌরব তাঁর প্রাপ্য।

রামচন্দ্রের সঙ্গীতচর্চা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। গুরুর নির্দেশেই তিনি কীর্তন শিক্ষা ও গান আরম্ভ করেছিলেন, সাধনের অঙ্গ রূপে। তাঁর ভক্তিপ্রবণ মানস লক্ষ্য করেই হয়ত ঠাকুর তাঁকে বিশেষভাবে কীর্তন সঙ্গীতের উপদেশ দেন। তিনি পদাবলী কীর্তন শিখেছিলেন শ্যামাদাস কীর্তনীয়ার অধীনে। একথা শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতেই প্রকাশ। একদিন দক্ষিণেশ্বরের ঘরে তিনি বসেছিলেন। নিকটে ছিলেন শ্রীম. ও নিরঞ্জন। এমন সময় ভক্ত অধরলাল সেন এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখে বললেন, 'কি গো তুমি এখন এলে। কত কীর্তন নাচ হয়ে গেল। শ্যামাদাসের কীর্তন —রামের ওস্তাদ।'

রাম দত্তের খোল বাজন শিক্ষা করবার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শিবানন্দের

সঙ্গীত প্রসঙ্গে। বিভিন্ন প্রকার গানের মধ্যে কীর্তন তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল মনে হয়। সেজন্যে কীর্তন সঙ্গীতের সঙ্গতযন্ত্র খোল বাদনে আগ্রহ জাগে তাঁর। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বগৃহে (১১, মধুরায় লেন, শিমুলিয়া) বহুবার তিনি আমন্ত্রণ করে এনেছেন। তার যত বিবরণ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কীর্তন গানের অনুষ্ঠানই অধিক। ঠাকুরকে কীর্তন শোনাবার জন্যে রামচন্দ্র একজন কীর্তনীয়াকে কিছুকাল বেতন-ভুক্তও রেখেছিলেন। সেই যুবক কীর্তন গায়ককে শ্রীরামকৃষ্ণ গানের সময়কার দেহভঙ্গিমা শেখান, একথা ঠাকুরের প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে।

শিমুলিয়া দত্ত বংশেরই এক শাখায় রাম দত্তের জন্ম। নরেন্দ্রনাথের জ্ঞাতি তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করেন নরেন্দ্রনাথের তিন বছর আগে। রাম দত্তের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রেই স্বামীজীর অনুজ মহেন্দ্রনাথ সে গৃহে যাতায়াত করতেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণকে অতি নিকট থেকে দত্ত মহেন্দ্র দর্শনেরও সুযোগ পান সেই কারণে।

রাম দত্তের মধু রায় লেনের বাড়িটি শ্রীরামকৃষ্ণের বহুবার আগমনে ধন্য। যেমন তাঁর কাঁকুড়গাছি বাগান শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিতে পুণ্য তীর্থে পরিণত হয় 'যোগোদ্যান' নামে। রামচন্দ্রের শিমুলিয়া গৃহটি নানাদিনে স্বয়ং ঠাকুরের কীর্তন গান ও নৃত্যে মুখরিত থেকেছে। তিনি কোনো কোনো দিন খোল সঙ্গত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের গানের সঙ্গে। তার একটি বিবরণ পরে দেওয়া হবে। এই ভবনেই শ্রীরামকৃষ্ণকে গায়ক ও নৃত্যপররূপে প্রথম দেখেছেন দত্ত মহেন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে। আর পরিণত বয়সে তার মূল্যবান স্মৃতিচারণ লিপিবদ্ধ করেছেন। লাটু মহারাজ প্রথমে এখানেই ছিলেন রাম দত্তের পরিবারে পরিচারক রূপে। কিন্তু উত্তম আধার বলে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁর বিশিষ্ট সন্ন্যাসী শিষ্যে পরিণত হন, উন্নত অধ্যাত্ম-সম্পদ লাভ করে। রাম দত্তের সহযোগিতা লাটুর প্রথম কলকাতাবাস কালে পরম উপকারী হয়েছিল, এই বিষয়ে।

রামচন্দ্রের কীর্তন গান অনেক সময় ঠাকুরের সঙ্গে একযোগে হতো। তারও উল্লেখ আছে মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবৃতিতে : 'তিনি রাম-গৃহে এলেই কীর্তনের আসর করতেন রাম দত্ত। রামচন্দ্র ও মনোমোহন দুজনেই কীর্তন গাইতেন। কখনো ঠাকুর যোগ দিতেন। রামের মাসতুতো ভাই নিত্যগোপাল বসু (পরে জ্ঞানানন্দ অবধূত)ও কীর্তনে থাকিতেন।

পরমহংস মশাই মৃদুস্বরে সামান্য কীর্তন গাহিতেন এবং মাঝে মাঝে হাততালি দিতেন। তাহার পর তাঁহার ভাবাবেশ হইত। একেবারে বিভোর হইয়া যাইতেন।...

একটি কীর্তন— হরি বোলে আমার গৌর নাচে,
নাচেরে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে...

ভাবাবেশে যখন তিনি সামনে ও পিছনে চলাচল করিতেন, তখন কেবল রামদাদা ও মনোমোহন দাদা কীর্তন করিতে করিতে ঠিক সঙ্গে সঙ্গে চলিতেন।'

(শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, পৃঃ ৬২-৬৩, মহেন্দ্রনাথ দত্ত)।

প্রসঙ্গত, পরিবারিক পরিচয়ে বলে রাখা যায় যে, রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র এবং নিত্যগোপাল বসু হলেন পরস্পরের মাসতুতো ভাই। আবার মনোমোহন মিত্রের ভগ্নীপতি রাখালচন্দ্র ঘোষ অর্থাৎ রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)।

রামচন্দ্র ভিন্ন, ঠাকুরের ভক্ত মনোমোহন ও নিত্যগোপাল দুজনকেও এখানে কীর্তন গায়করূপে দেখা গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁরা কীর্তনে যোগ দিতেন রাম দত্তের ভবনে। তিনজনই অনেক সময় একযোগে কীর্তন গাইতেন—শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে এবং সাধন-জীবনের অঙ্গরূপে। নিত্যগোপালের খোল শিক্ষার কথাও শিবানন্দের প্রসঙ্গে জানা গেছে। পরবর্তীকালে জ্ঞানানন্দ অবধূত নামে সুপরিচিত হন নিত্যগোপাল। দক্ষিণ কলকাতায় মহানির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা তিনি, একথাও উল্লেখনীয়। গৃহে রামদত্তের খোল বাদন, তাঁর অন্যান্য ভক্তদের কীর্তন গান, শ্রীরামকৃষ্ণের সে কীর্তনানন্দে যোগদান প্রভৃতির একটি জীবন্ত বিবরণ পাওয়া যায় নাট্যাচার্য গিরিশ চন্দ্রের এক রচনায়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের আপন জীবনে যে অপূর্ব উত্তরণ ঘটছিল, গুরু এবং অবতাররূপে ঠাকুর কিভাবে প্রতিভাত হলেন তাঁর বাস্তব জীবনে ও মানসলোকে, সাতটি দর্শনের বৃত্তান্তে গিরিশচন্দ্র তার ("ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" নামে প্রবন্ধে) মনোজ্ঞ পরিচয় দিয়েছেন। তার মধ্যে ' ষষ্ঠ দর্শন' কথায় আছে রাম দত্তের গৃহাসরের বর্ণনা :

'আবার কিছুদিন গত হইল, আমি বেলা তিনটার সময় থিয়েটারে আসিয়াছি, একটু চিরকুট পাইলাম যে মধু রায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংস দেব আসিবেন। পড়িবামাত্র আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়া আমার হৃদয়ে যেরূপ টান পড়িয়াছিল সেইরূপ টান পড়িল। আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম যে অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব ? ঐ অজানিত সূত্রের টানে সে বাধা রহিল না। চলিলাম, অনাথবাবুর বাজারের নিকটে গিয়া ভাবিলাম—যাইব না। ভাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর থামি। রামবাবুর গলির মোড়ে গিয়াও থামিলাম। পরে রামবাবুর বাড়ি গিয়া পঁহুছিলাম। দোরে রামবাবু বসিয়া আছেন। ভক্তচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন আমি তথায় গিয়াছি ?' আমি বলিলাম, 'পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে'। রামবাবুর বাড়ির নিকটেই সুরেন্দ্রবাবুর বাড়ি। তিনি তথায় আমায় লইয়া গেলেন এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছেন, তাহা আমায়

বলিতে লাগিলেন।...আমি তাঁহারই সহিত রামবাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, রামবাবুর উঠানে, রামবাবু খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তগণও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। গান হইতেছে— 'নদে টলমল টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে!' আমার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই যে রামবাবুর আঙিনা টলমল করিতেছে। আমার মনে খেদ হইতে লাগিল, এ আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল। নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলেন, ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছা হইল—গ্রহণ করি, কিন্তু লজ্জায় পারিলাম না। ভাবিলাম, তাঁহার নিকটে গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে লোকে কে কি মনে করিবে। আমার মনে যে মুহূর্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও নৃত্য করিতে করিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। আমার আর চরণ স্পর্শের বাধা রহিল না। পদধূলি গ্রহণ করিলাম। সংকীর্তনের পর পরমহংসদেব রামবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। আমিও উপস্থিত হইলাম। পরমহংদেব আমারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমার মনের বাঁক (আড়) যাইবে তো?' তিনি বলিলেন—'যাইবে।'...

(গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ৩০০-৩০২,—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

শ্রীরামকৃষ্ণের নানাদিনের স্মৃতিধন্য রাম দত্তের সেই ভবনটি আর নাই। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে নবনির্মিত বিবেকানন্দ রোডের মধ্যে। অবশ্য ঠাকুরের অন্যতম প্রধান স্মারক-তীর্থরূপে পরিপাটীভাবে বিদ্যমান তাঁর কাঁকুড়গাছির বাগানবাড়ি। 'যোগোদ্যান' নামে সুপরিচিত এই সুদৃশ্য গৃহে রক্ষিত আছে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ বা অস্থি-র একাংশ। রাম দত্তই তা প্রথম রক্ষা করেন। পরে সেই অস্থি-র সমাধিস্থলে গঠিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি-মন্দির। তাঁর দেহাস্থির অপরাংশ বেলুড় মঠে সংরক্ষিত।

রামচন্দ্র ও কাঁকুড়গাছি ভবনের প্রাসঙ্গিক কথা আর দু একটি আছে, সঙ্গীত সম্পর্কে। স্বামীজী বেলুড় মঠে যে তানপুরা সহযোগে গান গাইতেন, তা সেখানেই রক্ষিত আছে। কিন্তু তাঁর আরেকটি তানপুরা ছিল প্রথম জীবনে সঙ্গীতচর্চার সময়ে। সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করবার আগে তিনি সেই তানপুরাটি রামচন্দ্র দত্তকে দিয়ে যান। স্বামীজীর প্রথম হাতের সে যন্ত্র সম্ভবত ছিল কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে। একথা স্বামীজীর সর্বকনিষ্ঠ সহোদর ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন (Swami Vivekananda —Patriot prophet, Appendix, p. 419—by Dr. B. N. Datta).

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পরের বছর থেকে রামকৃষ্ণ উৎসব প্রবর্তিত হয় তাঁর পুণ্য-স্মৃতিতে। রাম দত্ত সে অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান হোতা। জন্মাষ্টমীর দিন কাঁকুড়গাছি

যোগোদ্যানেই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হতো। আর তার অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল, সঙ্গীত সহযোগে এক চিত্তাকর্ষক শোভাযাত্রা। স্বামীজী ও রাম দত্তের জ্ঞাতি, বাদ্যাচার্য হাবু দত্ত তার একজন উদ্‌যোক্তা। রাম দত্তের মধু রায় লেন গৃহে যাত্রারম্ভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সেই শোভাযাত্রা মানিকতলা প্রভৃতি অঞ্চল পার হয়ে উপনীত হতো কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে। আর হাবু দত্ত ক্লারিওনেট বাদনের সঙ্গে শোভাযাত্রায় পুরোভাগে সমগ্র পথ পরিক্রমা করতেন। তাঁর বাঁশি ভিন্ন ভক্তিগীতিও অনুষ্ঠিত হতো যাত্রাপথে। যোগোদ্যানের উৎসবও সঙ্গীতমুখর থাকত।

কাঁকুড়গাছি ভবনের উদ্দেশে সেই শোভাযাত্রা প্রথম অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায় দত্ত মহেন্দ্রনাথের বিবৃতিতে (গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান, পৃঃ ৪৫-৪৬—মহেন্দ্রনাথ দত্ত)। তার প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো: জন্মাষ্টমীর দিন সকলে রামদাদার বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। যুবা শশী মাথা ও গোঁফদাড়ি কামাইয়া একটি গামছা বিঁড়ের মতো করিয়া মাথায় দিয়া তাহার উপর অস্থি-র ঘড়াটি রাখিয়া, নগর-কীর্তনের সঙ্গে বহু লোকসমেত বাহির হইল। কীর্তনের দল মধু রায় লেন হইতে গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট দিয়া হেদোর ধারে, মানিকতলা স্ট্রীট দিয়া কাঁকুড়গাছির বাগানের দিকে চলিল। খানিকটা পথ গোপালদা-ও ঘড়াটি মাথায় করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন—একথা আমি গোপালদার কাছে শুনিয়াছি।

এই দিন কয়েকটি কীর্তনের দল ও বহু ভদ্রলোক সঙ্গে গিয়াছিলেন। সকলেরই শোকার্ত মুখ ও বিষণ্ণ ভাব। নিঝুমভাবে সকলেই চলিতে লাগিলেন। নূতন কোনো গান রচিত না হওয়ায় গিরিশবাবুর চৈতন্যলীলার শেষ গান :

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায় ?
(আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
প্রাণসখা রাখ পায়।
কালশশী বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী,
কুল ত্যজে হে, অকূলে ভাসি ,
হৃদবিহারী, কোথায় হরি,
পিপাসী প্রাণ তোমায় চায় !)

গাওয়া হইয়াছিল। আমি রামদাদার বাড়ি হইতে সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা পথ গিয়া পরে ফিরিয়া আসিলাম। নরেন্দ্রনাথ ও অপর সকলে জনতার সঙ্গে কাঁকুড়গাছিতে গিয়াছিলেন। এই দিন উপলক্ষ্য করিয়া কাঁকুড়গাছিতে উৎসব হইয়া থাকে। ইহা হইতেই কাঁকুড়গাছি মন্দিরের সূত্রপাত।'...

ওপরে উল্লিখিত 'যুবা শশী' হলেন শশীভূষণ চক্রবর্তী, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্য—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। শরৎ মহারাজ বা সারদানন্দের খুড়তুতো ভাই তিনি। 'গোপালদা' নামে কথিত ব্যক্তি হলেন গোপালচন্দ্র ঘোষ বা 'বুড়ো গোপালদা' বা সিঁথির গোপাল: শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য—স্বামী অদ্বৈতানন্দ। আর 'কাঁকুড়গাছি মন্দির' হলো যোগোদ্যানে গঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মন্দির, যেখানে তাঁর দেহাবশেষের একাংশ রক্ষিত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গায়ক পার্শ্বচর-রূপে রামলালের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর সঙ্গীত-জীবন একান্ত ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্ভর।

রামলালের গানের সূত্রপাত কিভাবে ঠাকুরের ইচ্ছায় ও প্রেরণায় ঘটেছিল, সে বিবরণ আগেকার একটি অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। গানের সময় দেবদেবীকে কল্পনা করে তাঁদের উদ্দেশ্যেই তাঁকে শোনাবার নির্দেশও যে শ্রীরামকৃষ্ণ দেন, তাও উদ্ধৃত আছে আরেকটি প্রসঙ্গে। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ একজনের গান শুনে মুগ্ধ হলেন ও রামলালকে খাতায় লিখে নিতে বললেন, এমন বিবরণও পাওয়া গেছে।

এমনি নানাভাবে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন সঙ্গীতের সূত্রে। গায়ক-রূপে এত দীর্ঘকালও অন্য কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ পান নি।

আর শ্রীম-র একটি লিপি থেকে জানা যায় যে, রামলাল গান গাইতেন 'মধুর কণ্ঠে'। ঠাকুরের নিকট আত্মজন রামলাল। তাঁর দ্বিতীয় অগ্রজ রামেশ্বরের পুত্র। দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি ছিলেন ঠাকুরের সেবক—১৮৭২ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত। তার মধ্যে অধিকাংশ কালই তাঁর গায়ক-জীবন। কত দিন যে তিনি ঠাকুরকে গান শুনিয়েছেন তার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত পাওয়া অসম্ভব, লিপিবদ্ধ বিবরণের অভাবে। 'কথামৃত'-কারের চার বছরের ১৭৯টি দিনলিপিতেও রামলালের অনেকগুলি গান গাইবার উল্লেখ আছে। তা ছাড়া, পুত্র হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তিকা থেকে জানা গেছে তাঁর পঞ্চাশটি গান ঠাকুরকে শোনাবার কথা। অবশ্যই সে হিসাব অসম্পূর্ণ। তবু ধারণা করা যায়, পার্ষদদের মধ্যে রামলাল ঠাকুরের নিকটে সর্বাধিক গান গেয়েছেন। সঙ্গীতৈকপ্রাণ পরমহংসদেবের বাহ্য জীবনে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গলাভে ধন্য, ভাগ্যবান রামলাল এক অনন্য স্থানের অধিকারী।

এত গায়ক পার্শ্বচর থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গীতে প্রবুদ্ধ করেন নিত্য গান শোনবার জন্যে। রামলাল তাঁর সে মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন। আর এতদিনের সান্নিধ্যের ফলে নানা মূল্যবান ও অন্তরঙ্গ বিবরণ তিনি প্রকাশ করেছেন ঠাকুরের সঙ্গীত প্রসঙ্গে। তার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা হবে। আরো কিছু থাকবে দশম অধ্যায়ে। রামলালের কোনো কোনো বিবৃতি থেকে বোঝা যায়,

ঠাকুর কি গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁকে। সঙ্গীতাদি বিষয়ে তাঁদের পারস্পরিক কিছু সম্পর্ক-কথা এগুলিতে বিধৃত। বিবৃতিকার—রামলালকে প্রত্যক্ষদর্শী কমলকৃষ্ণ মিত্র :—

'রামলাল দাদার স্বভাবটি অতিশয় স্থির ও নম্র, সর্বদাই ভগবত প্রেমে তন্ময়। আবার রসিকতায় ভরপুর, দেখলে মনে হয়, অতি সৌম্য মূর্তি ও বালক স্বভাব। কথাগুলি অতি বিবেচনা করে আস্তে আস্তে বলেন, কোনরূপ বেফাঁস বা মিথ্যা বলেন না। শুনতে পাই, ঠাকুর দাদাকে বলেছিলেন যে, 'সত্যেতে থাকবি, তাহলে ভগবান পাবি, সত্যই কলির তপস্যা।'

আবার শুনেছি, ঠাকুর দাদাকে অতিশয় ভালবাসতেন, তিনি দাদাকে বহু বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কি করে পূজা করতে হয়, গান করতে হয়, সেবা করতে হয় ইত্যাদি। রামলাল দাদা সর্বদাই ঠাকুরের কাছে থেকে তাঁর সেবা করতেন। বোধ করি দাদার প্রত্যেক কার্যকলাপটি ঠাকুরের মতো। দেখেছি রাখাল মহারাজ দাদাকে নিয়ে অনেক সময়ে খুব রগড় ও খাতির যত্ন করতেন।'…(শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৮০-১৮১—কমলকৃষ্ণ মিত্র)।

'রামলাল দাদা গান গাইলেন—'কখন্ কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা…'। রামলাল দাদা গান ও নাচ করে বললেন, ঠাকুর এমনি করে গাইতেন ও হাততালি দিয়ে কোমর বেঁকিয়ে নাচতেন আর পা ফেলে ফেলে তাল দিয়ে নাচতেন।…রামলাল দাদা আবার গাইলেন—'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে…।' গেয়ে বললেন, 'ঠাকুর এমনি করে গাইতেন।'…(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি, পৃঃ ৫—কমলকৃষ্ণ মিত্র)।

'রামলাল—'ঠাকুর রামপ্রসাদের গানের মধ্যে এই গানটি বেশ টানটুন্ দিয়ে রকমারি করে গাইতেন ও নাচতেন' :—

ক্ষেপার হাট বাজার মা তোদের, ক্ষেপার হাট বাজার…' (তদেব)

'একদিন রামলাল একটি গান গাইছিলেন, 'কেন মা তোর পাগলীর বেশ।'

কমল—এটি কি সুর ?

রামলাল দাদা—এটা ঠাকুর ঠুংরিতে গাইতেন। আজকালকার মতো তিনি ঠুংরি গাইতেন না। তিনি যেটি গাইতেন অতি ভাবের সঙ্গে, আহা, কি মিষ্টি মধুর লাগত।'… (ঐ পুস্তক, পৃঃ ৪)।

'কথামৃত'-গ্রন্থকার সম্পর্কেও রামলালের সেই মন্তব্যটি আরেকবার স্মরণে রাখা যায়: 'রামলাল—'মাস্টার মশায় ঠাকুরের কাছে যেদিন আসতেন, সেই দিনেরই কথা ও গান লিখে রাখতেন। তাঁর অসাক্ষাতে কত কথা ও গান ঠাকুর বলতেন তার কি

সীমা আছে ?' (ঐ পুস্তক পৃঃ ১)

এবার 'কথামৃত' থেকেই রামলালের গান গাইবার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো। এ থেকেও বোঝা যাবে, শ্রীরামকৃষ্ণের কি নিবিড় সংযোগ ছিল রামলালের গায়ক জীবনের সঙ্গে। তাঁর কতখানি তত্ত্বাবধানে রামলাল গান শোনাতেন তাও এই বিবরণীতে প্রকাশ :—

'ঠাকুর···রামলালকে গাইতে বলিলেন। তিনি মধুর কণ্ঠে গাইতেছেন। ঠাকুর এক একটি গান ধরাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর বলাতে রামলাল প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গাইতেছেন—

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতি শ্রীগৌরাঙ্গ মুরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে।

রামলাল পরে গাইলেন, শচী কেঁদে বলছেন, 'নিমাই, কেমন করে তোকে ছেড়ে থাকবো ?'

ঠাকুর বলিলেন, সেই গানটি গা তো।

(১)—আমি মুক্তি দিতে কাতর নই···
(২)—রাধার দেখা কি পায় সকলে
রাধার প্রেম কি পায় সকলে,
অতি সুদুর্লভ ধন, না করলে আরাধন,
সাধন বিনে সে ধন এ ধনে কি মেলে···
(৩)—নবনীরদবর্ণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে···

ঠাকুর রামলালকে আবার বলিতেছেন, সেই গানটি গা—গৌর নিতাই তোমরা দু ভাই। রামলালের সঙ্গে ঠাকুরও যোগ দিতেছেন—

গৌর নিতাই তোমরা দু ভাই পরম দয়াল হে প্রভু
(আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ)···'

(দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৯১-৯২)।

একদিন রামলালকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন অধরলাল সেনের বাড়িতে। সেদিন তিনি ঠাকুরকে দর্শনের জন্তে ব্যাকুল হয়েছিলেন। সেই সব কথাবার্তার পর—

'সন্ধ্যা হইয়াছে। বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর জোড়হস্তে জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে বুঝি মূলমন্ত্র জপ করিলেন। তারপর মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। বলিতেছেন গোবিন্দ, গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ, হরিবোল ! নাম করিতেছেন, আর যেন মধু বর্ষণ হইতেছে। ভক্তেরা অবাক হইয়া সেই নামসুধা পান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত

রামলাল এইবার গান গাহিতেছেন—

ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্য বিনোদিনী॥
শরীর শারীর যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণ ভেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চারিণী॥
আধার ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মল্লার, বসন্তে হৃদ্ প্রকাশিনী॥
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে, কর্ণাট আজ্ঞাপুরে,
তান-মান-লয়-সুরে, ত্রিসপ্ত-সুরভেদিনী॥
মহামায়া মোহপাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে,
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী॥
শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকীমুখ আচ্ছাদিনী॥'

(আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রসিদ্ধ মহারাজা নন্দকুমার এই গানখানির রচয়িতা। বাংলার সঙ্গীতজগতে দীর্ঘকাল যাবত সুপ্রচলিত থাকে গানটি। শ্রীরামকৃষ্ণেরও এটি প্রিয় গান এবং তাঁর গাইবারও উল্লেখ আছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে। তাঁর গান গাওয়ার প্রসঙ্গে বর্তমান পুস্তকে তা উদ্ধৃত করা হয়েছে। নন্দকুমারের এই গানটির বিশেষত্ব এখানে বর্ণনীয়। রামলাল বা শ্রীরামকৃষ্ণ গাইবার শতাধিক বছর আগে গানখানি রচিত। ওয়ারেন হেস্টিংসের ষড়যন্ত্রে বলি-দত্ত মহারাজা নন্দকুমার রায়ের একাধিক অপরিচিত গুণ-পরিচয় এই গানের বাণীতে রক্ষিত আছে। তিনি শুধু গীত-রচয়িতা নন। তিন সপ্তক; তান লয়ের ক্রিয়া; মল্লার, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাট, শ্রী প্রভৃতি রাগ গানটিতে উল্লিখিত। সুতরাং বোঝা যায়, সঙ্গীতশাস্ত্রের বিষয়ে অবগত ছিলেন নন্দকুমার। তা ভিন্ন যৌগিক সাধনের তত্ত্ব তথা প্রণালীতে ব্যুৎপন্ন তাঁর সাধন জীবনের আভাসও গানখানির ছত্রে ছত্রে বিধৃত।)

রামলাল আবার গাইলেন—

'ভবদারা ভয়হারা নাম শুনেছি তোমার
তাইতে এবার দিয়েছি ভার তারো তারো মা তারো মা।
তুমি মা ব্রহ্মাণ্ডধারী ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিকে,
কে জানে তোমারে তুমি কালী কি রাধিকে,
ঘটে ঘটে তুমি ঘটে আছ গো জননী,
মূলাধার কমলে থাক মা কুলকুণ্ডলিনী।

তদূর্ধ্বেতে আছে মা গো নামে স্বাধিষ্ঠান,
চতুর্দল পদ্মে তথায় আছ অধিষ্ঠান।
চতুর্দলে থাক তুমি কুলকুণ্ডলিনী,
ষড়দল বজ্রাসনে বস মা আপনি।
তদূর্ধ্বেতে নাভিস্থান মা মণিপুর কয়,
নীলবর্ণের দশদল পদ্ম যে তথায়,
সুষুম্নার পথ দিয়ে এস গো জননী,
কমলে কমলে থাক কমলে-কামিনী।
তদূর্ধ্বেতে আছে মাগো সুধা সরোবর,
রক্তবর্ণের দ্বাদশদল পদ্ম মনোহর,
পাদপদ্ম দিয়ে যদি এ পদ্ম প্রকাশ।
(মা) হৃদে আছে বিভাবরী তিমির বিনাশ।
তদূর্ধ্বেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল,
ধূম্রবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল।
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজ আকাশ,
সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।
তদূর্ধ্বে ললাটে স্থান মা আছে দ্বিদল পদ্ম,
সদায় আছয়ে মন হইয়ে আবদ্ধ।
মন যে মানেনা আমার মন ভাল নয়,
দ্বিদলে বসিয়া রঙ্গ দেখয়ে সদায়।
তদূর্ধ্বে মস্তকে স্থান মা অতি মনোহর,
সহস্রদল পদ্ম আছে তাহার ভিতর।
তথায় পরম শিব আছেন আপনি,
সেই শিবের কাছে বস শিবে মা আপনি।
তুমি আদ্যাশক্তি মা জিতেন্দ্রিয় নারী,
যোগীন্দ্র মুণীন্দ্র ভাবে নগেন্দ্র কুমারী।
হর শক্তি হর শক্তি সুদনের এবার,
যেন না আসিতে হয় মা ভব পারাবার।
তুমি আদ্যাশক্তি মাগো তুমি পঞ্চতত্ত্ব,
কে জানে তোমারে তুমি তুমিই তত্ত্বাতীত।
ওমা ভক্ত জন্য চরাচরে তুমি সে সাকার,

পঞ্চে পঞ্চ লয় হয় তুমি নিরাকার।'

সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত, গুহ্য সাধন ক্রিয়াত্মক এই সুদীর্ঘ গীতটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলো দুটি কারণে। প্রথমত, ৩৮ পঙ্‌ক্তির বিপুলকায় গানখানি এবং আরো নানা দিনে গাওয়া বিভিন্ন দীর্ঘ গানের দৃষ্টান্তে বোঝা যায়, রামলালের স্মৃতিশক্তি বিলক্ষণ। কোনোদিন তাঁকে গানের বই বা খাতা দেখে গাইতে হয় নি। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় তিনি গেয়েছেন তাঁর ভিন্ন ভিন্ন ভক্তদের গৃহে, যেমন এক্ষেত্রে অধরলালের ভবনে। আবার কখনো দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কক্ষে। বিশেষ বিশেষ গানের জন্যে রামলাল প্রস্তুত হয়ে ঠাকুরের কাছে আসতেন, তাও সম্ভব নয়। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় গানের তাৎক্ষণিক ফরমায়েস করতেন এক-একটি বিশিষ্ট অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে। যে বিষয় নিয়ে যে সময় কথা বলছেন সেই ভাবের গান শুনতে চাইতেন। স্বাভাবিক-ভাবেই, প্রসঙ্গ আগে থেকেই স্থির করা থাকত না তাঁর। রামলালকেও গাইতে হতো বিষয়োচিত সঙ্গীত, ঠাকুরের তুল্য মহা বিচক্ষণ শ্রোতার সামনে। কোনোপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁর চক্ষুকর্ণে এড়ানো অসম্ভব। ভাবে এবং বিষয়ে যথা উপযুক্ত গান শুনিয়ে লোকোত্তর শ্রবণকর্তাকে দিনের পর দিন রামলাল পরিতুষ্ট করেছেন। গায়করূপে এ তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচায়ক। তাঁকে প্রায় একশ গান গাইতে দেখা গেছে— 'কথামৃত', 'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি', 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা' এবং হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্মৃতিকথা'র সাক্ষ্যে। সম্ভবত তাঁর গাওয়া বা জানা গানের এই হিসাবও সম্পূর্ণ নয়। কারণ যত গান রামলাল জানতেন ও গাইতেন সবই লিপিবদ্ধ না থাকতে পারে। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণেরই এ বিষয়ে যখন তথ্যাদি রক্ষিত হয়নি তখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পর্কেও সেকথা প্রযোজ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ এক-বার রামলালকে খাতায় দুটি গান লিখে নিতে বলেছিলেন বটে, কিন্তু রামলালের স্মৃতি-শক্তি বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তিনি কখনো খাতা দর্শনে গান শোনান নি, শ্রীম. প্রমুখের বিবৃতি থেকে তা অনুমেয়। শ্রীম. যে প্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, রামলালের গায়ন-ক্রিয়া খাতা দৃষ্ট হয়ে থাকলে, 'কথামৃত'কার অবশ্যই জানাতেন: 'ঠাকুরের আদেশ পাইয়া রামলাল গানের খাতা বাহির করিয়া সম্মুখে রাখিলেন এবং তাহা দেখিয়া গান গাইতে লাগিলেন।'

রামলালের স্মরণ-শক্তি তাঁর গায়ন-ক্ষমতারই তুল্য শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদে, শুভেচ্ছায়, সঙ্গগুণে এবং দৃষ্টান্তে লব্ধ। একথা বলা যায় এইজন্যে যে, সেবকরূপে তিনি ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করেন দীর্ঘ চৌদ্দ বছর যাবত।

আগেও এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, গানের বাণী থেকে শিক্ষণীয় অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের ব্যাখ্যা করে দিতেন। তাঁদের মনে গ্রথিত করতেন কোনো

গম্ভীর তত্ত্বকথা। তেমনি রামলালের গানের সময়েও অনুরূপ বিষয়ে ঠাকুরকে বোঝাতে দেখা যায়। যেমন—নিরাকার সচ্চিদানন্দ দর্শন, ষট্‌চক্র ভেদ, নাদভেদ ও সমাধি সম্পর্কে বললেন—'ভবদারা ভয়হরা' গানটি সেদিন শোনাবার সময়—

'শ্রীযুক্ত রামলাল তখন গাহিতেছেন,—

তদূর্ধ্বেতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল,
ধূম্রবর্ণের পথ আছে হয়ে ষোড়শদল,
সেই পথ মধ্যে আছে অম্বুজ আকাশ,
সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।

তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলিতেছেন—

'এই শুন, এরই নাম নিরাকার সচ্চিদানন্দ দর্শন। বিশুদ্ধ চক্র ভেদ হলে সকলি আকাশ।'

মাস্টার—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই মায়া জীব জগৎ পার হয়ে গেলে তবে নিত্যেতে পৌঁছান যায়। নাদ ভেদ হলে তবে সমাধি হয়। ওঁকার সাধন করতে করতে নাদ ভেদ হয় আর সমাধি হয়।'… (তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৬-৩৮)

১৮৮৪ সালের কালীপূজার রাত। দক্ষিণেশ্বরের ঘরে রয়েছেন ঠাকুর। বাবুরাম, গুপ্ত মহেন্দ্র, ছোট গোপাল প্রভৃতি কজন ভক্ত উপস্থিত। মন্দিরে বিকালে চণ্ডীর গান হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনেছিলেন 'ভক্ত সঙ্গে প্রেমানন্দে।' এখন নিজের ভাবে পর পর দুখানি গান গাইলেন, সবই শ্যামাসঙ্গীত।

তারপর তাঁর আরো একটি 'গান সমাপ্ত হইল। রামলাল ঘরে আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, 'একটু গা, আজ পুজা '

রামলাল গাইতেছেন—

(১) সমর আলো করে কার কামিনী।
সজল জলদ জিনিয়া কায়, দশনে প্রকাশে দামিনী॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ, সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে, রণ প্রকাশে রঙ্গিণী॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু, ঘনতনু ঘেরি কুমুদবন্ধু,
অমিয় সিন্ধু হেরিয়া ইন্দু, মলিন এ কোনো মোহিনী॥
একি অসম্ভব ভব পরাভব, পদতলে শবসদৃশ নীরব,
কমলাকান্ত কর অনুভব, কে বটে ও গজগামিনী॥
(২) কে রণে এসেছে বামা নীরদবরণী।

শোণিত সায়রে ভাসে যেন নীল নলিনী ॥ ইত্যাদি—

ঠাকুর প্রেমানন্দে নাচিতেছেন। নাচিতে নাচিতে গান ধরিলেন—

'মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।...'

দক্ষিণেশ্বরে আরেকদিনের কথা। রামলাল (মন্দিরের এক গায়কের সঙ্গে) ছখানি গান গাইলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়। কোনো কোনো গানের বিষয় নিয়ে ঠাকুর অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও করলেন। এদিনে (হয়ত তবলার অভাবে) শুধু একটি বাঁয়াতে ঠেকা দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন শ্রীম.। এই সূত্রে অনুমান করা যায়, অন্যান্য দিনে রামলাল তবলা ও বাঁয়া সহযোগে সম্পূর্ণ সঙ্গতে গান গাইতে পারেন। অর্থাৎ তালজ্ঞান ছিল তাঁর।

'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতে বলিলেন। রামলাল ও কালীবাড়ির একটি ব্রাহ্মণ কর্মচারী গাহিতেছেন। সঙ্গতের মধ্যে একটি বাঁয়ার ঠেকা—

(১) হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি।
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী ॥
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী ॥
আমায় ধর ধর জনার্দন, পাপভার গোবর্ধন,
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি ॥
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মন ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে পুরাও ইষ্ট এই মিনতি ॥
আমার প্রেম-রূপ যমুনাকূলে, আশা বংশী বটমূলে,
স্বদাস ভেবে সদয়-ভাবে, সতত কর বসতি ॥
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দি থাকি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরথি ॥

(২) নবনীরদবর্ণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রূপ হেরে,
করেতে বাঁশী অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো করে ॥
জড়িত পীতবসন, তড়িত জিনি ঝলমল,
আন্দোলিত চরণাবধি হৃদি সরোজে বনমাল,
নিতে যুবতী জাতিকুল, আলো করে যমুনাকূল,
নন্দকুলচন্দ্র যত চন্দ্র জিনি বিহরে ॥
শ্যামগুণধাম পশি, হায় হৃদি-মন্দিরে,
প্রাণ মন জ্ঞান সখি হরে নিল বাঁশীর স্বরে,

গঙ্গানারায়ণের যে দুঃখ সে কথা বলিব কারে,
জানতে যদি যেতে গো সখি যমুনায় জল আনিবারে ॥

(৩) শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উড়তেছিল ;
কলুষের কু-বাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল। (ইত্যাদি)

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ভক্তদের বলতে লাগলেন—ঈশ্বরে অনুরাগ, 'অনুরাগ অঞ্জন,' বদ্ধ জীব, সাধনাসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

'ঠাকুর অনুরাগের কথা বলিতেছেন। গোপীদের অনুরাগের কথা। আবার গান হইতে লাগিল। রামলাল গাহিতেছেন—

নাথ ! তুমি সর্বস্ব আমার। প্রাণাধার সারাৎসার ;
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে, বলিবার আপনার ॥
তুমি সুখ শান্তি, সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য, জ্ঞান বুদ্ধি বল,
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার ॥
তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল, তুমি স্বর্গধাম,
তুমি শাস্ত্র বিধি গুভ কল্পতরু, অনন্ত সুখের আধার ॥
তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা দাতা তুমি হে উপাস্য,
দণ্ডদাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার (তুমি) ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আহা কি গান ! 'তুমি সর্বস্ব আমার।' গোপীরা অক্রুর আসবার পর শ্রীমতীকে বললে, রাধে ! তোর সর্বস্ব ধন হরে নিতে এসেছে। এই ভালবাসা। ভগবানের জন্য এই আকুলতা।

আবার গান বলিতে লাগিল—(অর্থাৎ রামলাল গাইতে লাগলেন)

(১) ধোরো না ধোরো না রথচক্র রথ কি চক্রে চলে,
যে চক্রের চক্রী হরি, যার চক্রে জগৎ চলে ॥

(২) প্যারী কার তরে আর গাঁথো হার যতনে।

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর সমাধিসিন্ধু মধ্যে মগ্ন হইলেন।...'

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে আরেকদিন। গুপ্ত মহেন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ পারিবারিক ব্যাপারে কয়েকটি উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন, 'তুমি যা ভাবছো তাও হয়ে যাবে।' তারপর—

'ঠাকুর এইবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ঘরে রাখাল, রামলাল। রামলালকে গান গাহিতে কহিতেছেন। রামলাল গান গাহিতেছেন—

গান—সমর আলো করে কার কামিনী।...
গান—কে রণে নাচিছে বামা নীরদবরণী।...

শ্রীরামকৃষ্ণ—মা আর জননী। যিনি জগৎ রূপে আছেন—সর্বব্যাপী হয়ে তিনিই মা। জননী যিনি জন্মস্থান। আমি মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হোতুম ;—মা বলতেবলতে যেন জগতের ঈশ্বরীকে টেনে আনতুম। যেমন জেলেরা জাল ফেলে তারপর অনেক-ক্ষণ পরে জাল গুটোতে থাকে। বড় বড় মাছ সব পড়েছে।

'গৌরী বলেছিল, কালী গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে, তবে ঠিক জ্ঞান হয়। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি (কালী)। তিনি নবরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।...'

'শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের আদেশে আবার গাহিতেছেন,—এবারে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা।

গান—কি দেখিলাম রে কেশব ভারতীর কুটীরে,
অপরূপ জ্যোতি শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি...
গান—গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়...

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নবরূপে দেখতে পেলে তবে তো ভালবাসতে পারবে, তবেই ভাই ভগিনী বাপ মা সন্তানের মতো স্নেহ করতে পারবে।

তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটি হয়ে লীলা করতে আসেন।'...

দক্ষিণেশ্বরের ঘরে আরো একদিন রামলালের চারখানি গান গাওয়ার বিবরণ দিয়েছেন শ্রীম.। এদিনেও ঠাকুরের কথায় তিনি গেয়েছিলেন—(১) 'কি করলে হে কান্ত অবলারি প্রাণ-কান্ত', (২) 'শুনেছি রাম তারক ব্রহ্ম', (৩) 'কে রণে নাচিছে বামা' ও (৪) ধোরোনা ধোরোনা রথচক্র।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে রামলালের গান গাইবার এমনি নানা উদাহরণ আছে। আর উদ্ধৃত করা বাহুল্য।

এক যুগেরও অধিক কাল তাঁর সেবক ও গায়ক-রূপে ছিলেন রামলাল। এক ভাবে বলা যায়, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গানের ভাণ্ডারী। তা ভিন্ন, সুদীর্ঘকালের সস্নেহ ঘনিষ্ঠতার ফলে—ঠাকুরের অনেক কিছু লাভ করে তাঁর জীবন ধন্য। একথা শ্রীরাম-কৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলীর জানা ছিল। সেজন্যে ঠাকুরের তিরোভাবের পরে, উত্তরকালেও তাঁদের প্রিয়জন থেকেছেন রামলাল। শ্রীরামকৃষ্ণের নানা অন্তরঙ্গ বৃত্তান্ত ও কথাবার্তা তিনি জিজ্ঞাসুদের কাছে প্রকাশ করেছেন। আর ঠাকুর সম্পর্কিত রামলালের প্রধান আকর্ষণ রয়ে গেছে তাঁর গায়ন-গুণ। কারণ রামলালের গান শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ মননের সঙ্গে যেন অবিচ্ছেদ্য।

স্বামী ব্রহ্মানন্দও এজন্যে ঠাকুরের কৃপা-ধন্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিশেষ সমাদর করতেন। রামলালের সঙ্গীত প্রসঙ্গে উপসংহারে তারই এক হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো এখানে।—

রামলালের গানের অনুষঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি এই বিবরণীতেও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে :—

স্বামী ব্রহ্মানন্দ 'মহারাজ মধ্যে মধ্যে বেলুড় হইতে বলরাম মন্দিরে আসিয়া বাস করিতেন। সেদিন প্রাতঃকালে রামলাল দাদা মহারাজের সাক্ষাৎ মানসে সেখানে আসিলেন। দাদাকে দেখিলেই মহারাজ আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন এবং আলাপ আলোচনা ও হাস্যকৌতুকে মুখর হইয়া উঠিতেন। সেইদিন রামলাল দাদাকে বলিলেন, 'দাদা আজ সন্ধ্যার পর ঢপওয়ালী সেজো—ঠাকুরের সময়কার গান সকলকে শুনাতে হবে।' বেলুড় মঠে ঐরূপ অনাবিল রঙ্গরসে দাদা সম্মত থাকিলেও পরের বাড়িতে উহা চলে কিরূপে? দাদা আপত্তি জানাইলেন ; কিন্তু মহারাজের নির্বন্ধাতিশয্যে দাদাকে যথা সময়ে সন্ধ্যায় অপূর্বসাজে সজ্জিত হইয়া বলরাম মন্দিরের দ্বিতলের হলে মহারাজ প্রভৃতির সম্মুখে আসরে নামিতে হইল। রামলাল দাদা হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে ঢপ-কীর্তনের সুরে গান ধরিলেন—

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনের দুয়ের মত—
(ও তোর) মন থাকে তো থাকবি সেথা, নইলে আসবি দ্রুত।
আগে ছিল এক হেঁটো জল,
এখন যমুনা অতল—সাঁতার দিতে হবে ;
নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে।
যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধূলা লাগিবে—
(বললে বলতেও পার, আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ
—না হয় ব্রজনারীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে ॥'

গান ও গানের আখর শুনিতে শুনিতে মহারাজের সহাস্য বদন সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। গানের প্রতি চরণ কোন্ অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতে লাগিল, প্রতি ছন্দে কোন্ অপূর্ব লীলার আকর্ষণ অনুভূত হইতে লাগিল। প্রতি ভাবে কোন্ বিরহ সমস্ত আমোদ প্রমোদের উপরে ঘন যবনিকা টানিয়া দিতে লাগিল ?...আজ এই অপূর্ব সঙ্গীত কি সেই স্বরূপের পরিচয় লইয়া অবতীর্ণ হইল ? তরল হাস্যকৌতুক এতটা গাম্ভীর্যে পরিণত হইবে—ইহা কে ভাবিয়াছিল ?' (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৪১-১৪২—স্বামী গম্ভীরানন্দ)।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিজেরও সঙ্গীত গুণ কিঞ্চিৎ ছিল। পূর্বাশ্রমে রাখালচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৩-১৯২২)। নরেন্দ্রনাথের সমবয়সী এবং প্রায় সমকালে ঠাকুর সমীপে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান শিষ্য তিনি। গুরুর দেহত্যাগের অনেক আগে জপ-সিদ্ধ, সাধন জীবনে বহুদূর অগ্রসর রাখাল মহারাজ। পরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের

প্রথম সভাপতি।

প্রথম জীবনেই তাঁর গীতি-কণ্ঠের উল্লেখ আছে 'কথামৃত' গ্রন্থে। বরানগর মঠে তারক মহারাজের সঙ্গে তাঁকে গান গাইতে দেখা যায়। শ্রীযুক্ত তারক আনন্দে শিবের গান ধরিলেন—

'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা।'

তাঁহার গানের সহিত রাখালও যোগ দিলেন। আর গান গাহিয়া দুইজনেই নৃত্য করিতেছেন। এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন।'…

বরানগর মঠে সেই কঠোর তপশ্চর্যার মধ্যে তিনি তবলা চর্চাও করিয়াছিলেন বলে প্রকাশ। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সেখানেও এমন নিবিড় সাঙ্গীতিক পরিবেশ ছিল যে রাখাল মহারাজের তুল্য সমুন্নত সাধকও মগ্ন হতেন সঙ্গীতে: 'বরানগর মঠে যুব রাখাল অবসর মত সামান্য ভাবে অর্থাৎ কার্য চালানো মত একটু বাঁয়া তবলা বাজাইতে শিখিয়াছিল।' (অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান, পৃঃ ৪৬—মহেন্দ্রনাথ দত্ত)।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের একবার সম্পূর্ণ গান গাইবার কথা জানা যায়। সেদিন একক গেয়েছিলেন তিনি। সেটি তাঁর অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে, বারাণসীতে। শ্রীমা সারদাদেবী এবং গোলাপ মা-ও সেবারে কাশীধামে আসেন। তাঁরা এখানে তীর্থবাস করেন 'লক্ষ্মীনিবাস' গৃহে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ অন্যত্র বাসস্থল থেকে শ্রীমার সংবাদ নিতে আসতেন প্রত্যহ। এমনি সময়ের কথা। ব্রহ্মানন্দের একাধারে সদানন্দ কৌতুকপ্রিয় স্বভাবের সঙ্গে গভীর অন্তর্লোকেরও উদ্ঘাটন হতে সেদিন দেখা যায় এই গানের উপলক্ষ্যে।

'ব্রহ্মানন্দজী প্রতি সকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া 'লক্ষ্মীনিবাসে' যাইয়া গোলাপ মার নিকটে শ্রীমায়ের কুশল প্রশ্নাদি করিতেন এবং পরে বালকের মত রঙ্গ করিতেন। এইরূপে একদিন…উপরের বারান্দা হইতে গোলাপ মা বলিলেন, 'রাখাল, মা জিজ্ঞেস করেছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?'

মহারাজ উত্তর দিলেন, 'মার কাছে যে ব্রহ্মানন্দের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।'

এই বলিয়া তিনি বাউলের সুরে গান ধরিলেন—

শঙ্কর চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।
মগ্ন হয়ে রও রে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে॥
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াও রে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধিয়াও রে॥
কমলাকান্তের বাণী, শ্যামা মায়ের গুণ গাও রে।
এ তো সুখের নদী নিরবধি, বাও রে॥

গীত গাহিতে গাহিতে তিনি ভাবোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং উহা শেষ হইবামাত্র 'হো, হো, হো' বলিয়া সবেগে চলিয়া গেলেন। এই অপূর্ব ভাব ও নৃত্য শ্রীমা উপর হইতে দেখিয়া আনন্দ করিতেছিলেন ; আর নীচে দ্রষ্টা ছিলেন মাস্টার মহাশয় ও অপর দুই একজন ভক্ত।'

(শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৩৮০—স্বামী গম্ভীরানন্দ)।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী অখণ্ডানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম বিশিষ্ট ত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্য—সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনে গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯৩৭)। সারগাছি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, অসামান্য সংগঠন শক্তিসম্পন্ন, সেবাব্রত গঙ্গাধর মহারাজ। একাধারে তীব্র বৈরাগ্য ও শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ প্রতিমূর্তি, অনিকেত পরিব্রাজক অখণ্ডানন্দ স্বামী। কঠোর তপশ্চর্যা তুল্য কর্মব্যস্ত তাঁর জীবনে সঙ্গীতের অনুষঙ্গ যেন ধারণা হয় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গধন্য শিষ্যদের পক্ষে তাও সম্ভব। তাঁদের সাধক জীবন, সেবক জীবন, সকলের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে থাকে—সঙ্গীত। সাধনের সঙ্গে ভজনের, মানব সেবার সঙ্গে সঙ্গীতের সহাবস্থান। তাই দেখা যায়, সেবাধর্ম ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক গঙ্গাধর মহারাজও গীত-বর্জিত ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব কালে যেমন, তেমনি পরবর্তী নানা সময়েও পাওয়া যায় অখণ্ডানন্দের গানের কথা।

সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে। একদিন নরেন্দ্র ও গঙ্গাধর গিয়েছিলেন ঠাকুরের ভক্ত মহিম চক্রবর্তীর গৃহে। সেখানে গঙ্গাধর গান গেয়েছিলেন বলে 'কথামৃত' সূত্রে প্রকাশ।

নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।

'নরেন্দ্র—সেদিন মহিম চক্রবর্তীর বাড়িতে আমরা গিছ্‌লাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তারপর ?

নরেন্দ্র—ওর মত এমন শুষ্ক জ্ঞানী দেখি নাই !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি হয়েছিল ?

নরেন্দ্র—আমাদের গান গাইতে বল্‌লে। গঙ্গাধর গাইলে—

শ্যাম নামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়,
সম্মুখে তমাল বৃক্ষ দেখিবারে পায় !

গান শুনে বল্‌লে—ওসব গান কেন ? প্রেম-ট্রেম ভাল লাগে না। তা ছাড়া মাগ ছেলে নিয়ে থাকি, এসব গান এখানে কেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—ভয় দেখেছ !'

(চতুর্থ ভাগ পৃঃ—২৮৭)

কাশীপুরে, শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরের শেষ অবস্থায় তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মতন গঙ্গাধরও উপস্থিত হতেন গুরুর সেবক-রূপে। সেই পর্বে এক চৌকিদারের কাছ থেকে তাঁর একটি ভজন গান নেবার কথা জানা যায় :—

'এই সময়ে একদিন ভাগীরথী-তীরে গঙ্গাধর মধ্যরাত্রে এক পাহারাওয়ালাকে মধুর কণ্ঠে একটি ভজন গাহিতে শুনিয়া মুগ্ধ হয় এবং তাহাকে সম্পূর্ণ গানটি গাহিতে বলে। কাশীপুর বাগানে গিয়া গঙ্গাধর নরেন্দ্রের নিকট ঐ গানের দু-একটি চরণ আবৃত্তি করে। নরেন্দ্র ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হন, এবং সমগ্র গানটি লিখিয়া আনিতে বলেন। পরদিন আবার রাত্রি বারটার সময় গায়ককে বাগবাজারের পুলের কাছে পাইয়া গঙ্গাধর তাদের নিকট হইতে গানটি লিখিয়া লইল এবং পরদিন নরেন্দ্রনাথকে দিল।'

(স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ২০—স্বামী অভেদানন্দ)।

বরানগর মঠের পর্যায়ে ভজন, কীর্তন ও অধ্যাত্ম ভাবের নানা সঙ্গীত গুরু ভাইদের সাধন জীবনে অঙ্গাঙ্গী ছিল। এমনি নানা গান খাতায় সংগৃহীত থাকত নিয়মিত অনুষ্ঠানের জন্যে। আর ঠাকুরের প্রায় সব শিষ্যদেরই গায়ন প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। কখনো তাঁরা গাইতেন সম্মেলক ভাবে, কখনো একক। গঙ্গাধরও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি অন্যত্র শেখা ভজন গানও প্রচলন করেন মঠের ভাইদের মধ্যে। তা ভিন্ন, একটি আরতির স্তবও এনে দেন। এখানে বলে রাখা যায়, গঙ্গাধর মহারাজ বরানগর মঠে স্থায়ী ভাবে আসেন তিব্বত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর।

'গঙ্গাধর…'জয় শিব ওঙ্কার' এই আরতির স্তব আনিয়া দেন। মঠের ভাইরা 'ওয়া গুরুজীকা ফতে' এই জয়জয়কার ধ্বনি যে মাঝে মাঝে করিতেন, তাহাও গঙ্গাধর শিখাইয়াছিলেন।' (কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট)।

'গঙ্গাধর সাধু সন্ন্যাসীগণের নিকট গুরু মহিমাবাচক যেসব ভজন শিখিয়াছিলেন তাহারই দু-একটি নবপ্রতিষ্ঠিত বরাহনগর মঠে প্রবর্তিত করিলেন। তখনও মঠে অন্য কোনো ভজন শুরু হয় নয় নাই।' (স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ২৪—স্বামী অন্নদানন্দ)।

স্বামী অখণ্ডানন্দের আত্মজীবনীতেও মঠের পরিবেশ এবং তাঁর ও গুরু ভাইদের গানের প্রসঙ্গ আছে :—

'ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বরাহনগরে সবারই তীব্র বৈরাগ্য, ইষ্টদর্শনের ব্যাকুলতা। সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে শ্মশানে সারারাত জপধ্যান। ভোরের পাখি ডেকে উঠল। গঙ্গায় ডুব দিয়ে মঠে ফিরে আসা। কোনদিন বা মঠেই সব চেয়ারে বা মাদুরে বসে ঠাকুরের প্রসঙ্গ করতে করতে ধ্যান…যে যে অবস্থায় ছিল সে সেই অবস্থাতেই ধ্যানে লেগে গেল! কেউ বা গুন্‌গুন্ স্বরে গাইছে—

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই

কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই॥

গিরিশবাবু যেন আমাদের মনের ভাব নিয়েই এই গান বেঁধেছিলেন। এই গান আমরা সে সময়ে গেয়ে গেয়ে বেড়াতাম, আর মনে কতকটা শান্তি পেতাম।'

(স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রণীত স্মৃতিকথা)।

পরিণত বয়সেও তাঁর গানের কথা মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। একবার তাঁকে গুরুতর পীড়ার পর মধুপুর পাঠানো হয় স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে। সেখানকার কথায় অখণ্ডানন্দের জীবনীকার জানিয়েছেন—

'শরীর পূর্বাপেক্ষা সুস্থ হওয়ায় এখানে তিনি মাঝে মাঝে ভজন গাহিতেন। স্বামীজী রচিত 'একরূপ অরূপ-নাম বরণ, অতীত আগামী কালহীন'—এই গানটি তাঁহার বিশেষ প্রিয়, ভাবে মগ্ন হইয়া এই গানটি 'দেশ' সুরে চৌতালে অনেকক্ষণ ধরিয়া গাহিতেন।' পৃঃ ২৩৯, স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ)।

কর্মযোগী গঙ্গাধর মহারাজের অপূর্ব সেবাপরায়ণতা, আত্মত্যাগ ও সংগঠন-শক্তি রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনাথ আশ্রমে। মুর্শিদাবাদে বহরমপুরের নিকটে এই সারগাছি আশ্রম। এখানে প্রাত্যহিক কর্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ উপাসনাত্মক সঙ্গীতেরও স্থান নির্দিষ্ট রেখেছিলেন।

তিনি স্বয়ং ও আশ্রম বালকগণ 'প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা সকলে মিলিয়া কিছুক্ষণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা ও তাঁহার নামসংকীর্তনাদি করিতেন।'

(স্বামী অখণ্ডানন্দ, পৃঃ ১৫৬, স্বামী অন্নদানন্দ)।

বারাণসীর প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত একটি পত্রের মধ্যেও স্বামী অখণ্ডানন্দ উল্লেখ করেছেন আশ্রমের এই সঙ্গীত প্রসঙ্গ :

'অনাথদিগকে লইয়া সন্ধ্যার সময় ও প্রত্যহ প্রাতে আধঘণ্টার উপর ভগবদ্ গুণানুকীর্তন করিয়া থাকি, এবং বৈদিক রীত্যনুসারে ভগবানের নিকট তাঁহার তেজ ও বল প্রভৃতি যাহাতে আমাদের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকি।' (তদেব, পৃঃ ১৫৯)।

এখানে 'ভগবদ্ গুণানুকীর্তন' অবশ্যই ভক্তিভাবের গান।'

আরো পরবর্তীকালে তাঁর কাশীতে বাসের সময়েও আছে গান গাইবার কথা :—

'বিজয়ার দিন সন্ধ্যায় নিখিলের সহিত গাড়ী করিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রতিমা বিসর্জন দর্শন করিয়া বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রণাম করিতে গেলেন। বিশ্বনাথের মন্দিরে বসিয়া আছেন তো বসিয়াই আছেন। সব লোক চলিয়া গেল, তিনি উঠিলেন

না। পাণ্ডারাও কিছুই বলিল না। রাত্রি প্রায় ১০টা-১১টায় টাঙ্গা করিয়া ফিরিবার সময় আপন মনে উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতে লাগিলেন—'কখন পুরুষ তুমি, কখন প্রকৃতি।' নিস্তব্ধ শিবপুরীর আকাশ বাতাস যেন সেই সঙ্গীতে স্পন্দিত হইতেছিল। বাড়ি ফিরিয়াও তাঁহার গম্ভীর ভাব কাটিল না।' (ঐ পুস্তক, পৃঃ ২৪১-২৪২)

এমন কি দেহত্যাগের একমাস মাত্র আগেও জানা যায় তাঁর গানের কথা। তখন তিনি অতিশয় অসুস্থ। ৭৩ বছর বয়স, শরীর নিরাময় হবার আর কোনো আশা নেই। সেই অবস্থায়ও তিনি গাইলেন অনেকগুলি গান। তার মধ্যে দুখানি স্বামীজী রচিত—'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ' ও 'একরূপ অরূপ-নাম-বরণ।' সেদিন স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দের একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গাইবারও উল্লেখ করেছেন স্মৃতিচারণে। আর রামপ্রসাদেব গান সম্পর্কে নিজের শ্রদ্ধা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগেব কথাও তিনি জানিয়েছেন।

অখণ্ডানন্দের সেই প্রসঙ্গের দিন হলো ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩৭। বেলুড মঠে সেদিন—'শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পূজা। · সারাদিন উৎসবের আনন্দে কাটিয়া গেল, সন্ধ্যায় আরতির পর একে একে সকলে আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিয়া কাছে বসিতেছে। ...একটি নবাগত ভক্ত গান শুরু করিল। গানের পর গান চলিতেছে।

মহারাজ বলিলেন, 'রামপ্রসাদের গান জানো না? রামপ্রসাদ লক্ষ জবা দিয়ে মাকে পূজা করেছিলেন। এক একটি গান এক একটি জবা। এইসব গান ঠাকুরের কত প্রিয়! এসব ভুললে চলবে না, এসব চালিয়ে যেতে হবে।'

এই সময় জনৈক ব্রহ্মচারী বলিল, 'দশটা বেজেছে।'

মহারাজ বেশ জোর গলায় বলিলেন, 'দশটা বেজেছে তো কি হয়েছে? ভগবানকে ডাকার কি আবার ধরাবাঁধা সময় আছে নাকি? ঘড়ি-টড়ি ঘণ্টা ফণ্টা বাজে। এই দিন কি আর আসবে? আজ মায়ের দিন—বছরের একটা দিন! ভাগলপুরে তানপুরা নিয়ে স্বামীজী গান ধরেছেন—সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা বেজে গেল, গান আর থামে না! শ্রীশ্রীমহারাজের কথা উদ্বোধনে বেরিয়েছে—যোগীর ঘুম ৪ ঘণ্টা আর ভোগীর ঘুম ৬ ঘণ্টা-৮ ঘণ্টা। তোমরা যোগী—ভগবানকে চাও, ঘুমুবে কি করে? আজও যে তাঁকে পাওনি?'

তারপর সেই ব্রহ্মচারী গান ধরিল, 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ—'

মহারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—সোফার উপরেই হাঁটুতে বাঁয়াটি লইয়া গম্ভীর সুরে নিজেই গাহিতে লাগিলেন। এই গানের পর গাহিতে লাগিলেন, 'এক-রূপ অরূপ-নাম-বরণ...।' অবিরাম গান চলিয়াছে। সব গম্ভীর, শান্ত, নিস্তব্ধ! রাত্রি দুপুর হইয়াছে। ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল!

মহারাজ একটু চুপ করিয়াছেন। অপর সকলে গাহিতেছে। অনেকগুলি পুরাতন প্রিয় গান একে একে গাওয়া হইলে বলিলেন, 'আহা! এই এইসব গান গাইতে গাইতে কত রাত কেটে গেছে। হায়! এই ঘুমই তো মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছে। প্রার্থনা কর, যেন ঘুম কমে যায়। ঠাকুর সারারাত মশারির ভেতর বসে ভগবানকে ডাকতেন। লোকে ভাবত বুঝি ঘুমুচ্ছেন। তাঁর ঘুমই ছিল না। তাঁর কাছে যারা ছিল, তারাও ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছিল।...তোমরা যে আমাদের কাছে এসে—ঠাকুরের ছেলেদের কাছে—...কিছু একটু শেখো। (তখন রাত্রি দেড়টা) একটু রাত্রি হয়ে গেছে বলে অমনি সব উঠবার জন্য ব্যস্ত! এই আমি বুড়ো মানুষ, অসুস্থ শরীর—সারাদিন খাইনি কিছু—ঠায় বসে আছি তোমাদের জন্য। গান শুনছি, নিজে গাইছি, এত বকছি, তা এমন কিছু ক্লান্ত হইনি—এতটুকু ঢুস আসেনি...।' (ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ২৯৬-২৯৮)...

গঙ্গাধরের প্রায় সমকালে, ১৮৮৪র মধ্যে, ঠাকুর সন্নিধানে উপনীত হন কালীপ্রসাদ চন্দ্র (১৮৬৬-১৯৩৯)। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম বিশিষ্ট ত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ নামে সুপরিচিত। তিনিও সঙ্গীতজ্ঞ, বিশেষভাবে পাখোয়াজ বাদক। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরই তিনি রীতিমত পাখোয়াজ বাদন শিক্ষা করেন বটে। তবে তা গুরুভাই নরেন্দ্রের সহযোগিতার জন্যে। বরানগর মঠে, সাধন জীবনের সমকালেই। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজী গোপালচন্দ্র মল্লিক (শ্রীরাম চক্রবর্তী-নিতাই চক্রবর্তী ঘরের উত্তরাধিকারী মুরারিমোহন গুপ্তের প্রবীণতম শিষ্য) হলেন কালীপ্রসাদের সঙ্গীতগুরু। বিখ্যাত সাংবাদিক মনীষী কৃষ্ণদাস পালের (সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাতকারের বিবরণও 'কথামৃতে' প্রাপ্তব্য) শ্বশুর গোপালচন্দ্র মল্লিককে অনেক পরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসবে পাখোয়াজসঙ্গত করতে দেখা যায়। দক্ষিণেশ্বরে তখনকার সেইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বাংলার কোনো কোনো আচার্য-স্থানীয় ধ্রুপদী, যথা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। পাখোয়াজ-গুণী গোপালচন্দ্র মল্লিকও ঠাকুরের ভক্তরূপে দক্ষিণেশ্বরের সেই উৎসব বার্ষিকী সঙ্গীতানুষ্ঠানে যুক্ত থেকেছেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পরে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষ্য করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে একটি করিয়া উৎসব হইতে লাগিল।...কুঠীবাড়ীর বড় ঘরটিতে বৈঠকী গান হইত। নারায়ণ চন্দ্র (নারায়ণ দাদা) নামক জনৈক দীর্ঘাকৃতি গৈরিকবসনধারী ব্যক্তি কয়েক বৎসর গান করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে পাখোয়াজও সঙ্গত হইত। সুবিখ্যাত পাখোয়াজ বাজিয়ে গোপাল মল্লিকও উপস্থিত থাকিতেন।...নরেন্দ্রনাথও এক বৎসর অনবরত ধ্রুপদ গান গাহিয়াছিলেন।'

(শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, পৃঃ ১২৫-১২৭, মহেন্দ্রনাথ দত্ত)

বরানগর মঠে কঠিন সন্ন্যাস জীবনের মধ্যেই জানা যায় কালীপ্রসাদের পাখোয়াজ বাদনের কথা। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখের ধ্রুপদ গানের সঙ্গতকার তখন তিনি। অবশ্য এই মঠে তাঁকে প্রধানত দেখা যায়, কঠোর তপশ্চর্যা ও বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন-পরায়ণ রূপে। বরানগর পর্বে তাই তাঁর পরিচিতি—'কালী বেদান্তী' তথা 'কালী তপস্বী'। তবু মঠবাসী তরুণ সন্ন্যাসীদের সঙ্গীত প্রসঙ্গে কালী বেদান্তীকে দেখা গেছে পাখোয়াজ বাদক রূপে। 'কালী বাজনা শিখিতেন।' (কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ পরিশিষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ।) এই বাজনা অবশ্যই পাখোয়াজ।

কালীপ্রসাদের গীতকণ্ঠও যে একেবারে ছিল না তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় সব শিষ্যের মতন তিনিও মঠে সম্মিলিত গানে যোগ দিতেন।

বরানগর মঠে এইভাবে তাঁর কীর্তন গান করা এবং রীতিমত পাখোয়াজ শিক্ষার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁরই আত্মজীবনীতে :—

'স্তবপাঠ ও কীর্তনের সময়ে আমরা ও অন্যান্য সকলে যোগদান করিতাম।'··· (আমার জীবন কথা, পৃঃ ১৭০—স্বামী অভেদানন্দ)।

কিভাবে নিজে পাখোয়াজ শিক্ষা আরম্ভ করলেন, তাও বিশদভাবে অভেদানন্দ জানিয়েছেন—

'সেই সময়ে (বরাহনগর মঠে থাকাকালীন) নরেন্দ্রনাথ যখন ধ্রুপদ গান করিত তখন তাহার সহিত পাখোয়াজ বাজাইবার কোন লোক পাওয়া যাইতনা। গোপালদাদা বাঁয়া তবলা বাজাইতে পারিত, সুতরাং নরেন্দ্রনাথ যখন খেয়াল, ঠুংরি ও ভজনাদি গান করিত তখন গোপালদাদা তাহার গানের সহিত ঠেকা দিত। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ধ্রুপদ গানের সহিত পাখোয়াজ সঙ্গতের অভাব অনুভব করিয়া আমার পাখোয়াজ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। আমি তখনকার প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী গোপাল মল্লিকের নিকট গিয়া তাঁহাকে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি সানন্দে পাখোয়াজ শিক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে পাখোয়াজের বোল ও পরণ খাতায় লিখিয়া আনিয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ অভ্যাস করিতাম। আমার তালজ্ঞান বেশ পাকা ছিল। নরেন্দ্রও সেইজন্য আমার সুখ্যাতি করিত।···আমার শিক্ষার পর নরেন্দ্র যখনই ধ্রুপদ গান গাহিত, আমি তাহার গানের সহিত গাইতাম।···কীর্তনের সঙ্গে বাজাইবার জন্য কিছু কিছু খোলবাদ্যও শিক্ষা করিয়াছিলাম।'···(ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ১৪৩-১৪৪)। তাঁর বিবৃতিতে আরো জানা যায় যে, শুধু বরানগর মঠে নয়, গিরিশচন্দ্র এবং বলরাম বসুর ভবনেও কালীপ্রসাদ পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন নরেন্দ্রনাথের ধ্রুপদ গানের সঙ্গে।

পরবর্তীকালে পাখোয়াজ চর্চার অবকাশ আর অভেদানন্দের মেলে নি।

মঠে সাধক জীবনের সমকালেই মাঝে মাঝে তাঁর পরিব্রাজক পর্যায়, সমগ্র ভারতবর্ষে। তারপর সুদূর বিদেশে তাপসের কর্মজীবন নির্ধারিত হলো। প্রিয় গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দের আহ্বানে অভেদানন্দ যাত্রা করলেন আমেরিকায়। সেখানে বেদান্ত ও ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির ভাবধারা প্রচারাদিতে ভারপ্রাপ্ত হয়ে সুদীর্ঘ ২৫ বছর অবস্থান করলেন। বক্তৃতা, আলোচনা, ক্লাস লেকচার, রচনা ও সংগঠনে দায়িত্ব পালন করলেন সুযোগ্য ভাবে। সেই পরিবেশে বিদেশে এই সঙ্গত যন্ত্রসঙ্গীত ক্রিয়া আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গীত-চিন্তা বিশেষ ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে ধারণা ও অনুরাগ যে কতখানি ছিল তাঁর পরিচয় দিয়েছেন উত্তরকালেও।

দীর্ঘ প্রবাসের পর বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর স্বদেশে নব পর্যায়ে জীবন আরম্ভ হলো। এই পর্বের কর্মধারার মধ্যে প্রকাশ পায় তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য ও অসামান্য মনীষা। বহু মূল্যবান রচনা ও গ্রন্থাদিতে তা বিধৃত। তারই মধ্যে দেখা যায়, সঙ্গীত সম্পর্কে প্রকাশিত, স্বামী অভেদানন্দের কোনো কোনো সুচিন্তিত অভিমত। যথা— The scale with seven notes and three octave of music was known in India centuries before the Greeks had it. It will be interesting to you to know that Wagner was indebted to the Indian science of music, specially for his principal idea of the 'leading motive'.

ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক আধুনিক প্রবক্তা স্বামী অভেদানন্দ। সেই জাতীয়তাবাদী প্রজ্ঞা তাঁর বিপুল রচনাবলীতে যেমন, তেমনি সঙ্গীত সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেও সুপ্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানদের যা অন্যতম বৈশিষ্ট্য, স্বামী অভেদানন্দকেও তেমনি সঙ্গীতপ্রেমী দেখা যায় আজীবন। স্ব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে পূজা আরতির সঙ্গে ভজনাত্মক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান তিনি প্রাত্যহিক নির্দিষ্ট রাখেন।

সঙ্গীত তাঁর অনুরাগের কথা তাঁর আত্মজীবনীর নানা স্থানে সুপ্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত এবং দক্ষিণেশ্বরে আগতা এক পাগলিনী কিন্তু সুকণ্ঠী গায়িকার প্রসঙ্গ স্বামী অভেদানন্দ বিবৃত করেছেন সযত্নে।

স্বামী অভেদানন্দের প্রিয় শিষ্য স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থকার রূপে স্বনামপ্রসিদ্ধ। সুপ্রাচীন কালাগত ভারতীয় সঙ্গীত ধারার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত লিপি-বদ্ধ আছে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের গবেষণালব্ধ বহুমূল্য বিবিধ গ্রন্থাবলীতে। বিশ্ব-সঙ্গীতের এবং ব্যাপক ঐতিহাসিক পটভূমিতে জাতীয় সঙ্গীতের নান্দনিক ও বিভিন্ন পর্যায়ক্রম তিনি নানা পুস্তকে স্বকীয় পাণ্ডিত্য ও মনীষায় গ্রথিত করেছেন। দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ সমাজে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের রচনাবলী ভারতীয় সঙ্গীতের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের

পরিচয় দিয়েছে নতুন করে। তাঁর ব্যবহারিক সঙ্গীতচর্চার সূত্রপাত পূর্বাশ্রমে এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে হয় বটে। তবে স্বামী অভেদানন্দের নিকটে তরুণ বয়সে সন্ন্যাসের দীক্ষা নেবার পরে গুরুর উৎসাহ, আশীর্বাদও পেয়েছিলেন সঙ্গীতসেবায়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সঙ্গীত বিষয়ে যুগান্তকারী গবেষণা গ্রন্থাবলী যে তাঁর সন্ন্যাসোত্তর জীবনে রচিত, তা স্বামী অভেদানন্দের অসামান্য মনীষা-দীপ্ত অধ্যাত্মসম্পদের উত্তরাধিকার (স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পরিবেশে। স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গীত প্রসঙ্গের সূচনা যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে, তা আগেই দেখা গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে মুকুলিত সঙ্গীতচর্চা স্বামী অভেদানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে পরিণতি লাভ করেছে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অপূর্ব ধীশক্তি, মনস্বীতা ও সঙ্গীতজ্ঞানে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলীতে সর্বজ্যেষ্ঠ হলেন স্বামী অদ্বৈতানন্দ। গৃহস্থাশ্রমে তাঁর নাম গোপালচন্দ্র ঘোষ (১৮২৮-১৯০৯)। গুরু ভ্রাতাদের চেয়ে ত বটেই, গুরু অপেক্ষাও আট বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে আরেকজন গোপাল ছিলেন কনিষ্ঠ। প্রথমোক্ত ঘোষ গোপালচন্দ্রকে 'তাই ঠাকুর বুড়ো গোপাল বা মুরুব্বি' আখ্যা দিয়াছিলেন আর ভক্তমহলে তাঁহার নাম ছিল গোপালদাদা বা গোপালদা॥' (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা পৃঃ ৫০১—স্বামী গম্ভীরানন্দ)। 'কথামৃত' গ্রন্থে তাঁকে 'সিঁতির গোপাল' নামেও পাওয়া যায়। কারণ তিনি ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী (বরানগর) সিঁথি নিবাসী।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক শিষ্যদের মধ্যে তিনিই ঠাকুরকে সর্বাগ্রে দর্শন করেন। ১৮৭৫-৭৬ সালে কিংবা তার পরবর্তী বছরে। '১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। বিশ্বনাথ উপাধ্যায় নেপালের 'কাপ্তেন' এই সময়ে আসিতে থাকেন। সিঁতির গোপাল ('বুড়ো গোপাল') ও মহেন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ এই সময়ে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন।' (কথামৃত, প্রথম ভাগ পৃঃ ৫)

শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত, ত্যাগী শিষ্যবৃন্দের অন্যতম স্বামী অদ্বৈতানন্দ তাঁর সঙ্গীতগুণও উল্লেখনীয়। তিনি একাধারে তবলা-বাদক এবং গায়কও।

স্বামী অদ্বৈতানন্দের গুরুভাই এবং বরাহনগর মঠে তাঁর সহবাসী স্বামী অভেদানন্দও তাঁর বাদক পরিচয় বিবৃত করেছেন :—

'তিনি বাঁয়া তবলা বাজাইতে পারিতেন। নরেন্দ্রনাথ যখন তানপুরা লইয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে গান করিতেন তখন তিনি তবলায় ঠেকাও দিতেন।' (আমার জীবনকথা, পৃঃ ১০১—স্বামী অভেদানন্দ)। বরানগর মঠে নরেন্দ্রনাথের গানে গোপাল-দাদার তবলা সঙ্গতের কথা আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে।

গোপালদাদার সঙ্গীত প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ বিবৃত করেছেন, 'সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং বাঁয়া তবলায় হাত খুব মিষ্ট ছিল।' (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা পৃঃ ৫১৫)।

শুধু অনুরাগ কেন? তাঁর গান গাইবারও উল্লেখ উক্ত গ্রন্থকারের বর্ণনাতেই পাওয়া যায়। তা হলো দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের তিরোধানের আগেকার কথা। সেসময় মাঝে মাঝে বুড়ো গোপাল বাস করে যেতেন শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে।

এমনি এক সন্ধ্যায় মন্দিরের উদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণ একা ছিলেন। এমন সময় গোপালদাদা তাঁকে দীক্ষাদানের জন্যে ব্যাকুল প্রার্থনা জানান, নতজানু হয়ে। লাটু মহারাজ সে দৃশ্য দূর থেকে দেখেছিলেন। ঠাকুর তখন তাঁকে কি বলেছিলেন, শোনা যায়নি বটে। কিন্তু তার 'পর হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় সময় গোপালদাকে বিষ্ণুমন্দিরে কীর্তন করিতে দেখা যাইত। ইহা সম্ভবত ১৮৮৫ অব্দের কথা। (ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৫০৪)।

তার দু বছর পরে, বরানগর মঠের সঙ্গীত প্রসঙ্গ। এখানে নিয়মিত অনুষ্ঠানের জন্যে গান সংগ্রহ করে রাখা হত। সম্ভবত এই সংকলনের ভার প্রাপ্ত ছিলেন গোপালদাদা। কারণ শ্রীম. একদিন (৭ মে, ১৮৮৭) দুপুরে এখানে এসে দেখেন—'খাওয়া-দাওয়ার পর মঠের ভাইরা একটু বিশ্রাম করিতেছেন। বুড়ো গোপাল গানের খাতাতে গান নকল করিতেছেন।' (কথামৃত, প্রথম ভাগ, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৫৬)।

তাঁর একদিনের সকৌতুক উল্লেখ দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরে। তা হলো, সহচরীর কীর্তন শুনতে গোপালদাদার ছাতা ভুলে যাওয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের সাবধান করা সত্ত্বেও। আর তাই নিয়ে ঠাকুরের মন্তব্য :—

'ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবার সময় সিঁতির গোপালকে ছাতির কথা বলিয়া গেলেন। গোপাল মাস্টারকে বলিতেছেন,—'উনি বলে গেলেন, ছাতি ঘরে রেখে আসতে।' পঞ্চবটীতলায় কীর্তনের আয়োজন হইল। ঠাকুর আসিয়া বসিয়াছেন। সহচরী গান গাইতেছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন।

গতকল্য শনিবার অমাবস্যা গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠমাস। আজ মধ্যে মধ্যে মেঘ করিতেছিল। হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হইল। ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কীর্তন ঘরেই হইবে স্থির হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সিঁতির গোপালের প্রতি)—হ্যাঁগো, ছাতিটা এনেছ?

গোপাল—আজ্ঞা, না। গান শুনতে শুনতে ভুলে গেছি!

ছাতিটি পঞ্চবটীতে পড়িয়া আছে, গোপাল তাড়াতাড়ি আনিতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি যে এত এলোমেলো, তবু অতদূর নয়।...' (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১৪)।

ঠাকুরের অপর একজন ত্যাগী, সন্ন্যাসী শিষ্য—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। পূর্বাশ্রমে তিনি সারদাচরণ মিত্র (১৮৬৫-১৯১৫, জানুয়ারি)।

তাঁরও গায়নগুণ ছিল। কিন্তু তাঁর স্বদেশে কোনো সঙ্গীত প্রসঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায়নি। জানা গেছে সুদূর আমেরিকায়, সানফ্রান্সিস্কোতে। সেখানেই তাঁর কর্মক্ষেত্র। ১৯০৩ থেকে সেখানে বাস এবং সংগঠন ও প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ত্রিগুণাতীতানন্দ। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, সংগঠনী শক্তিতে সানফ্রান্সিকোয় প্রথম হিন্দুমন্দির স্থাপিত হয়। বেদান্ত সমিতিও। তা হলো ১৯০৬ অব্দের কথা।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের গানের উল্লেখ পাওয়া যায় সেই দূর বিদেশের বিবরণে। সাধন জীবনের অঙ্গাঙ্গী তাঁর সঙ্গীতসেবা।

'তিনি সঙ্গীত ভালোবাসিতেন এবং মনে করিতেন যে, উহা সাধনার এক উত্তম সহায়। অতি প্রত্যুষে তিনি ব্রহ্মচারীদের লইয়া নানাবিধ ভক্তিরসাত্মক গান ও স্তোত্রাদিতে সময় কাটাইতেন। কখনও কখনও ছাত্রদের লইয়া মঠ হইতে মাত্র অর্ধ মাইল দূরে সান্‌ফ্রান্সিকো উপসাগর তীরে উপস্থিত হইতেন এবং অরুণোদয়ের প্রাক্-কালে তাঁহাদের মিলিত কণ্ঠ হইতে উত্থিত সঙ্গীত লহরী সমুদ্র বক্ষে নৃত্য করিতে করিতে দূরে প্রধাবিত হইত।...প্রাতঃ সমীরে সঞ্চালিত সেই মধুর বিশুদ্ধ সঙ্গীত শ্রবণে ধীবর ও নাবিকেরা ক্ষণেকের জন্য এক অলৌকিক রাজ্যের সন্ধান পাইয়া মুগ্ধ অন্তঃকরণে শ্রবণ করিত আর মৌন বিস্ময়ে আশীর্বাদ করিত'

(শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, পৃঃ ২৩ ২৪—স্বামী গম্ভীরানন্দ)।

ওই পুস্তকের সূত্রে আরেকটি সঙ্গীত প্রসঙ্গ জানা যায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের-সেবার বড়দিনের উৎসবে সেখানকার মন্দিরে তিনি সঙ্গীত এবং শাস্ত্রালোচনাদিও করেছিলেন। সে তাঁর জীবনের শেষ বছরে, ১৯১৪ সালের পঁচিশে ডিসেম্বর' (ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ২৯)। তার কয়েকদিন পরেই দেহত্যাগ করেন ত্রিগুণাতীতানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের সঙ্গীত প্রসঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দের নামও যোগ করা যায় যদিও তাঁর গান গাইবার বিবরণ বিশেষ প্রকাশ পায়নি। সম্ভবত শ্রীম. কিংবা অন্য কারুর সামনেও গান না গাওয়ার জন্যে তাঁর গায়ক পরিচিতি নেই 'কথামৃত'-তে। তবু এক-দিন তাঁর গানের পরোক্ষ উল্লেখ দেখা গেছে, তা পরে উদ্ধৃত করা হবে।

স্বামী প্রেমানন্দের স্বভাব ছিল গুপ্ত মহেন্দ্রনাথের তুল্য। অর্থাৎ তিনিও আত্মগোপন-পরায়ণ। চিরদিন আপনাকে প্রচ্ছন্ন রেখে গেছেন। সঙ্ঘের সংগঠনাদির কাযে কিংবা কোনো প্রকারে সর্বসমক্ষে আসতে চান নি পরবর্তী জীবনেও। সেজন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের বাইরে তিনি যথোচিত সুপরিচিত বা প্রসিদ্ধ ছিলেন না। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের যেমন প্রিয়, তেমনি বিশিষ্ট ত্যাগী সন্ন্যাসী—স্বামী প্রেমানন্দ।

পূর্বাশ্রমে তিনি বাবুরাম ঘোষ (১৮৬১-১৯১৮)। শ্রীরামকৃষ্ণের পরম গৃহী ভক্ত, সেবক বলরাম বসুর শ্যালক তিনি।

বাবুরামের আঁটপুর গৃহস্থাশ্রমের একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে রামকৃষ্ণ সন্তানদের জীবনে। বরানগর মঠের প্রথম অবস্থায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তিরোধানের এক বছর পরের সে ঘটনা। নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর ষোলজন গুরু ভ্রাতা সেখানে বিরজা হোম করে যথা-শাস্ত্র সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

বাবুরাম প্রথম থেকেই গুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বৈরাগ্যবান, নিষ্ঠাবান, নম্র স্বভাবে। তাঁর প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্তে সঙ্গীতের অনুষঙ্গ জাগত :—

'বাবুরাম সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 'ও আমার দরদী। আবার সুর করিয়া গাহিতেন,

মনের কথা কইব কি সই ? কইতে মানা,
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।'

(শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমল্লিকা পৃঃ ১৯০-১৯১—স্বামী গম্ভীরানন্দ)।

'প্রেমানন্দের পত্রাবলী' থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া দুখানি নাতি পরিচিত গান পঞ্চম অধ্যায়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

বাবুরামের গানের কথা পরোক্ষভাবে জানা যায় 'কথামৃত' থেকেই। কাশীপুরে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের চার মাস আগেকার কথা :—

'মাস্টার, বাবুরাম প্রভৃতি এখনও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহারা শুনিতেছেন, ভক্তেরা গাইতেছেন—

হরি বোলে আমার গৌর নাচে।

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে বাবুরাম, মাস্টার প্রভৃতিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—'তোমরা নীচে যাও। ওদের সঙ্গে গান কর,—আর নাচবে।'

(বাবুরাম গায়ক না হলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গাইতে বলতেন না মাস্টার মশায়ের সঙ্গে। তাই দেখা গেল—)

'তাঁহারা নীচে আসিয়া কীর্তনে যোগদান করিলেন।'

কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার লোক পাঠালেন গায়কদের কাছে। কয়েকটি আখর গানের মধ্যে যোগ করবার জন্যে তার মারফৎ বলে দিলেন।...

স্বামী প্রেমানন্দের ধরনের গভীরাত্মা সাধক লাটু মহারাজ। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনি এক অনন্য চরিত্র। 'নিরক্ষর তাঁর মুখে অবিরাম ধর্মকথা শুনিবার জন্য বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতেন।'

(শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, পৃঃ ৪৫৯—স্বামী গম্ভীরানন্দ)।

লাটুর (সন্ন্যাস নাম স্বামী অদ্ভুতানন্দ) উপদেশাবলী পাওয়া যায় 'সৎকথা' পুস্তকে।

তিনিও সঙ্গীত-বর্জিত ছিলেন না। আর তাঁকে ঠাকুর যে শক্তি সঞ্চারিত করেন তার অনুষঙ্গেও আছে, সঙ্গীত। একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ—

জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী, তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিণী,
তুমি ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী। প্রসুপ্ত ভুজগাকারা, আধার পদ্ম বাসিনী।
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু,
মূলাধার ত্যজ শিবে স্বয়ম্ভু শির বেষ্টিনী॥
গচ্ছ সুষুম্নার পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত,
মণিপুর অনাহত, বিশুদ্ধাজ্ঞ সঞ্চারিণী॥
শিরসি সহস্র দলে, পরম শিবেতে মিলে।
ক্রীড়া করে কুতুহলে, সচ্চিদানন্দদায়িনী॥

এই যোগ-সঙ্গীতটি গেয়ে লাটুকে শক্তি সঞ্চার করে দেন :—

'এক ব্রাহ্মমুহূর্তে সকলকে আপন প্রকোষ্ঠে ধ্যানে বসাইয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—'জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী,' ইত্যাদি। হঠাৎ লাটু 'উহু' রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রবণমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দুই স্কন্ধে হস্ত সংস্থাপন পূর্বক চাপিয়া ধরিলেন। লাটু যেন আসনে থাকিতে পারিতেছিলেন না—শীঘ্রই বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন; কিন্তু ঠাকুরের গান সমভাবেই চলিতে লাগিল।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, পৃঃ ৪২৫—স্বামী গম্ভীরানন্দ)।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয়, সন্ন্যাসী শিষ্য লাটু মহারাজ। গুরুর অন্তরঙ্গ পরিকর রূপে দক্ষিণেশ্বরে তিনি অনেকদিন বাসের সুযোগ পেয়েছেন। ঠাকুরকে একান্ত নিষ্ঠায় অনুসরণের ফলে তিনি রামকৃষ্ণময় থাকতেন অন্তরে। এমন কি, স্বামী গম্ভীরানন্দের বিবৃতি অনুসারে, গুরুকে ধ্যান জ্ঞান করায় লাটুর বহিরঙ্গ অর্থাৎ মুখভাবের প্রতিকৃতিও শ্রীরামকৃষ্ণের সদৃশ হয়েছিল।

রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গীত প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে লাটুর পূর্ব পরিচয়। বিহার প্রদেশের এক পল্লী অঞ্চল থেকে কলকাতায় গৃহ পরিচারক-রূপে আগত তিনি। আর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে ও দৃষ্টান্তে এক উচ্চকোটির সাধন জীবনে তাঁর উত্তরণ তথা সিদ্ধিলাভ। 'ঠাকুর যাকে ছুঁয়েছেন সে সোনা হয়ে গেছে'—স্বামীজীর এই উক্তির এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ স্বামী অদ্ভুতানন্দ।

তাঁর পূর্বাশ্রমের প্রকৃত নাম, রাখতুরাম। কলকাতায় মৌখিক উচ্চারণে 'রাখতু' হয় লালটু। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহস্বরে লাটুতে পরিণত।

রাখতুরামের জন্ম বিহারের ছাপরা জেলার গ্রামাঞ্চলে। তাঁর জন্মসন সঠিক জানা যায়নি, আনুমানিক ১৮৬২ অব্দ।

তাঁদের পারিবারিক বৃত্তি ছিল মেষপালকের। রাখতুও বাল্যকাল থেকে গোচারণাদির কাজে অভ্যস্ত হন। রাখালদের সঙ্গে সুন্দর উদার নৈসর্গিক দৃশ্যের মধ্যে গোচারণের সময় প্রকাশ পায় তাঁর সরল ভক্তপ্রকৃতি ও সঙ্গীতাসক্তি। সহজানন্দে কিশোর রাখতু সেই পরিবেশে গান গেয়ে উঠতেন :—

'সৌন্দর্যময় প্রাকৃতিক পটভূমিকা স্বভাবতই তাঁহার ভগবত্প্রবণ মনকে উদ্বেলিত করিয়া সঙ্গীত জাগাইতে, 'মনুয়া, সীতারাম ভজন কর্ লিজিয়ে' ।...,

(শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, পৃঃ ৪২২—স্বামী গম্ভীরানন্দ)।

পরে রাম দত্তের গৃহ কর্মে নিযুক্ত থাকা কালে গুরু দর্শন করেন রাখতুরাম। ক্রমে তাঁর জীবনের গতিপথ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। ঠাকুরের চিহ্নিত শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত রূপে গণ্য হলেন লাটু মহারাজ নামে।

গুরু-ভ্রাতাদের সম্মিলিত কীর্তন ও ভজনে লাটুও যোগ দিতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে এমনি কীর্তন অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে জানা যায় তাঁরই ভাবাবেশ এবং ধ্যানের প্রসঙ্গ :

'ঠাকুরের আহ্বানে যুবক ভক্তগণ কীর্তনে যোগ দিতেন এবং নাচিতেন। তিনি একদিন জগদম্বাকে জানাইলেন, 'মা, তোর যদি ইচ্ছা হয়, এই ছেলেদের একটু ভাবটাব হোক।' ইহার পরেই কীর্তনকালে লাটু এমন হুঙ্কার তুলিলেন যে, সারা মন্দিরটি গম্‌গম্‌ করিত। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে কীর্তন খুব জমিয়াছিল। কীর্তনান্তে খোকা মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজকে এই যে কীর্তন হল, এর মধ্যে ঠিক ঠিক ভাব কার হয়েছিল ?' ঠাকুর একটু ভাবিয়া বলিলেন, 'আজ লেটোরই ঠিক ঠিক ভাব হয়েছিল, আর সবার অল্প অল্প।' তবে ঠাকুর বাড়াবাড়ি ভালবাসিতেন না, তাই একদিন লাটুকে সাবধান করিয়া দিলেন, 'ওরে বেশি নাচুনি কাঁদুনি ভাল নয় ; ওতে সময় সময় ভাবভঙ্গ হয়ে যায়। ভাবকে গোপন করতে না পারলে ভাব অন্তর্মুখী হতে চায় না।' (ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩৬-৪৩৭)।

পরিণত জীবনেও লাটু মহারাজের গান গাইবার আরো কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়।

'লাটু যখনই অবসর পাইত তখনই নির্জনে ও নিঃসঙ্গ হইয়া নাম করিতে বা ভজন গানের দু'এক কলি গাহিতে থাকিত। তাঁহার মনোমত দু একখানি ভজনগান আমরা জানি—'মনুয়ারে সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে। ভুখে অন্ন, প্যাসে পানি, নাগা বস্ত্রী দিজীয়ে।' আর একখানি—'রামনাম সুখধাম ভজলে মনুয়া।' যেদিন তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইত, সেদিন পথ চলিতে চলিতে নাম ও গান চলিতে থাকিত।...সন্ধ্যায় দেবদেবীর আরতি দেখিয়া বিষ্ণুমন্দিরে গিয়া (শেষের ক বছর) কীর্তন করিতে থাকিত। কোনো কোনো দিন ঠাকুরের ঘরে কীর্তন করিত।' (পৃঃ ২০৬ ২০৭,

শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়)। ওই গ্রন্থ থেকে আরো জানা গেছে যে লাটু ছিলেন অত্যন্ত কীর্তনপ্রিয়। রামচন্দ্র দত্তের গৃহে থাকবার সময় রাস্তায় কীর্তন সম্প্রদায় দেখলে ছুটে যোগদান করতেন। বহুক্ষণ থাকতেন সেখানে। দক্ষিণেশ্বরে সংকীর্তনে লাটু অন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মহা উল্লাসে নৃত্য করতেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দের দেহত্যাগ হয় বারাণসীতে, ১৯২০ সালে। কেদার ঘাটের নিকটে, ৯৬ সংখ্যক হাড়ার বাগ বাড়িতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগোষ্ঠীতে কয়েকজন আছেন যাঁদের স্বতন্ত্রভাবে গান গাইবার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় নি। তবু নিশ্চিতভাবে বলা যায় না তাঁদের গীতকণ্ঠ ছিল কি-না। কারণ ঠাকুর তাঁর সব শিষ্যকেই কীর্তনে ভজনে যোগ দিতে বলতেন একক কিংবা যুক্তকণ্ঠে। তাঁরা সে আদেশ মান্য করে সম্মিলিত কীর্তন করতেন। তাঁর তিরোভাবের পরে, বরানগর মঠেও তার উল্লেখ পাওয়া যায় 'কথামৃত' প্রমুখ পুস্তকে। তাহলেও বলতে হয়, তাঁর কজন ত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্যের গানের কথা জানা যায় নি নির্দিষ্টভাবে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, তাঁদের সঙ্গীতগুণ তেমন বিশিষ্টরূপে না থাকায় জীবনীতে উল্লিখিত হয় নি। ঠাকুরের এমন শিষ্য খুবই সংখ্যাল্প।

তাঁরা হলেন—শশীভূষণ চক্রবর্তী (রামকৃষ্ণানন্দ—১৮৬৩-১৯২২), হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯২২, তুরীয়ানন্দ, যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (যোগানন্দ—১৮৬১-১৮৯৯), নিরঞ্জন ঘোষ (নিরঞ্জনানন্দ,—১৮৬২-১৯০৪) সুবোধচন্দ্র ঘোষ (সুবোধানন্দ—১৮৬৭-১৯৩২। ইনি সর্বকনিষ্ঠ বলে 'খোকা মহারাজ' নামেও কথিত হতেন, লাটুর শেষোক্ত প্রসঙ্গে যেমন দেখা গেছে) এবং হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (বিজ্ঞানানন্দ—১৮৬৮-১৯৩৪, ঠাকুরের কাছে তিনি এসেছিলেন আরো পরে)।

তাঁদের মধ্যে যোগানন্দের সঙ্গীত প্রসঙ্গে অনুমানের অবকাশ আছে। তিনি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কাম জয় করা যায় কিভাবে?'

ঠাকুর জানান, 'খুব হরিনাম করবি, তাহলেই যাবে।'

যোগানন্দ কি তারপর থেকে 'হরিনাম' অর্থাৎ 'হরিসঙ্কীর্তন' করতে পারেন না? শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় এমন তো দেখা গেছে তাঁর একাধিক ভক্ত পার্ষদের জীবনে!

আর শশী মহারাজ বা রামকৃষ্ণানন্দের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কারন তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে সঙ্গীতের একটি অনুষঙ্গ আছে। এখানে স্মরণ করা যায়, শশী মহারাজই অপূর্ব নিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য পূজা প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন, বরানগর মঠে। আর তিনিই গুরুর ভাবধারা সর্বাগ্রে দাক্ষিণাত্যে প্রচার করেন। পরে স্বামী নির্মলানন্দ সেই ভাবাদর্শকে সংগঠিত রূপে স্থায়িত্ব দেন দক্ষিণ ভারতব্যাপী আঠারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে।

অন্তিম ক্ষণের দিন তুয়েক আগে শশী মহারাজের এক অলৌকিক, সূক্ষ্ম দর্শন হয়েছিল। সে বিষয়ে তিনি জানান, বিখ্যাত গায়ক পুলিনবিহারী মিত্রকে। আর, একটি গানের পঙ্‌ক্তি পুলিনবাবুকে দিয়ে বলেন—তিনি যেন গিরিশচন্দ্রকে সেটি দেন সেই সূত্রে একটি গান রচনার অনুরোধ করে। পঙ্‌ক্তিটি হলো—'পোহাল দুঃখ রজনী।' স্বভাব-গীতস্রষ্টা গিরিশচন্দ্র ওই বাণী অনুসারে গানখানি রচনা করে দেন। বেহাগ রাগে সুর সংযোজনা করে পুলিনবিহারী মিত্র তা গেয়ে শোনালেন রামকৃষ্ণানন্দের শেষ শয্যাপার্শ্বে।

মুদিত চক্ষে আবিষ্ট হয়ে বহুক্ষণ তিনি গানটি শুনালেন—

পোহাল দুঃখ রজনী !
গেছে 'আমি, 'আমি' ঘোর কুস্বপন ;
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ ;
হের জ্ঞান-অরুণ-বিকাশে, হাসে জননী ॥
বোল উচ্চ তান, গাও জয় জয় ;
বাজাও দুন্দুভি, শমন বিজয়,
মার নামে পূর্ণ অবনী ॥
কহিও জননী, 'কেঁদো না, রামকৃষ্ণপদ দেখ না।
নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা ;
(হের) মম পাশে করুণার দুটি আঁখি ভাসে।
ভুবন তারণ গুণমণি ॥

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উদ্দীপ্ত মুখ থেকে শেষ কথা শোনা যায়—'ঠাকুর, মা, স্বামীজী এসেছেন ; আসন পেতে দে…' (ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৩৭৩-৩৭৪)।
স্বামী তুরীয়ানন্দ বা হরি মহারাজের কথাও একটু আছে সঙ্গীত প্রসঙ্গে। তিনি গায়নক্ষম ছিলেন না হয়ত, কিন্তু বিলক্ষণ সঙ্গীতপ্রেমী। তাঁর বোসপাড়ার গৃহে নিয়মিত গান বাজনা হতো। নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত নানাদিনে গান গেয়েছেন সেখানে। প্রসঙ্গত বলা যায়, গঙ্গাধর মহারাজও ছিলেন বোসপাড়া নিবাসী এবং হরির বাল্যবন্ধু। দুজনেই কিশোর বয়সে একসঙ্গে দীননাথ বসুর ভবনে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। তারপর থেকে দুজনেরই একসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত। তুলসী মহারাজও (স্বামী নির্মলানন্দ) আবাল্য বোসপাড়াবাসী এবং এখান থেকেই সন্ন্যাসী-রূপে যোগ দেন বরানগর মঠে। স্বামী নির্মলানন্দও অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়। পরবর্তী-কালের বিখ্যাত গায়ক, বাগবাজার নিবাসী অনাথনাথ বসুকে স্বামী নির্মলানন্দ বিশেষ পোষকতা করেন তাঁর প্রথম সঙ্গীত-জীবনে, বোম্বাইয়ের সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভে।

বাগবাজার বসুপাড়ার তিন গুরু ভ্রাতাই (অখণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ এবং নির্মলানন্দ) আজীবন সঙ্গীতপ্রিয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র শিষ্যা—গৌরীমা নামে সুপরিচিতা। উচ্চ-কোটির সাধিকা তিনি। অসামান্য তাঁর ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং সাধন-জীবন। আর তিনি অনুপ্রাণিত সাংগঠনিক কর্মশক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী-পরিচালিকা রূপে। তাঁর দীর্ঘ জীবনকাল ১৮৫৭ থেকে ১৯৩৭ অব্দ।

গৌরদাসী বা গৌরীমার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দক্ষিণেশ্বরে সাক্ষাৎকার এক অলৌকিক বৃত্তান্ত। ঠাকুরের গানের অধ্যায়ে তা বিবৃত করা হয়েছে, কারণ সেদিনও তাঁর সঙ্গীত প্রসঙ্গ ছিল। যাই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণই হন সাধিকার দীক্ষা-গুরু।

এখানে বক্তব্য এই যে, গৌরীমার সঙ্গীতগুণও ছিল বিলক্ষণ। তিনি একাধারে গায়িকা এবং গীত-রচয়িত্রী। সাধন-জীবনের অঙ্গাঙ্গী তাঁর সঙ্গীত। মধুরকণ্ঠে তিনি ভক্তিগীতি গাইতেন আরাধনা স্বরূপ। তাঁর রচিত গীতাবলীও অধ্যাত্ম বিষয়ে। তাঁর রচিত একটি গান উল্লেখনীয়—'অভয় পরমানন্দ পেয়েছি মা, তোমার পদ কমলে।'

ভক্তিমতী সত্তা এবং গীত-গুণ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, বলা যায়। কারণ তাঁর জননীও সুকণ্ঠী গায়িকা এবং সঙ্গীতরচয়িত্রী। কন্যাকে সাধিকা জীবনে মুক্তবন্ধ হতে, সহযোগিতা করেছিলেন তিনি। বিবাহের রাত্রিতে গৌরীর 'গৃহত্যাগ তথা বৈরাগ্যের পথে যাত্রা মাতার সাহায্যে সুগম হয়েছিল। প্রথম যৌবনকাল থেকেই যোগিনী, পরিব্রাজিকা গৌরদাসী। বারাণসীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে পরিচয়ও তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের এক বিশিষ্ট সম্পদ। এমন মহাসাধিকার আধার না হলে শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যারূপে নির্বাচন করতেন না তাঁকে।

গৌরীমার জননী গিরিবালা দেবী। তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা। ঠাকুর সন্নিধানে গিরিবালাও উপনীতা হতেন। তাঁর সঙ্গীত গুণের সমাদর করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। গৌরীজননী শুধু গায়িকা নন, ধর্মসঙ্গীত রচয়িত্রীও। গিরিবালা দেবীর সুমিষ্ট কণ্ঠে তাঁর স্বরচিত গান ঠাকুর পরিতৃপ্ত হয়ে শুনেছেন বলে প্রকাশ।

'গিরিবালা রচিত মাতৃসঙ্গীত তাঁহারই সুমধুর কণ্ঠে শুনিতে ঠাকুরের ভালো লাগিত।'
(গৌরীমা, পৃঃ ১০০—দুর্গাপুরী দেবী)।

শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত ত্যাগী শিষ্যবর্গ এবং শিষ্যার গীত বৃত্তান্ত এই পর্যন্ত। তাঁর কয়েক-জন অন্তরঙ্গগৃহী ভক্ত শিষ্য (যথা—গুপ্ত মহেন্দ্র, রাম দত্ত) সেবকের (রামলাল) গানের বিবরণও আগে দেওয়া হয়েছে। এখন শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে অবশিষ্ট ভক্ত পার্ষদ সেবকদের সঙ্গীত প্রসঙ্গ।

তাঁদের এবং সকলের মধ্যেই বিশিষ্ট বর্ণনীয় হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)।

তৎকালীন বাংলার স্বনামধন্য, বিচিত্রকীর্তি রূপদক্ষ। স্বদেশের ব্যবসায়ী নাট্যশালার জনক এবং লালনপালন-কর্তা তিনি। নটকুলতিলক, নাট্যাচার্য নাট্যকার ও গীতি-নাট্যরচয়িতারূপে, গুণে ও পরিমাণে, তাঁর দানে বাংলার নাট্যসাহিত্য পরিপুষ্ট, লাবণ্যযুক্ত। একাধারে গুণশালী গীতস্রষ্টা এবং কবি, মনস্বী, জ্ঞানী। সাধারণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথাদি বিভিন্ন বিষয়েও তাঁর অনেক রচনা কর্মব্যস্ত জীবনের স্বল্প অবসরেও নানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। অপরদিকে সুরাপায়ী, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র। আবার দর্পী এবং প্রভূত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। এ হেন গিরিশচন্দ্রের, শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক প্রভাবে, পরম বিশ্বাসী ভক্তে পরিণতি ঘটে। কিন্তু এখানে তাঁর সে অন্তরঙ্গ পরিচয় দেবার অবকাশ নেই। শুধু উল্লেখ্য, তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার-রূপে ধারণা করেছিলেন রাম দত্তের তুল্য।

আর স্মরণীয়, পরমহংসদেবের ভাব অবলম্বনে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' চরিত্র সৃষ্টি। নাম ভূমিকার এই নাটক অভিনয়ে হাতিবাগান স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হয়েছিল (১৮৮৮, মে ২৪), ফুলদোলের দিন। অমৃতলাল বসু ওই প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হন। অন্যান্য ভূমিকায় মঞ্চে দেখা দেন—অমৃতলাল মিত্র, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, বেলবাবু অর্থাৎ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, কাদম্বিনী, হরিমতী, গঙ্গামণি প্রমুখ স্বনামপ্রসিদ্ধ নট-নটী। নাট্যশিক্ষক—অমৃতলাল বসু। সঙ্গীত পরিচালক—রামতারণ সান্যাল। নৃত্য শিক্ষক—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী এই নাটকে একটি পাহাড়িয়া বালকের বেশে প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন, ন বছর বয়সে।

কিন্তু, 'নূতন রঙ্গমঞ্চে—নব উদ্যমে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যথাসাধ্য মতো অভিনয় করিলেও 'নসীরাম' সর্বসাধারণের মনোহরণে সমর্থ হয় নাই। নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন,—'চিন্তাশীল দর্শকেরা 'নসীরাম' খুব লইয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ দর্শক সেরূপ ভাব গ্রহণ করিতে পারে নাই। কারণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবকে মূর্তিমন্ত করিয়া 'নসীরাম' চরিত্র গঠিত। সে সময়ে পরমহংসদেবের বাণী সাধারণ মধ্যে ততটা প্রচারিত হয় নাই,—বোধ হয়, এই ভাবগ্রহণে অক্ষমতাই ইহার প্রধান কারণ। ক্রমে পরমহংসদেব সম্বন্ধে নানারূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে স্টার থিয়েটারে পুনরায় যখন 'নসীরাম' অভিনয় করিয়াছিলেন, সে সময়ে 'নসীরাম' খুব জমিয়াছিল। এই নাটকের গানগুলির বিশেষত সোনার (ভূমিকায় যশস্বিনী গায়িকা অভিনেত্রী গঙ্গামণি—বর্তমান লেখক) গানের তুলনা হয় না। গিরিশবাবুর কি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, কি শ্যামাবিষয়ক গান—মহাজন পদাবলীর পরেই

উল্লেখযোগ্য।'

স্টার থিয়েটার ব্যতীত ক্লাসিক, মিনার্ভা ও আর্ট থিয়েটারেও 'নসীরাম' অভিনীত হইয়াছিল। নসীরাম ও সোনা গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টি,—দর্শকগণ ইহাদের অপূর্ব-ভাবে অপূর্ব আনন্দলাভ করিতেন।' (গিরিশচন্দ্র পৃঃ ৩৪৯-৩৫০—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)।

(শ্রীরামকৃষ্ণ-গিরিশ যুক্ত প্রসঙ্গে আরো একটি নাটকীয় চরিত্র উল্লেখনীয়। ক্লাসিক থিয়েটারে ১৯০১-এ অভিনীত গিরিশচন্দ্রের 'মনের মতন' নাটকে 'ফকির' ভূমিকা। এই চরিত্রটিও 'পরমহংসদেবের ভাবে অনুপ্রাণিত' (গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ৪৬৭—অবিনাশ-চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)।

গিরিশচন্দ্র রচিত গীতাবলীকে নট-নাট্যকার-গীতরচয়িতা অমৃতলাল বসু বলেছেন, 'মহাজন পদাবলীর পরেই উল্লেখযোগ্য।' কবি-গীতিকার অমৃতলালের এই প্রশংসা অতিকথন নয়। এক হাজারেরও বেশি গান রচনা করেন গিরিশচন্দ্র। তার মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক গীত উচ্চভাবে ও বাণীতে উৎকৃষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের 'চৈতন্যলীলা' প্রমুখ নাটকের কোনো কোনো গানের বিশেষ সুখ্যাতি করেছিলেন। স্বামীজীর অতি প্রিয় ছিল তাঁর রচিত 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই' গানটি। গিরিশ গীতাবলী সম্পর্কে এসব প্রশংসাও স্মরণীয়।

গিরিশ-জীবনীকার তাঁর গান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আমরা বহুবার বলিয়াছি যে গীতরচনায় গিরিশচন্দ্র সিদ্ধ কবি। এমন ভাব এবং রস নাই, যাহা লইয়া গিরিশচন্দ্র গান রচনা করেন নাই।' (ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭৩)।

কিন্তু শুধু গীতিকার-রূপে নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদমণ্ডলীতে আরেকটি সঙ্গীত-গুণে গিরিশচন্দ্রের প্রসঙ্গ বর্ণনীয়। তাঁর এই পরিচয় অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত সুবিস্তৃত জীবনীতেও যথোচিত উল্লিখিত হয় নি। এজন্যে অনেকের নিকটেই তা চমৎকার সংবাদ স্বরূপ গণ্য হতে পারে। একমাত্র 'কথামৃত' 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সাহিত্যেই গিরিশচন্দ্রের সেই অপ্রকাশিত গুণটির সমাচার বিবৃত।

অবশ্য গিরিশচন্দ্র যে গান ও নৃত্যের বোদ্ধা ছিলেন, তাঁর কোনো কোনো নাটকের বিশেষ গান ও নৃত্যের একটি ডৌল তিনি যে নিজে করে দিতেন সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালকের জন্যে—একথা তাঁর জীবনী-লেখক জানিয়েছেন—'তিনি স্বয়ং নৃত্যগীতে পারদর্শী না হইলেও একজন উচ্চদরের সমঝদার ছিলেন, তাঁহার নাটকাদির গানে যে সকল সুর বা নৃত্য সংযোজিত হইত, তন্মধ্যে যেগুলি তাঁহার মনোমতো না হইত, —সে সকল গান বা নৃত্যের ভাবোপযোগী তিনি একটি 'আদরা' করিয়া দিতেন,—সেই আদর্শে সঙ্গীত এবং নৃত্যশিক্ষক—উভয়ে গানের সুর ও নৃত্যের ভঙ্গি ঠিক

করিয়া লইতেন। আবু হোসেন গীতিনাট্যের 'রাম রহিম না জুদা করো' গীতটির সুর সঙ্গীতাচার্য দেবকণ্ঠবাবু এবং বর্তমান সীতারাম নাটকের উড়েনীগণের নৃত্যের ভঙ্গি নৃত্যাচার্য রাণুবাবু এইরূপে গিরিশচন্দ্রের নিকট ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। 'বিষাদ', নাটকের 'হেরি চম্পক কলি পড়ে—ঢলি ঢলি' গীতিটির সুর স্বয়ং গিরিশচন্দ্র দিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বহু সঙ্গীতের সুরের মুখপাত তাঁহারই করা।'

(ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৪৫৩)।

জীবন চরিত লেখক এখানে প্রকারান্তরে জানিয়েছেন গিরিশচন্দ্রের সুরকার পরিচয়। স্বরচিত কোনো কোনো গানে তিনি যে সুরের প্রাথমিক রূপ দেন তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আপনার গানের সুরসংযোজক হবার যোগ্যতা গিরিশচন্দ্রের ছিল কিছু পরিমাণে। তা তাঁর প্রথম যৌবনকালে অর্জিত সঙ্গীতজ্ঞানের সুফল। এ বিষয়ে তিনি নিকট-আত্মীয় ব্রজনাথ দেবের নিকট ঋণী।

ব্রজনাথ হলেন গিরিশচন্দ্রের শ্যালক; তাঁর প্রথমা স্ত্রীর (দানীবাবুর জননীর) অগ্রজ। ব্রজনাথ যেমন নাট্যরসিক, তেমনি রীতিমত সঙ্গীতবিদ্। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্রকৃষ্ণ—নন্তিবাবু নামে প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক, সুবিখ্যাত দক্ষিণাচরণ সেনের ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার অন্যতম প্রধান যন্ত্রী। ব্রজনাথের দ্বিতীয় পুত্র চুণীলাল দেব—দানীবাবুর সমকালীন প্রথিতযশা অভিনেতা। তৃতীয় নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণও কৃতী নট। শ্যামপুকুরে ব্রজনাথদের গৃহে 'সধবার একাদশী' নাটক দ্বিতীয়বার মঞ্চস্থ হয় (:৮৬৯ অব্দে, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাত্রে)। গিরিশের নেতৃত্বে (নিমচাঁদের ভূমিকাও তাঁর) এবং 'দি বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার' সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সেই সব অভিনয়ই ঐতিহাসিক ন্যাশনাল থিয়েটারের অগ্রদূত, প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়। ব্রজনাথ দেব এবং গিরিশচন্দ্রের সঙ্গীত-চর্চা সম্পর্কে আর কয়েকটি কথা জ্ঞাতব্য।

'ব্রজনাথবাবু গিরিশবাবুর শুধু নিকট আত্মীয় নয়, সখা, সহচর ও সোদরপ্রতিম বন্ধু…। শৈশবে ইহারা এক বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, যৌবনে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রজবাবু গিরিশবাবু অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়…উভয়ে…জন এ্যাট্কিন্‌সন কোম্পানীর অফিসে কার্য…ব্রজবাবু…বুককিপার এবং গিরিশবাবু সহকারী বুককিপার।…ব্রজবাবু কেবল নাট্যামোদী ছিলেন না, তিনি একজন সুবিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন।…সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক জোয়ালাপ্রসাদ, নিমাই অধিকারী (সঙ্গীতাচার্য বেণীবাবুর পিতা) প্রভৃতি ওস্তাদেরা বেতন লইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন। যখন যে গুণী গায়ক ও বাদক কলিকাতায় আসিতেন, ব্রজবাবুর যত্ন ও সঙ্গীতানুরাগে বাধ্য হইয়া তাঁহারা ব্রজবাবুর বাটীতে আসিয়া সঙ্গীতালোচনা করিয়া আনন্দ করিতেন। এই সূত্রে গিরিশবাবু রাগরাগিণী ও তান লয় সম্বন্ধে ব্রজনাথবাবুর

নিকট মোটামুটি একটা জ্ঞানলাভ করেন। উত্তরকালে এই শিক্ষার ফলে তিনি রঙ্গালয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষকগণকে বরাবর উপদেশ ও শিক্ষা প্রদানে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।' (ঐ গ্রন্থ ; পৃঃ ৭৫-৭৮)

কিন্তু তাঁর সঙ্গীত প্রসঙ্গে জীবনীকার এত কথা লিখিলেও, জানান নি যে, গীতকণ্ঠও ছিল গিরিশচন্দ্রের। নট-নাট্যকার-নাট্যাচার্য যে গান গাইতেও সক্ষম একথা তাঁর কোনো জীবনী কিংবা সম্পর্কিত রচনায় প্রকাশ পায় নি। সম্ভবত অবিনাশচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল গিরিশচন্দ্রের গায়ক গুণের কথা, দীর্ঘ পনের বছর কাল তিনি নাট্যকারের অনুলিপিকাররূপে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও। তার কারণ এই হওয়া সম্ভব যে গিরিশচন্দ্র তাঁর সমক্ষে কখনো গান করেন নি কিংবা নিজের এই গুণ সম্পর্কে কোনোদিন জানান নি। তা ছাড়া, নাট্যকারের গায়ক পরিচয়টি নিতান্তই গৌণ। হয়ত তিনি স্বয়ং নিজের গায়নশক্তি বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। যতদূর বোঝা যায়, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণসন্নিধানে গান গেয়েছিলেন গিরীশচন্দ্র। সেইজন্যেই এ বিষয় অন্য কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। গিরিশচন্দ্রের গান গাওয়াও কি ঠাকুরের আশীর্বাদ তথা সঙ্গ-প্রেরণার ফল? তাঁর একাধিক পার্ষদ যেমন গান গেয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রভাবে? যাই হোক, গিরিশচন্দ্র যে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে গান গেয়েছিলেন তা বিবৃত আছে 'কথামৃত' গ্রন্থে। সুতরাং এ সাক্ষ্য প্রামাণিক। গিরিশচন্দ্র ও 'কালীপদ' নামে ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত একযোগে তাঁর সামনে গান শোনান শ্যামপুকুর গৃহে। শ্রীম. উক্ত কালীপদ নামধারীর অন্য কোনো পরিচয় দেন নি বটে। কিন্তু তাঁর বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য আছে গিরিশ জীবনীতে। তাঁর সম্পূর্ণ নাম কালীপদ ঘোষ। তিনিও গিরিশ-সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও পার্ষদরূপে অনেক দিন তাঁকে দর্শন করতে গেছেন। ঠাকুরের কথায় গানও গেয়েছেন একাধিকবার। গিরিশচন্দ্রের বিশিষ্ট সুহৃদও তিনি। গিরিশচন্দ্র আপনার 'শঙ্করাচার্য' নাটকটি (২রা মাঘ ১৩১৬ সালে মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত। নাম ভূমিকায় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বা দানীবাবু)—'তাঁহার যৌবন সুহৃদ এবং গুরুভ্রাতা 'জন ডিকেন্‌সন কোম্পানী'র সর্বময় কর্তা স্বর্গীয় কালীপদ ঘোষকে উৎসর্গ করিয়াছেন। যথা—

> 'আনন্দময় সহচর আনন্দধামবাসী—কালীপদ ঘোষ।
>
> ভাই, আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরের মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ—তুমি নরদেহে আমার 'শঙ্করাচার্য' দেখলে না। আমার এ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ করলেম, তুমি গ্রহণ কর। গিরিশ।' (তদেব, পৃঃ ৫৭১)

গিরিশচন্দ্র এবং কালীপদ শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে একদিন পাঁচখানি গান গেয়েছিলেন।

পরমহংসদেবের শ্যামপুকুরে বাসকালে, কালী পূজার দিন। শ্রীম.ও ঠাকুরকে সেদিন যে গান শোনান তা গুপ্ত মহেন্দ্রের গীত প্রসঙ্গে আগেই উল্লিখিত।

শ্যামপুকুর বাড়ির সেই দোতলার ঘরে তখন ঠাকুরের কাছে রয়েছেন চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার, অধ্যাপক নীলমণি, রাখাল মহারাজ, গিরিশচন্দ্র, নিরঞ্জন, শ্রীম, লাটু মহারাজ, কালীপদ ঘোষ ও আরো কয়েকজন ভক্ত।'

'ডাক্তার মহেন্দ্রলাল গিরিশকে বলিতেছেন, 'তোমার ঐ গানটি বেশ—বীনের গান—বুদ্ধচরিতের।'

ঠাকুরের ইঙ্গিতে গিরিশ ও কালীপদ দুইজনে মিলিয়া গান শুনাইতেছেন—

আমার এই সাধের বীণে যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার॥
তানে মানে বাঁধলে ডুরি, শতধারে বয় মাধুরী।
বাজে আল্‌গা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার॥

গান— জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন? জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোর?
অধীর অধীর যেমতি সমীর অবিরাম গতি নিয়ত ধাই॥
জানিনা কেবা এসেছি কোথায়, কেন বা এসেছি কোথা নিয়ে যায়,
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে, চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল।
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, এই আছে আর তখনি নাই॥
কি কাজে এসেছি, কি কাজে গেল, কে জানে কেমন কি খেলা হল।
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি, যাই—যাই—কোথা? কূল কি নাই?
কর হে চেতন, কে আছ চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন?
কে আছ চেতন ঘুমা'ওনা আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার।
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ, তোমা বিনে আর নাহিক উপায়।
তব পদে তাই শরন চাই॥

গান— আমায় ধর নিতাই।
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।
নিতাই জীবকে হরিনাম বিলাতে,
উঠল গো ঢেউ প্রেম-নদীতে
(এখন) সেই তরঙ্গে আমি ভাসিয়ে যাই॥

নিতাই যে দুঃখ আমার অন্তরে, দুঃখের কথা কইব কারে,
জীবের দুঃখে এখন আমি ভাসিয়ে যাই ॥

গান— প্রাণ ভয়ে আয় হরি হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।
মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই ॥
বল রে হরি বোল; প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল।
তোল রে তোল হরিনামের রোল ॥
পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরি বলে কাঁদ, হেরবি হৃদয়চাঁদ।
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব, প্রেমে নিতাই ডাকে তাই ॥

গান— কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়।
বহিছে রে প্রেম শত ধারে, যে যত চায় তত পায় ॥
প্রেমের কিশোরী প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল রে হরি।
রাধার প্রেমে হরি বলে, আয় আয় আয় আয় ॥'

তখন সকালবেলা, দশটা বেজেছে। গিরিশচন্দ্র স্বরচিত বুদ্ধদেব চরিত' ও 'চৈতন্য-লীলা' নাটকের) এই গানগুলি গাইলেন কালীপদ ঘোষের সঙ্গে, শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায়। দিনের শেষে সন্ধ্যার পরেও ভক্তেরা সকলে ঠাকুরের কাছে রয়েছেন, সেই দোতলার ঘরে। এবার গিরিশের পরম ভক্ত স্বরূপের উদ্‌ঘাটন। শ্রীরামকৃষ্ণকে 'জগন্মাতার' অবতার রূপে তাঁর পূজাঞ্জলি দান।

রাত সাতটা। শ্যামাপূজার সমস্ত আয়োজন সে কক্ষেই হয়েছে।

'ঠাকুর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন।...

ঠাকুর বলিতেছেন 'ধুনা আন।'

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর জগন্মাতাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন।...

মাস্টারের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, 'একটু সবাই ধ্যান করো।...

ভক্তেরা সকলে একটু ধ্যান করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে গিরিশ ঠাকুরের পাদপদ্মে মালা দিলেন। মাস্টারও গন্ধ পুষ্প দিলেন। তারপরেই রাখাল। তারপর রাম প্রভৃতি সমস্ত ভক্তেরা তাঁহার চরণে ফুল দিতে লাগিলেন।...

দেখিতে দেখিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।...ভক্তেরা অদ্ভুত রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল, হস্তে বরাভয়। ঠাকুর নিস্পন্দ বাহ্যশূন্য।...সাক্ষাৎ জগন্মাতা কি ঠাকুরের ভিতর আবির্ভূতা হইলেন।

সকলে অবাক হইয়া এই অদ্ভুত বরাভয়দায়িনী জগন্মাতার মূর্তি দর্শন করিতেছেন।

এইবার ভক্তেরা স্তব করিতেছেন। আর একজন গান গাহিয়া স্তব করিতেছেন ও সকলে যোগদান করিয়া সমস্বরে গাইতেছেন।

গিরিশ স্তব করিতেছেন—

কে রে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুর সমাজে।
কে রে রক্তোৎপল চরণ যুগল উরসে বিরাজে॥
কে রে রজনীকর নখরে বাস, দিনকর কত পদে প্রকাশ॥
মৃদু মৃদু হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরজে॥

আবার গাইতেছেন—

দীনতারিণী, দুরিতহারিণী, সত্ত্বরজতম ত্রিগুণ ধারিণী;
সৃজন-পালন-নিধন-কারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্বস্বরূপিণী।
ত্বং হি কালী তারা পরমা প্রকৃতি, ত্বং হি মীন কূর্ম বরাহ প্রভৃতি,
ত্বং হি স্থল জল অনল অনিল, ত্বং হি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী
সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়,
বৈশেষিক বেদান্ত ভ্রমে হ'য়ে ভ্রান্ত, তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারেনি॥
নিরুপাধি আদি অন্ত রহিত, করিতে সাধক জনার হিত,
গণেশাদি পঞ্চরূপে কালবঞ্চ ভবভয়হরা ত্রিকালবর্তিনী॥
সাকার সাধকে তুমি যে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার,
কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়, সেই তুমি নগতনয়া জননী॥
যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়,
তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়, সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী॥

(কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ২৩৭-২৪০)

গিরিশচন্দ্র স্বয়ং তাঁর সেদিনের অভিজ্ঞতা ও ঘটনার বর্ণনা করেছেন 'রাম দাদা' প্রবন্ধে: '·· পূর্ব পশ্চিমে লম্বা ঘর ভক্তে পরিপূর্ণ। ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে রামদাদা, আমি তাহার নিকট আছি। আমার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, ছটফট করিতেছে, প্রভুর সম্মুখে যাইবার জন্য আমি অস্থির।···রামদাদা যেন আমায় উৎসাহ দিয়া বলিলেন—'যাও, যাও না!'···ভক্তমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রভু আমায় দেখিয়া বলিলেন,—'কি কি—এসব আজ করতে হয়।' আমি অমনি 'তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই' বলিয়া দুই হাতে ফুল লইয়া 'জয় মা' শব্দ করিয়া পাদপদ্মে দিলাম। অমনি সকল ভক্তই পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। ···মনে হয় রামদাদা আমাকে সাক্ষাৎ কালীপূজা করাইলেন।'

(রামদাদা, তত্ত্বমঞ্জরী, নবম সংখ্যা, ১৩১১ সাল)।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে গিরিশচন্দ্র সেদিন রাতে গাইলেন এই দীর্ঘ গানটি। আর স্তবও করেছিলেন গানের সুরে, তা শ্রীম-র বিবৃতিতে প্রকাশ। সুতরাং সকালে পাঁচখানি স্বরচিত গানের যোগে সেদিন গিরিশচন্দ্র সাতটি গান শুনিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে নাট্যাচার্যের গান গাইবার বিবরণ পাওয়া যায় অন্য দিনেও। তা হলো ঠাকুরের শ্যামপুকুর বাড়িতে যাবার আগেকার কথা। তখনো তিনি দক্ষিণেশ্বরে আছেন। সেদিনের গিরিশের গান শুনে ভাবস্থ হয়েছিলেন ঠাকুর। সাশ্রুনয়নে গায়ককে আলিঙ্গন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এক তরুণতম শিষ্য হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (বিজ্ঞানানন্দ স্বামী।) স্বামী অখণ্ডানন্দের পরে, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ সভাপতি তিনি। তাঁর জীবনী-লেখক স্বামী গম্ভীরানন্দ জানিয়েছেন, '১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিনে হরিপ্রসন্ন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন গিরিশচন্দ্র সদলবলে আসিয়া সন্ধ্যার পর স্বরচিত 'কেশব কুরু করুণা দীনে' ইত্যাদি সঙ্গীতটি গাহিয়াছিলেন। সঙ্গীত শুনিয়া ঠাকুরের ভাব হয় এবং দুই নয়নে প্রেমাশ্রু বহিতে থাকে। তিনি ভাবাবস্থায় গিরিশবাবুকে আলিঙ্গন করেন।' (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৯৪—স্বামী গম্ভীরানন্দ)।

গিরিশচন্দ্রের আরো এক দিন গানের কথা আছে স্বামী সারদানন্দের গ্রন্থে। বিবৃতি-কার শ্রীম-র তুল্য প্রত্যক্ষদর্শী। সেদিন বিকালে ঠাকুর বলরাম মন্দিরে ছিলেন ভক্ত-দের সঙ্গে। সেখানেই গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ ঘোষ দ্বৈতকণ্ঠে গান গেয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ :—

'এক দিবস অপরাহ্নে ঐরূপে বলরাম ভবনে আসিয়া দেখি, দ্বিতলের বৃহৎ ঘরখানি লোকে পূর্ণ ও গিরিশচন্দ্র ও কালীপদ (ঘোষ) মহোৎসাহে গান ধরিয়াছেন—

আমায় ধর নিতাই
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।

ঘরের পশ্চিম প্রান্তে পূর্বমুখে উপবিষ্ট থাকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অদ্ভুত হাসি…

গান চলিতে লাগিল—

আমার প্রাণ যেন আজ করে কেমন,
আমায় ধর নিতাই…'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ)।

এই তিন দিন গিরিশচন্দ্রের গান গাইবার কথা জানা গেল। তার অধিকাংশই তাঁর স্বরচিত সঙ্গীত। তিন দিনই তিনি গেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে। অন্যত্র এবং

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত বৃত্তান্ত ভিন্ন গিরিশচন্দ্রের গানের উল্লেখ পাওয়া যায় নি।
পুনরায় স্মরণীয়, নাট্যাচার্য গান শুনিয়েছিলেন সম্ভবত ঠাকুরের প্রেরণায়। যে পার্ষদের সঙ্গীতগুণ আছে তার স্ফুরণ হবেই গীতৈকপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে। গিরিশচন্দ্রের গান গাওয়া তার এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণের অপর এক পরম নিষ্ঠাবান গৃহী ভক্ত—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৫০-১৮৯০)। ঠাকুর তাঁকে সাদরে সম্বোধন করতেন 'সুরেশ' নামে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ভক্তিতে এবং গুরুভ্রাতাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসায় মিত্র মহাশয় রামকৃষ্ণসঙ্ঘে এক অনন্য স্থানের অধিকারী। প্রধানত তাঁরই উদার পোষকতায় বরানগর মঠের (১৮৮৬ সালের আশ্বিন মাস থেকে) সূচনা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত 'চার রসদ্দারে'র অন্যতম সুরেন্দ্রনাথ। ঠাকুরের প্রথম 'রসদ্দার' অর্থাৎ পৃষ্ঠপোষক সেবক মথুরানাথ বিশ্বাস, রাণী রাসমণির জামাতা ও এস্টেট তত্ত্বাবধায়ক। চোদ্দ বছর (১৮৫৭-১৮৭১) শ্রীরামকৃষ্ণকে সেবার পর মথুরবাবুর মৃত্যুতে, দ্বিতীয় রসদ্দার হলেন ভক্ত শম্ভুনাথ মল্লিক। ১৮৭১ থেকে, কেশবচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হবার আগে, অর্থাৎ ১৮৭৫ পর্যন্ত তাঁর সেবক শম্ভুনাথ। তারপর ১৮৭৯-৮০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত রসদ্দার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। অর্থাৎ ঠাকুরের তিরোভাবের ৬/৭ বছর আগে থেকে ৪/৫ বছর পর পর্যন্ত দশ বছর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানদের সেবা, আনুকূল্য ও তত্ত্বাবধানে এক বিধিনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে যান।
সুরেন্দ্রনাথই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরের সংযোগের হেতু হয়েছিলেন আপন গৃহে। শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার জন্যে নরেন্দ্রনাথ সেখানেই আহূত হন। ঠাকুরের সঙ্গীতের পুণ্যস্মৃতিতেও ধন্য সুরেন্দ্রনাথের আবাস, রাম দত্ত এবং বলরাম মন্দিরের তুল্য। সুরেন্দ্র-ভবনে অনেক দিন গান গেয়েছেন ঠাকুর নিজে। আবার কীর্তনিয়াদের পদাবলীর সঙ্গে আখর দিয়েছেন, নৃত্য করেছেন—যেমন, অন্নপূর্ণা পূজার দিন (১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৩)।

সুরেন্দ্রনাথও গায়ক। তাঁর গানের উল্লেখ পাওয়া গেছে একাধিকবার। অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে তিনি কীর্তনে যোগ দিতেন। তাছাড়া, গান গেয়েছেন এককও। গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ তার বিবৃতিকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ সে সময় কাশীপুর বাগানবাড়িতে রয়েছেন। ১৮৮৬ সালের ২১ এপ্রিলের কথা। ঠাকুরের কাছে দোতলার ঘরে তখন কজন ঘনিষ্ঠ ভক্তদের সঙ্গে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ।
নিচে ভক্তেরা খোল করতাল নিয়ে কীর্তন করছিলেন খানিকক্ষণ যাবত। তারপর—শ্রীম. বিবৃত করেছেন—

'কীর্তন সমাপ্ত হইল। সুরেন্দ্র ভাবাবিষ্টপ্রায় হইয়া গাইতেছেন—

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
আমি তাদের পাগল ছেলে, আমার মায়ের নাম শ্যামা॥
বাবা বম্ বম্ বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে ;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে, ঐ নূপুর বাজে শুন না॥

সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গাওয়া ওই গানখানি গিরিশচন্দ্রের রচনা এবং তাঁর 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে পাগলিনী-চরিত্রের গান। প্রসিদ্ধা নায়িকা-নটী গঙ্গামণি এই ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করতেন। তাঁর কণ্ঠে পাগলিনীর গানগুলি দর্শক-শ্রোতাদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে।

এই গীত-প্রধান ভূমিকাটি নাট্যকারের কাল্পনিক সৃষ্টি নয়। তার এক বাস্তব প্রতিমূর্তি ছিল এবং তাকে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরে অবস্থানকালে।

এক অনুরূপ চরিত্রের উপমানে গিরিশচন্দ্র এই নাটকীয় পাগলিনীর পরিকল্পনা করেন বলে প্রকাশ। সম্ভবত সেই পাগলিনী শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করবার জন্যে কাশীপুর ভবনে আকস্মিক উপস্থিত হতো। উন্মাদিনী হলেও ঠাকুরের প্রতি অতিশয় ভক্তিমতী ছিল সে। আর আশ্চর্যের বিষয়, পাগলিনী হয়েও সুকণ্ঠী গায়িকা। উচ্চভাবের নানা গান সুন্দরভাবে সে গাইত। কোন অসংলগ্নতা থাকত না তার গানে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতজ্ঞ পার্ষদদের মধ্যে সেই পাগলিনীর কথাও প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায়। কারণ সে অপ্রকৃতিস্থা, অপরিচিতা নারী ঠাকুরের প্রতি ভক্তিতে যাতায়াত করত তাঁর কাছে। আপন মনে ধর্মসঙ্গীত গাইত। শ্রীরামকৃষ্ণ তার ভক্তিভাবের গান শুনে মুগ্ধ, ভাবস্থ হতেন। আর তার গায়নগুণে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য কালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ), নাট্যকার গিরিশচন্দ্র প্রমুখ অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রতি। দীর্ঘকাল পরে স্বামী অভেদানন্দ তার স্মৃতিচারণ করেন এইভাবে—

'কাশীপুরের বাগানে এক পাগলিনী শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য আসিত। তাহার গলার সুর অতিশয় মধুর ছিল। পাগলিনী গাহিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব হইত। পাগলিনীর একটি গান :

একবার এস মা এস মা,
ও হৃদয় রমা, পরাণ পুতলি গো।
আমি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে,
জান গো জননী যে যাতনা সয়ে,
আমার হৃদয় কমল বিকাশ করিয়ে,

প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী গো।

এই গানটি পাগলিনী যখন গাহিত তখন সকলকে ব্যাকুল করিত। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাবে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন।......'

পাগলিনীর গাওয়া আরেকটি গানেরও উল্লেখ করেছেন স্বামী অভেদানন্দ :

'মা মা বলে আর ডাকিবনা,
তারা দিয়াছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী করিলে সন্ন্যাসী,
আরো কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,
না হয় দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে তো আর কোলে যাবনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার সুমধুর কণ্ঠে এই গান শুনিয়া সমাধিস্থ হইলেন।...

এই পাগলিনীকে দেখিয়া ও তাহার গান শুনিয়াই গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে পাগলিনীর চরিত্র প্রতিফলিত করিয়াছিলেন।'

(আমার জীবনকথা, পৃঃ ৯৯-১০০—স্বামী অভেদানন্দ)

আরো কয়েকজন গায়ক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগোষ্ঠীতে। যথা—কেদার চট্টোপাধ্যায় এবং ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত। ঠাকুরের সঙ্গে নানা দিনে তাঁদের নাম উল্লেখ আছে 'কথামৃত' গ্রন্থাবলীতে শ্রীম. তাঁদের গান গাওয়ারও বিবরণ দিয়েছেন। উক্ত দুজন ভিন্ন তারাপদ ও ভূপতি নামে দুই ভক্ত গায়কের কথাও পাওয়া গেছে 'কথামৃত' দিনলিপিতে।

প্রথমে কেদার চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ তাঁর ভক্তিভাবের জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ভালবাসতেন তারও উল্লেখ করেছেন শ্রীম. :

একদিন এক বৈরাগী গোপীযন্ত্রের সঙ্গে গান গাইছেন দক্ষিণেশ্বরের ঘরে—'নিত্যানন্দের জাহাজ এসেছে,' 'এই বেলা নে ঘর ছেয়ে' ও 'কার ভাবে নদে এসে' গানগুলি।

'ঠাকুর গান শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীযুক্ত কেদার চাটুজ্যে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি অফিসের বেশ পরিয়া আসিয়াছেন—চাপকান, ঘড়ি, ঘড়ির চেন। কিন্তু ঈশ্বরের কথা হইলেই তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া যান। অতি প্রেমিক লোক। অন্তরে গোপীর ভাব।

কেদারকে দেখিয়া ঠাকুরের একেবারে শ্রীবৃন্দাবন-লীলা উদ্দীপন হইয়া গেল। প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া গান গাহিতেছেন—

সখি, সে বন কতদূর।

(যথা আমার শ্যামসুন্দর)   (আর চলিতে যে নারি)

শ্রীরাধার ভাবে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ। চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। কেবল চক্ষের দুই কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতেছে।

কেদার ভূমিষ্ঠ। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া স্তব করিতেছেন—

হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহং।
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্॥
জননমরণ ভীতিভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপম্।
সকল ভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। কেদার নিজ বাটী হালিসহর হইতে কলিকাতায় কর্মস্থলে যাইবেন।… (কথামৃত, চতুর্থভাগ পৃঃ ৭)

ভক্তিমান কেদারকে দেখে ঠাকুর উদ্দীপিত হলেন বৃন্দাবনলীলায়। শ্রীরাধা ভাবে তাঁর উদ্দেশে গান শোনালেন।

তেমনি কেদার নিজেও গেয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়।

সেদিন মহাষ্টমী তিথিতে রামদত্তের গৃহে ঠাকুর এসেছেন। বিজয় গোস্বামী, নরেন্দ্র, রামচন্দ্র, কেদার, সুরেন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, নারায়ণ, মাস্টার, চুনীলাল প্রভৃতি ভক্তরা-উপস্থিত। ঈশ্বরকোটি, নিত্যসিদ্ধ, দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মর্ষি শুকদেব প্রসঙ্গে বলবার পর—শ্রীরামকৃষ্ণ 'কেদারকে গান করিতে বলিলেন'। কেদার তিনখানি গান গাইলেন সম্পূর্ণ-ভাবে :—

(১) মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।…

(২) গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।…

(৩) যে জন প্রেমের ঘাট চেনেনা।…

'গানের পর আবার ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।'…(কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৩১)।

ঠাকুরের এক প্রিয় তরুণ ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'কথামৃত' থেকে জানা যায় বিভিন্ন দিনে তাঁর গানের কথা। একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি শোনান—'গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।'…আরেকদিনও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে (কালীকৃষ্ণের সঙ্গে)—'ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী। সবে মিলি তব সত্য ধর্ম ভারতে প্রচারি।'…দক্ষিণেশ্বরেই অন্য একদিন, নরেন্দ্রনাথের পাঁচখানি গানের পরে—'দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী। সুখে দুঃখে সম, বন্ধু এমন কে, পাপ-তাপ-ভয়হারী।…'ইত্যাদি

শ্রীরামকৃষ্ণের তারাপদ নামে ভক্ত একদিন তাঁকে গান শোনান বলরাম মন্দিরে—'কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী।'…

গানখানির রচয়িতা গিরিশচন্দ্রও তখন ঠাকুরের কাছে উপস্থিত ছিলেন। গিরিশকে তিনি সুখ্যাতি করেন—'আহা, বেশ গানটি।'...

ঠাকুরের আরেকজন ভক্তিমান পার্ষদ ভূপতিও গায়ক। শ্যামপুকুর বাড়িতে সেদিন ভূপতি গান গেয়েছিলেন—

'শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্রাপিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

এই প্রেমাবেশ, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত ভক্তেরা কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ স্তব করিতেছেন।...

মহিমাচরণ সাশ্রুনয়নে গাহিলেন—দেখ দেখ প্রেমমূর্তি—ও মাঝে মাঝে যেন ব্রহ্ম-দর্শন করিতেছেন, এই ভাবে বলিতেছেন—

'তুরীয়ং সচ্চিদানন্দম্ দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিতম্।'

...আর একটি ভক্ত, ভূপতি গাহিলেন

জয় জয় পরব্রহ্ম অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি প্রেমের আকর ভূমি,
মঙ্গলের তুমি মূলাধার।...'

সুদীর্ঘ চব্বিশ পঙ্‌ক্তির এই গানখানি সম্পূর্ণ গাইবার পর—

'ভূপতি আবার গাহিতেছেন—

[ঝিঁঝিট—(খয়রা) কীর্তন]
চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব মহালীলা কি মাধুরী মরি মরি।...'

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রচিত এই দীর্ঘ আঠারোপঙ্‌ক্তির গানটিও শোনালেন ভূপতি।

'অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন।'

ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত, জ্ঞানমার্গী মহিমা চক্রবর্তীর গান গাইবার কথাও জানা গেল উক্ত বিবরণে।

ভূপতির আগে মহিমাচরণ 'দেখ দেখ প্রেমমূর্তি' গানখানি গেয়েছিলেন। আরেকদিন মহিমাচরণের কীর্তনে যোগ দেওয়া ও নৃত্য করার উল্লেখ আছে দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের সঙ্গে—

'নবাই উচ্চ সঙ্কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমনি নবাই ও ভক্তেরা তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য ও কীর্তন করিতে লাগিলেন। কীর্তন বেশ জমিয়া গেল। মহিমাচরণ পর্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন।

কীর্তনান্তে ঠাকুর…মত্ত হইয়া মার নাম করিতেছেন।…

পর পর আটখানি গান শ্রীরামকৃষ্ণ গেয়ে—'নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ভাবে গর্গর মাতোয়ারা।'…

মহিমাচরণ আবৃত্তি করিতেছেন—'জয় জজমান' ইত্যাদি

আবার মহানির্বাণতন্ত্র হইতে স্তব আবৃত্তি করিতেছেন—

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়, সমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়।…

ঠাকুর হাত জোড় করিয়া স্তব শুনিলেন। পাঠান্তে ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন। ..

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—আজ খুব আনন্দ হলো। মহিম চক্রবর্তী এদিকে আসছে।…

মহিমাচরণ জ্ঞানচর্চা করেন। তিনি আজ হরিনাম করেছেন, আর কীর্তনসময়ে নৃত্য করিয়াছেন—তাই ঠাকুর আহ্লাদ করিতেছেন।'…

আগেও দেখা গেছে, ভক্ত পার্ষদ কিংবা সমাগত ব্যক্তিরা যদি সঙ্গীত ও নৃত্যে যোগ দেন অতি আনন্দ পান শ্রীরামকৃষ্ণ। এতই সঙ্গীতৈকপ্রাণ ঠাকুর। এজন্যেই তাঁর ইচ্ছায়, প্রেরণায় ও প্রভাবে তাঁর একাধিক পার্ষদকে গায়করূপে দেখা গেছে, যাঁদের অন্যত্র গানের কথা জানা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে এ এক লক্ষণীয় ব্যাপার। তাঁর প্রভাবে সঙ্গীতের সর্বাঙ্গীণ পরিমণ্ডল। রামলাল ভিন্ন ঠাকুরের আরো একাধিক পার্ষদ ছিলেন, যাঁরা তাঁর নির্দেশে (কীর্তন) গান গাইতে আরম্ভ করেন। রাখাল মহারাজের শ্যালক মনোমোহন মিত্রের (১৮৫১-১৯০৩) কীর্তনের কথা বলা হয়েছে আগে। তাঁর মাসতুতো ভাই রাম দত্ত ও নিত্যগোপাল বসু (জ্ঞানানন্দ অবধূত)-র সঙ্গে তিনি কীর্তন গাইতেন। তাঁরা 'মিলিত হইয়া প্রতি সন্ধ্যায় কীর্তন করিতেন।' (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ৩১৪—স্বামী গম্ভীরানন্দ) কিন্তু মনোমোহন তার আগে গানে অভ্যস্ত ছিলেন না—'শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহন প্রভৃতিকে কীর্তন করিতে বলিয়াছিলেন। পূর্বে অভ্যাস না থাকিলেও ঐ উপদেশের পর তাঁহারা কীর্তনে মাতিয়া উঠিলেন।' (ঐ গ্রন্থ, পৃঃ ৩১৮)।

মনোমোহন তাঁর যে গৃহে কীর্তনানন্দে মত্ত হতেন, তার ঠিকানা ২৩, শিমুলিয়া স্ট্রীট। সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট প্রতিবাসী তিনি।

মনোমোহন তুল্য ঠাকুরের অপর এক উচ্চকোটির গৃহী ভক্ত নবগোপাল ঘোষ (১৮৩২-১৯০৯)। তিনিও নিয়মিত ভজন কীর্তন করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে। প্রত্যহ পরিবারের বালক বালিকাদের নিয়ে খোল করতাল সঙ্গে নবগোপাল কীর্তন গাইতেন। ধর্মজীবনের অঙ্গ করে নেন সঙ্গীতকে। ঠাকুরের কথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের গায়ক পার্ষদমণ্ডলীতে এমন কি হৃদয়ের নামও ধর্তব্য। ঠাকুরের দীর্ঘ-

কালের নিত্য সেবক, ভাগিনেয়-সম্পর্কিত হৃদয় মুখোপাধ্যায়। প্রায় বিশ বছর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা এবং দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর বিগ্রহ পূজা করেন। পরে দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হয়ে হৃদয়কে বরখাস্ত করেছিলেন ঠাকুরবাড়ি থেকে। যা হোক, তিনিও বঞ্চিত ছিলেন না গায়নগুণে। হৃদয়ের দুদিন গান গাইবার উল্লেখ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি হলো শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে। ঠাকুরের বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সেবকরূপে তিনি ঠাকুর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। সেই সূত্রে একদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন তারক মহারাজ এবং দত্ত মহেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-ত্যাগের পরে, বরানগর মঠে। তাঁদের অনুরোধে, ঠাকুরের একদিন কেশবচন্দ্রের ভবনে যাবার হুবহু বর্ণনা দিচ্ছিলেন হৃদয়। সেই সঙ্গে ঠাকুরের গাওয়া একটি গানও তিনি (তারক মহারাজ ও দত্ত মহেন্দ্রকে) গেয়ে শোনান :—

'পরমহংস মশাই কেশববাবুর বাড়িতে গিয়া যে 'দূতী সংবাদ'টি গান করেছিলেন হৃদু মুখুজ্যে সেই গানটি গাহিতে লাগিল।' (মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান, পৃঃ ১৩০—মহেন্দ্রনাথ দত্ত)।

হৃদয়ের গানের বর্ণনা আরেকদিন পাওয়া যায় আরো প্রত্যক্ষভাবে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সশরীরে বিদ্যমান। সেদিন কেশবচন্দ্র তাঁকে দর্শন করবার জন্যে সদলে বজরায় উপনীত হয়েছেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কক্ষে কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ করতে যাবার আগে, হৃদয় এসেছেন তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে। কিন্তু তা কেবল সৌজন্য-সূচক অনুষ্ঠান থাকে নি। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে, সঙ্গীতসভার প্রভাবে ও ঈশ্বরীয়ভাবে এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তুল্য ভক্তিমান অতিথির আগমনে গীতমুখর হয়ে উঠেছেন হৃদয়। শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে কেশবকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছেন—সঙ্গীতে। নববিধান সমাজের মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্ব' তারই বিবরণ প্রকাশ করেছেন—'সংবাদ'—গত বুধবার (১৩ কার্তিক)...হৃদয় কেশবের দলের বজরায় এসে প্রমত্তভাবে 'জাহ্নবী তীরে হরি বলে কে রে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। নৈলে কেন তাপিত পরাণ অন্তর শীতল হয়েছে, হরিনামের ধ্বনি শুনে পাষণ্ড দলন হতেছে, এই গানটি করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।'...পরে সকলে গান করিতে করিতে পরমহংসদেব মহা-শয়ের গৃহাভিমুখে চলিলেন—'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপানন্দ ঘন'...গান শ্রবণে ও ভক্ত-গণের সমীপে পরমহংসদেবের মূর্ছা হইল।...'

(ধর্মতত্ত্ব, ১৬ই কার্তিক, ১৮০১ শক, ১ নভেম্বর, ১৮৭৯)।

আর অধিক বিবরণ না পাওয়া গেলেও, হৃদয়ের যে সঙ্গীতকণ্ঠ ছিল, তা জানা গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ ভক্তমণ্ডলীতে গায়ক নন একমাত্র বলরাম বসু। (১৮৪২-১৮৯০)

তবে তিনিও অত্যন্ত কীর্তন-প্রিয়। ঠাকুরের উপস্থিতিতে, কখনো অন্য গায়কের কখনো স্বয়ং তাঁর সঙ্গীতে বহুদিন বলরামের দোতলার কক্ষ মুখর হয়ে উঠেছে। আর তাঁর সঙ্গীতপ্রেম সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিটিও স্মরণীয় 'বলরামের ভাব—আপনারা গাও, নাচো, আনন্দ কর।'

দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর প্রপৌত্র বলরাম হলেন—ঠাকুরের অন্যতম চিহ্নিত এবং প্রিয় শিষ্য প্রেমানন্দের ভগিনীপতি।

শ্রীরামকৃষ্ণের গায়ক পার্ষদ-গোষ্ঠীর তালিকায় নববিধান সমাজের ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের কথাও উল্লেখ্য। কেশবচন্দ্রের সম্প্রদায়ের একান্ত অন্তর্গত হলেও তিনি ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করেছেন অনেক দিন। দক্ষিণেশ্বরে, কমল কুটীরে এবং অন্যত্র তাঁর সঙ্গীত-পরিমণ্ডলে একাত্ম সান্যাল মহাশয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে নানা দিনে ত্রৈলোকনাথ গান শুনিয়েছেন। তাঁর সঙ্গীতের মুগ্ধ, গুণগ্রাহী শ্রোতা ঠাকুর। তাঁকে অন্তরের সুখ্যাতি জানিয়েছেন উচ্চ ভাবের উপমা যোগে—'আহা তোমার কি গান! তোমার গান ঠিক ঠিক। যে সমুদ্রে গিয়েছিল, সেই সমুদ্রের জল এনে দেখায়॥'

(কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, ৬৬ পৃঃ)

কোনো কোনো দিন ভাবোন্মত্ত হয়ে ঠাকুর নৃত্যও করেছেন ত্রৈলোক্যনাথের গান শুনে। আবার সেই আবেগে স্বয়ং গান ধরেছেন : 'এদিকে ঘরের মধ্যে ত্রৈলোক্য গান গাহিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন।…এক হাতে মালা ধরিয়া, অপর হাতে দোলাতে দোলাতে গান ও নৃত্য করিতেছেন।—'হৃদয় পরশমণি আমার'—আখর দিতেছেন—(ভূষণ বাকি কি আছে রে!) (জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি!)'…

(ঐ গ্রন্থ, পঞ্চম ভাগ, পরিশিষ্ট পৃঃ ২১৪)

'ক্রমে ত্রৈলোক্যও গান গাহিতেছেন—জয় জয় আনন্দময়ী ব্রহ্মরূপিণী।
ঠাকুর আনন্দে নাচিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কেশবাদি ভক্তগণ নাচিতেছেন।'

(তদেব, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২১৭)।

আবার ত্রৈলোক্যনাথ রচিত গান নরেন্দ্রকে একটির পর একটি ফরমায়েস করে শুনছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যথা—'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী', 'চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে', 'আমায় দে মা পাগল করে' প্রভৃতি।

সঙ্গীতগুণী ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে ঠাকুরের অন্তরের এমনি নিবিড় সংযোগ কয়েক বছর যাবত দেখা গেছে। 'কথামৃত' গ্রন্থাবলীতে তার বিভিন্ন দিনের উদাহরণ প্রকাশিত। আর বেশি উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ঠাকুরের অনেক ভক্তের তুলনায় দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গ করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। ভাবজীবনে গভীর যোগাযোগের জন্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গায়ক ভক্তমণ্ডলীতে গণনীয়, কেশবচন্দ্রের ঐকান্তিক অনুগামী হলেও।

তাঁর গীত রচনার বিষয়েও ঠাকুরের অধ্যাত্মজীবনের এক গূঢ় প্রভাব আছে। সে প্রসঙ্গের আগে সান্যাল মহাশয়ের পরিচয়-কথা উল্লেখনীয়। তাঁর জন্ম সন ১৮৪০ এবং মৃত্যু হয় ১৯১৭ সালে।

নানা গুণে গুণী ত্রৈলোক্যনাথ। যেমন শিক্ষিতপটু সুমিষ্টকণ্ঠ গায়ক তিনি, তেমনি সিদ্ধ গীতরচয়িতা। প্রায় দু হাজার গান তিনি রচনা করেন। সে গীতাবলীর সুর সংযোজক এবং প্রথম গায়কও তিনি। কেশবচন্দ্রের সম্প্রদায়ে গীত হবার জন্যে তাঁর অধিকাংশ গান রচিত। তিনি স্বভাবকবি-গীতিকবি। অনেক সময়ে সমাজ-মন্দিরে এবং কেশবচন্দ্রের ভাষণের ভাব অনুসরণে তাৎক্ষণিক গীতরচনা করতেন ত্রৈলোক্যনাথ। নববিধান সমাজের প্রচারধর্মী বহু গান তাঁর আছে। কিন্তু এমন গীতও তিনি সৃষ্টি করেছেন যা ভাব ও রসের আবেদনে কালোত্তীর্ণ এবং বাংলার সঙ্গীতজগতে স্থায়ী আসনের অধিকারী। যথা—'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপ রাশি', 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী', 'চিন্তয় মম মানস হৃদি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন', 'নাথ তুমি সর্বস্ব আমার', 'চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি।

ত্রৈলোক্যনাথের গীতাবলীর প্রায় অর্ধাংশই অমুদ্রিত। তাঁর দু খণ্ডে প্রকাশিত 'গীতরত্নাবলী' গ্রন্থে কীর্তন ভিন্ন অন্যান্য কিছু গান স্থান পেয়েছে। আর কীর্তন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'নগর সঙ্কীর্তন' নামক পুস্তকে। তাঁর 'পথের সম্বল' বইখানিতে কবিতা ও গদ্য রচনাদির সঙ্গে আরো কিছু গান অন্তর্ভুক্ত আছে। ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারখানি নাটক, দুটি উপন্যাস, 'নবশিক্ষা' ও 'যৌবন-সখা' নামে দুখানি পাঠ্যপুস্তক, 'ব্রহ্মগীতা' প্রবন্ধ, কেশবচন্দ্র ও অঘোরনাথ গুপ্তের জীবনী ইত্যাদি উল্লেখ্য। নদীয়া জেলার শান্তিপুর অঞ্চলে তাঁর জন্ম এবং প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি স্বভাবের প্রেরণায় গায়ক। অতি তরুণ বয়সে সেইগুণে যুক্ত থাকেন যাত্রাভিনয়ের দলে। তারপর সাতাশ বছর বয়সে (১৮৬৭) কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঘটনাচক্রে পরিচিত হন, বরিশাল জেলার লাখুটিয়ায়। কেশব সেখানে একটি সম্মেলনে আচার্যরূপে গিয়েছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের গুণে আকৃষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে নিয়ে আসেন কলকাতায়। কেশবের ব্যবস্থাপনায় ওস্তাদের অধীনে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা পান ত্রৈলোক্যনাথ। এখন থেকে বিদ্যাচর্চায়ও যথেষ্ট অগ্রসর হন। সঙ্গীতে কৃতবিদ্য ত্রৈলোক্যনাথ কোনো কোনো দেশীয় রাজ্যে পদক উপহারও পেয়েছিলেন গান শুনিয়ে। কেশবের সঙ্গীরূপে তাঁর সেইসব ভ্রমণ অবশ্য সম্ভব হয়। তা ছাড়া, কেশবচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল কলকাতার স্বনামধন্য সঙ্গীতগুণী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের জলসাদিতেও সেই সূত্রে আমন্ত্রিত কেশব উপস্থিত হতেন। তখন তাঁর সঙ্গে যেতেন ত্রৈলোক্যনাথও।

কেশবচন্দ্রের কল্যাণে এমনি নানাভাবে সঙ্গীতাদিচর্চায় উপকৃত হয়েছিলেন তিনি। কেশবের সহচররূপেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে উপনীত হন। ঠাকুরও তাঁকে চিনে নেন অন্তরঙ্গ স্বরূপে।

ত্রৈলোক্যনাথ একটি লেখনী-নাম ব্যবহার করতেন—'চিরঞ্জীব শর্মা।' আবার কোনো কোনো গানে 'প্রেমদাস' ভণিতাও দিতেন। তাঁর পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংযোগ ঘটে সঙ্গীতগুণে। রবীন্দ্রনাথের সাদর আহ্বানে সান্যাল মহাশয় অনেকবার শান্তিনিকেতনে অতিথি হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু হয় কলকাতায়, কেশবের 'কমল কুটীর' সংলগ্ন 'মঙ্গল বাড়ি'তে, নববিধান সমাজের সপরিবার প্রচারকদের জন্যে নির্দিষ্ট সেই আবাস চত্বরে। ত্রৈলোক্যনাথের বিবরণ কিছু সবিস্তারে দেওয়া হলো, কারণ তাঁর কোনো জীবনী প্রকাশিত নেই। তিনি একটি আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন ইংরেজীতে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে সেটির সঠিক কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।

এমন বহুমুখী গুণী এক পরম ভক্ত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের। ঠাকুরের অপূর্ব অধ্যাত্ম জীবনের দৃষ্টান্ত, তাঁর অলৌকিক ব্যক্তিত্ব, নিরন্তর ঈশ্বর প্রসঙ্গ, মহাভাব, উর্জিতা ভক্তি, প্রেমময় সত্তা, সমাধি প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ কবি-সঙ্গীতজ্ঞ ত্রৈলোক্যনাথের অন্তর্লোকে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কথিত আছে, তাঁর 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি', 'গভীর সমাধিসিন্ধু অনন্ত অপার,' 'আমায় দে মা পাগল করে', 'চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয়', 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী' প্রমুখ গীত-রচনার প্রেরণা তথা উৎসমূলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভাবৈশ্বর্য। ঠাকুরের প্রাণবস্ত ভাব অবলম্বনে ওই গানগুলি রচিত। স্বামী সারদানন্দ একথা স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'ঠাকুরের ভাবসমাধি দেখেই তিনি ঐ সকল পদসৃষ্টিতে সমর্থ হন। চিরঞ্জীব সুকণ্ঠ। তাঁর গান শুনে ঠাকুরকে অনেক সময় সমাধিস্থ হতে দেখেছি।'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, পৃঃ ২৫)।

ত্রৈলোক্যনাথ যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনেক গান লিখেছেন তা লক্ষ্য করেছিলেন রামচন্দ্র দত্তও। সেকথা তিনি স্বয়ং ঠাকুরকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে বলেও ছিলেন। ১৮৮৪ এপ্রিল ৫—রাম দত্ত, গিরীন্দ্র, শ্রীম. ও আরো কজন ভক্ত রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে—

'কথায় কথায় ত্রৈলোক্যের গানের কথা মনে পড়িল। ত্রৈলোক্য কেশবের সমাজে ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্তন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! ত্রৈলোক্যের কি গান।

রাম—কি ঠিক ঠিক সব?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁ, ঠিক ঠিক; তা না হলে এত টানে কেন?

রাম—সব আপনার ভাব নিয়ে গান বেঁধেছেন। কেশব সেন উপাসনার সময় সেই ভাবগুলি সব বর্ণনা করতেন, আর ত্রৈলোক্যবাবু সেইরূপ গান বাঁধতেন। এই দেখুন না এই গানটা—

প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা।
হরি ভক্ত সঙ্গে রস রঙ্গে করিছেন কত খেলা॥

আপনি ভক্তসঙ্গে আনন্দ করেন, দেখে নিয়ে ঐ সব গান বাঁধা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমায় আর জ্বালাসনে।'... (কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ১০২-১০৩)

রামচন্দ্র এখানে উপরন্তু জানিয়েছেন যে ঠাকুরের ভাবগুলি কেশবচন্দ্র বর্ণনা করতেন উপাসনার সময়। নববিধান সমাজে কেশব যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা গ্রহণ ও প্রচার করেন সে বিষয়ে গুপ্ত মহেন্দ্রনাথও একমত। দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হবার আগে শ্রীম. কেশবচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন। 'নববিধান মন্দিরে উপাসনাতে যোগদান করিতেন। এসময়ে কেশব সেন তাঁহার আদর্শ পুরুষ ছিলেন।...মহেন্দ্রনাথ বলিতেন যে, পরে ঠাকুরের কাছে আসিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ সকল হৃদয়মুগ্ধকারী ভাব ঠাকুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত।'

(গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী। কথামৃত, প্রথম ভাগ, পরিশিষ্ট)।

সকল ধর্মীয় নেতাদের দৃষ্টান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্মের মূল্য ঐক্য কেশবকে দেখাচ্ছেন, এ বিষয়ে একটি চিত্রও অঙ্কিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে রক্ষিত থাকে সেটি। কিন্তু সে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের নানা দিনের সঙ্গীত-প্রসঙ্গ 'কথামৃত' গ্রন্থমালায় বিধৃত। তার কিছু উদাহরণ আগে দেওয়া হয়েছে। আর বর্ণনা বাহুল্য। ত্রৈলোক্য-নাথের গান গাওয়া সম্পর্কে এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঠাকুরের দেহান্তের অব্যবহিত পরবর্তী একটি বিবরণ। শেষ কৃত্যের আগে, কাশীপুর শ্মশানে ত্রৈলোক্যনাথের গান আর সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত স্মরণীয় কিছু সংবাদ :

'ঘাটে খট্ট স্থাপন করিয়া কিয়ৎক্ষণ দেহকে প্রদক্ষিণ পূর্বক সঙ্কীর্তন হয়। পরে সঙ্গীত প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল কোনো কোনো বন্ধু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তৎসময়োপযোগী ৩।৪টি সঙ্গীত করেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত পরমহংসদেব বড়ই আদর করিতেন। অবশেষে শ্মশানে তাঁহার পবিত্র দেহের পার্শ্বে বসিয়াও ভাই ত্রৈলোক্যকে সঙ্গীত করিতে হইল...পরমহংসদেবের নেত্রদ্বয় ঈষদুন্মীলিত, মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ছিল, তাহাতে বোধহয় সমাধির অবস্থায় প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম পূর্বদিন রাত্রি দশটার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, আমার নাভিশ্বাস হইল যে, তৎপর তিনবার কালীনাম উচ্চারণ করিয়া সমাধিস্থ হন, তাহাতেই দেহত্যাগ

করিয়া অমরধামে চলিয়া যান।'...   (ধর্মতত্ত্ব, ৩১ আগস্ট, '৮৬)।

বলা চলে, শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে শেষ গান গেয়েছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ।...

এইভাবে, তাঁর গায়ক পার্ষদমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন—

নরেন্দ্রনাথ, রাখাল মহারাজ, তারক মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ, বুড়ো গোপাল, শরৎ মহারাজ, কালীপ্রসাদ, বাবুরাম, সারদাচরণ, লাটু মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্য। গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ, রাম দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, গিরিশচন্দ্র, মনোমোহন মিত্র, ভবনাথ, মহিমাচরণ, কেদার চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি, তারাপদ প্রমুখ গৃহী শিষ্য। রামলাল, হৃদয় প্রমুখ সেবক। ত্রৈলোক্যনাথ প্রমুখ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ভক্ত। শিষ্যা গৌরদাসী। (অজ্ঞাতনাম্নী পাগলিনী।)

সকলের সম্মিলনে, শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক ভজন সাধন আরাধনার সাঙ্গীতিক মহামণ্ডল। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গীতজীবন গুরুর আশীষ্-পূত, তাঁর সংযোগে স্পন্দিত, তাঁর সহযোগিতায় সমমর্মিতায় পরিবর্ধিত।

গায়ক পরিকর মণ্ডলী বেষ্টিত শ্রীচৈতন্যের তুল্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরিবেষ্টনে সঙ্গীত-বর্জিত কোনো ভক্ত কচিৎ দৃষ্ট। এমনই তাঁর মাহাত্ম্য। তাই দেখা যায়, শ্রীমা সারদাদেবীও গীতকণ্ঠে অক্ষম ছিলেন না। তা জানা যায়, রাধুর পুত্র বনবিহারী বা বনুর প্রতি বাৎসল্যের প্রসঙ্গে :—

'শ্রীমা প্রভাতে বনুর ঘুম ভাঙাইবার জন্য সুর করিয়া গাহিতেন—

'উঠ লালজী, ভোর ভয়ো
    সুর-নর-মুনি-হিতকারী।
স্নান কর, দান দেহ
    গো-গজ-কনক-সুপারি॥'

(শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ৩৮০—স্বামী গম্ভীরানন্দ।)

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ গান

বাল্য লীলাভূমি কামারপুকুরের সেই চিত্তাকর্ষক সাঙ্গীতিক পরিবেশে—যাত্রাপালা-গানের আসরে আসরে, লাহা পরিবারের অতিথিশালায় সমাগত সাধুসন্তদের ভজনে, চণ্ডীমণ্ডপের কীর্তন বাসরে—আর নন্দন-স্বভাবের প্রেরণায় যে গীতিকণ্ঠের উদ্‌বোধন হয়েছিল, দক্ষিণেশ্বরে সাধনোত্তর পর্বে তার পুষ্পিত পরিণতি। ঠাকুরের শিষ্য সেবক দর্শনার্থী ভক্তজন মণ্ডলী সে সঙ্গীত-সুধা আস্বাদনের সুযোগ প্রায় এক যুগ যাবত পেয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যভাবের বাণী-স্বরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সেই গীত লহরী। তার ঐশ্বর্যময় বহু বিচিত্র ধারার নানা পরিচয় আগেকার অধ্যায়গুলিতে দেওয়া হয়েছে। এখানে তাঁর শেষতম গানের কথা। তাঁর কোন্ সঙ্গীত, কোথায়, কি প্রসঙ্গে উৎসারিত হয়েছিল অন্তিম পর্যায়ে, সেই প্রসঙ্গ।

ঠাকুরের বাহ্যজীবনে উল্লিখিত শেষ সঙ্গীতটির বিবরণ। তাঁর বহু গানের তুল্য, কথোপকথনের মধ্যে বক্তব্যকেই সাবলীল সঙ্গীতে রূপায়িত করার আরেক সার্থক দৃষ্টান্ত। চূড়ান্ত পীড়িত শরীরেও, দেহত্যাগের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে সেই গানখানি তিনি গেয়েছিলেন। তাঁর কথনীয় বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি তাঁর আত্ম-স্বরূপের এক মহান প্রকাশরূপেও তা অবিস্মরণীয়।

সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতের উপলক্ষ্য হয়েছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। তাঁর উদ্দেশে ও সম্বোধনে সেই গীতিরূপ বাণী, মহা নির্দেশের আকারে। সে গানের একমাত্র শ্রোত্রীও তিনি। সঙ্ঘ-জননীর ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পালনের এক উদাত্ত আহ্বান স্বরূপও গণনীয় গানখানি।

অথচ, কণ্ঠ-রোগজর্জর, প্রায়-অবরুদ্ধ-স্বর তখন ঠাকুর! বাচন-শক্তিও প্রায় স্তব্ধ। ইশারায় অধিকাংশ মনোভাব জ্ঞাত করে থাকেন, এমন সময়ের কথা।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের অন্তিম অধ্যায়ে তাঁর গল-ক্ষত বিশেষ বৃদ্ধি পায়। তারপর চিকিৎসার জন্যে তিনি আনীত হন কলকাতায়। ভক্ত বলরামের গৃহে কয়েকদিন বাসের পর শ্যামপুকুর বাড়িতে প্রায় সাড়ে তিনমাস থাকেন। পরে আটমাস পাঁচদিন কাশীপুর ভবনে, দেহান্ত পর্যন্ত। লক্ষ্যণীয় এই যে, দক্ষিণেশ্বরে শেষের ক'দিন, শ্যামপুকুর গৃহে, এমন কি কাশীপুরেও গান গেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ! এই সূত্রে বলা যায় যে, তাঁর

সঙ্গীতকণ্ঠ সম্পূর্ণ নীরব কোথাও হয়নি। শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুরে তাঁর গানের উল্লেখ পাওয়া গেছে একেকটি দিনের। কিন্তু আরো কোনোদিন যে তিনি গান করেন নি, তাও নিশ্চিত না হতে পারে। কারণ তাঁর প্রতি দৈনন্দিন লিপি তো রক্ষিত হয় নি।

১৮৮৫ সালের মধ্যভাগ থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত। কণ্ঠে 'ক্যান্সার'। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তিনি কলকাতায় স্থানান্তরিত হন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ২৭ অগস্টের বিবরণেও ঠাকুরের গান গাওয়ার উল্লেখ করেছেন শ্রীম. :—

'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মাস্টার, পণ্ডিত শ্যামাপদ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ·

শ্রীরামকৃষ্ণ দু একটি ভক্ত সঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন। অপরাহ্ণ পাঁচটা। বৃহস্পতিবার ২৭ অগস্ট, ১৮৮৫। (১২ই ভাদ্র, শ্রাবণ, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া)।

ঠাকুরের অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। তথাপি ভক্তেরা কেহ আসিলে শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না। হয়ত সমস্ত দিন তাঁহাদের লইয়া কথা কহিতেছেন—কখনও বা গান করিতেছেন।...' (কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, ২৭৩ পৃঃ)।

সঠিক তারিখটি জানা যায়নি বটে, কিন্তু ওই ২৭ অগস্টের সপ্তাখানেক মধ্যেই তিনি কলকাতায় আসেন চিকিৎসার্থে। প্রথমে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুজ্যে স্ট্রীটের একটি ছোট বাড়িতে তাঁর বাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে নিতান্ত অসুবিধা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম বসুর গৃহে থাকেন কয়েকদিন। পরে সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভেই তাঁর 'শ্যামপুকুর বাটী'তে বাসের ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ, ৫৫ সংখ্যক শ্যামপুকুর স্ট্রীটে, গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা বাড়ি ভাড়া নিয়ে। এখানেই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নিয়মিত চিকিৎসাধীনে তাঁকে রাখা হয়। তিনমাসের দিনকয়েক বেশি শ্যামপুকুরে তাঁর বাস—১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত।

শ্যামপুকুর বাড়িটিও তাঁর বহু ভক্ত শরণার্থী দর্শনার্থীদের সমাগমে এবং ঠাকুরের সঙ্গ ও বাণীতে ধন্য। তাঁর কোনো কোনো বিশিষ্ট শিষ্যও তাঁর প্রথম দর্শন পান এখানে। যেমন—সারদাপ্রসন্ন মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, পরবর্তীকালে সানফ্রান্সিসকো মঠের অধ্যক্ষ)। এই পর্যায়েও শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যদের অধ্যাত্ম-জীবন গঠনে সহায়তা করতেন। তাঁদের সাধন-মার্গের দিশারী হতেন, যথাযোগ্য নির্দেশ উপদেশাদি দানে। দক্ষিণেশ্বরের তুল্য তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল শ্যামপুকুর বাড়িতেও। আর তা অতি সঙ্কটজনক পীড়ার মধ্যেই।

শরীরের এই বিপর্যস্ত অবস্থাতেও শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে গান গেয়েছেন। শ্যামপুকুরে তিনমাসাধিক অবস্থানের মাঝামাঝি সময়ে। কাশীপুরের বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত

হবার মাস দেড়েক আগে। 'কথামৃত' অনুসারে তার প্রাসঙ্গিক বিবরণ উদ্ধৃত করা হলো :—

'আজ বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ শ্যামপুকুরস্থিত একটি দ্বিতল গৃহ মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের দুতলা ঘরের মধ্যে শয্যা রচনা হইয়াছে, তাহাতে উপবিষ্ট।··· ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ছয় সাত ঘণ্টা কাটাইয়া থাকেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে সাতিশয় ভক্তি করেন ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন। রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে। বাহিরে জ্যোৎস্না···'

প্রথমে ঈশানকে ঠাকুর নিম্নলিখিত প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। পরে ডাক্তার মহেন্দ্রলালও যোগ দিয়েছেন আলোচনায়। নির্লিপ্ত সংসারী, নির্লিপ্ত হবার উপায়, সংসার আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান, জ্ঞানের পর কর্ম, ইত্যাদি বিষয়ে বুঝিয়ে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তারপর, যুগ-ধর্ম কথা প্রসঙ্গে—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, কাঁচা আমি ও পাকা আমি, ভক্তের আমি, বালকের আমি, ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়, বিচার পথ ও আনন্দ পথ, ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান প্রভৃতি বহুপ্রকার আলোচনা, কথোপকথনের পর—বললেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—যখন পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে পড়ে মাকে ডাকতুম, আমি মাকে বলেছিলাম, 'মা! আমায় দেখিয়ে দাও কর্মীরা কর্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে। আরও কত কি তা কি বলবো!

'আহা কি অবস্থাই গেছে! ঘুম যায়!

এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন—

ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি।
এখন যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।'···

(প্রথম ভাগ, পৃঃ ২০৮-২১১)।

গানখানি রামপ্রসাদের রচনা এবং পঙ্‌ক্তি দুটি তার প্রথমাংশ নয়। বক্তব্য প্রসঙ্গে অর্থাৎ ঘুমের কথায় বৃহত্তর তাৎপর্যপূর্ণ নিদ্রার উপমা ঠাকুর প্রয়োগ করলেন প্রিয় রচনাকার রামপ্রসাদের জবানীতে।

সুরহীন শুধুমাত্র কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব প্রকাশে, ঈশ্বরীতে প্রসঙ্গে তৃপ্ত হন না। তাঁর অন্তরাত্মা স্ফূর্তিলাভ করে উপযুক্ত সঙ্গীত সহযোগে। কণ্ঠব্যাধির ওই স্তরেও তাই তাঁর পক্ষে গান সম্ভব।

তাঁর শারীরিক অবস্থা তখন যে কি নৈরাশ্যকর তা মাত্র চারদিন পরের প্রতিবেদনে শ্রীম. জানিয়েছেন :—

'২৬ অক্টোবর, ১৮৮৫···কয়েকদিন হইল শারদীয়া দুর্গাপূজা হইয়া গিয়াছে। এ

মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী হর্ষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন। কেননা তিনমাস ধরিয়া গুরুর কঠিন পীড়া কণ্ঠদেশে—ক্যান্সার। সরকার ইত্যাদি ডাক্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য। হতভাগ্য শিষ্যেরা একথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন। এক্ষণে এই শ্যামপুকুর বাটীতে আছেন। শিষ্যেরা প্রাণপণে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিতেছে।…এত পীড়া কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন করিতে কাছে আসিতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয়। অহেতুক কৃপাসিন্ধু…সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেছেন, কিসে তাহাদের মঙ্গল হয়। শেষে ডাক্তারেরা বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার কথা কহিতে একেবারে নিষেধ করিলেন।…' (প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৩৩-২৩৪)।

তারপরেও তাঁর দেহ ছিল প্রায় দশ মাস। তার মধ্যে শেষের আটমাস পাঁচদিন, কাশীপুরে। সেই পর্বেও তিনি গান গেয়েছিলেন, শরীর ত্যাগের কয়েকদিন মাত্র আগে। কাশীপুর বাগানবাড়িতেই সেই তাঁর শেষ গান, এ যাবত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।

শ্যামপুকুরে তিনমাসেও তাঁর কোনো উপকার না দেখে, শিষ্য সেবকরা উপায়ান্তর চিন্তা করলেন। স্থির হলো, কলকাতার দূষিত বায়ু ছেড়ে, শহরের উপান্তে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করা বিধেয়। মুক্ত বাতাস সেবিত কোনো বাগানবাডিতে অবস্থানই এ অবস্থায় প্রশস্ত। অনুসন্ধানে চমৎকার আবাসস্থল পাওয়া গেল কাশীপুরে, মতি-ঝিলের উত্তরে। রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালচন্দ্র ঘোষের বাগানবাডি। ১৪ বিঘা জায়গায় প্রাচীর ঘেরা বাগান, পুকুর, গাছ-গাছালির মধ্যে দোতলা বাডি। ৯০ সংখ্যক কাশীপুর রোড। মাসিক ভাড়া ৮০ টাকা। একান্ত গৃহী-ভক্ত, 'চার রসদ্দারে'র অন্যতম, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ব্যয়ভার বহন করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে অবস্থান করতে এলেন ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫। গৃহ পরিবেশ দর্শনে আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবর্তনে কাশীপুর পর্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, নরেন্দ্রের সন্ন্যাস-জীবন গঠন করে তাঁর প্রতি তরুণ শিষ্যদের দায়িত্ব অর্পণ, এগারজন চিহ্নিত শিষ্যকে গৈরিক দান প্রভৃতি তাঁর কার্যাবলী এই গৃহে প্রকাশ পায়। কিন্তু এখানে বিশেষ বক্তব্য শ্রীমা সারদাদেবীর প্রসঙ্গ। কারণ তাঁরই উদ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ গেয়েছিলেন শেষ গান-খানি।

নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ উত্তরসাধককে যেমন ঠাকুর সচেতনভাবে প্রস্তুত করে দেন, তেমনি শ্রীমাকেও।

সারদাদেবীর সাধন গঠনে, দিব্য রূপায়ণে এবং গুরু-রূপিণী মাতৃশক্তির উজ্জীবনে

শ্রীরামকৃষ্ণের সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁর দেবীত্বের উল্লেখ করে তা জাগরিত করতেন তিনি। বলতেন, 'ও হচ্চে সারদা, জ্ঞানদায়িনী। মানুষকে জ্ঞান দিতে এসেছে। ও আমার শক্তি।'

অন্তরঙ্গ শিষ্য সেবক ভক্তদের চিত্তে মাতৃরূপিণী, জ্ঞানদায়িনী সারদাদেবীর স্বরূপ তিনি পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ কাশীপুরে অবস্থানের অন্তিম পর্যায়ে। শ্রীমাকে দেবী ষোড়শী পূজাদি করে এবং আরো নানাভাবে শিষ্যদের নিকটে তাঁর ব্যক্তি-সত্তাকে মহিমাপূর্ণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই সঙ্গে সারদামণিকে ক্রিয়াংশেও নির্দেশাদি দিতেন, মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ বিধি সহযোগে। প্রায় অবরুদ্ধ-কণ্ঠ সে সময় তিনি। তাই কুলকুণ্ডলিনী, ষঠ্ চক্র প্রভৃতি কাগজে অঙ্কন করে বুঝিয়ে দেন শ্রীমাকে।

পরবর্তীকালে যিনি সঙ্ঘের প্রেরণাদাত্রী জননীর ভূমিকা পালন করবেন, শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর আশ্রয়-স্বরূপিণী হবেন বৃহত্তর জনসমাজেও, তাঁর ঐশী সত্তার উদ্‌বোধনে চেষ্টিত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মহা সমাধির (১৬ই অগস্ট, ১৮৮৬) কয়েকদিন মাত্র আগে পর্যন্ত এ বিষয়ে তাঁর জাগ্রত লক্ষ্য থাকে। ঠাকুরের শেষ গানখানিও তার দিক্-দর্শনী স্বরূপ।

এখন সেই সঙ্গীতটির প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করা হলো :—

'আর একদিনের কথা। ঠাকুরের জন্য রোগপথ্য প্রস্তুত করে খাবারের বাটিটি হাতে নিয়ে সারদামণি এসেছেন তাঁর শয্যার পাশে। ঠাকুর তখন ভাবের ঘোরে রয়েছেন, কোন্ সুদূর ভাবলোকের মহাকাশে মন তাঁর উধাও হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ সে ভাবাবস্থা টুটে গেল, মার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বেদনার্ত হৃদয়ে বললেন, 'ত্থাখো, কলকাতায় লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিল্‌বিল্ করছে। তুমি তাদের একটু দেখো।'

বিস্ময় ও অনুযোগে ভরা স্বরে সারদাদেবী উত্তর দিলেন, 'আমি মেয়েমানুষ। আমার পক্ষে তা কি করে সম্ভব ? এ তুমি কি বল্‌ছো ?'

নিজের দেহটি দেখিয়ে রামকৃষ্ণ সংক্ষেপে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উত্তর দিলেন, 'এ আর কি করেছে ? তোমায় এর চাইতে অনেক বেশি করতে হবে।'

রোগক্লিষ্ট শরীরে এসব আলোচনা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠা রামকৃষ্ণের পক্ষে বিপজ্জনক।

সারদামণি তাই তাডাতাড়ি এ প্রসঙ্গ চাপা দিলেন। জোরের সঙ্গে বললেন, 'সে যখন হবে, তখন হবে। তুমি এখন পথ্যিটা খেয়ে নাও তো।'

ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই মনোভাব এবং সারদামণির উপর ঈশ্বরীয় কর্মের এই দায়িত্ব অর্পণ নূতন নয়। ইতিপূর্বে কয়েকবার একথাটি পত্নীর অন্তরে গেঁথে দেবার চেষ্টা

তিনি করেছেন। এই কথাবার্তার সময় রামকৃষ্ণ স্মিতহাস্যে সুর করে গাইতেন:

এসে পড়েছি যে দায় সে দায় বল্‌বো কায়।

যার দায় সে আপন জানে, পর কি জানে পরের দায়॥

গানের কলি শেষ হতে না হতেই জোর দিয়ে ঠাকুর বলতেন, 'ওগো, শুধু কি আমারই দায়? তোমারও যে দায়।'

(ভারতের সাধিকা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩-১৩৪)।

এখানে গানটির প্রথম কলিটি মাত্র আছে। তার পরবর্তী পঙ্‌ক্তি কয়টিও পাওয়া যায় অন্যত্র। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি,—কমলকৃষ্ণ মিত্র।) তা হলো—

হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি।

ভয়ে মরি লাজে মরি, নারী হওয়া একি দায়॥

গানখানি নিতান্ত অপ্রচলিত। সেকালের কোনো সঙ্গীতাসরেও গাইবার উল্লেখ পাওয়া যায় নি। সঙ্গীত-সংকলন গ্রন্থাদিতেও সন্ধান মেলা কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে কোন্ সূত্রে এটি সংগ্রহ করেছিলেন, তা অজ্ঞাত। এত অচলিত গানও তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, এও এক আশ্চর্য।

'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি' পুস্তকে গানটির প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ঈষৎ পাঠান্তর আছে, 'এসে ঠেকেছি যে দায়' ইত্যাদি।

ঐ গ্রন্থেই গানখানি শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া সম্পর্কে রামলালের একটি উক্তি আছে, যা স্মরণযোগ্য।

রামলাল বলেন, 'ঠাকুর এই গানটি খুব চড়া করে ধরতেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীত-কণ্ঠ যে তার সপ্তকে বিচরণক্ষম ছিল, প্রত্যক্ষদর্শী রামলালের সাক্ষ্যে তা সুপ্রকাশ।

উল্লিখিত গানখানি ঠাকুরের শেষ সঙ্গীত রূপে স্মরণ রাখবার যোগ্য। তাঁর কল-গীতি-কণ্ঠ স্তব্ধ হবার আগে আর কোনো সঙ্গীতের কথা জানা যায় নি।

নবম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক গীত গানের তালিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ কত গান গেয়েছিলেন, তার সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা পূর্ববর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে করা হয়েছিল। সেই হিসাবে পাওয়া যায় যে, অন্তত ১৮১টি গান গাইতেন তিনি। দক্ষিণেশ্বরে, ভক্তজন গৃহে এবং অন্যত্র তিনি যত গান শুনিয়েছিলেন, বিভিন্ন গ্রন্থের সূত্রে তাদের মোট উক্ত সংখ্যা জানা যায়। আরো গান তাঁর জ্ঞাত থাকা যে সম্ভব, সে আলোচনাও ছিল চতুর্থ অধ্যায়ে।

এখানে, প্রথম পঙ্‌ক্তি সহযোগে গানগুলির তালিকা প্রস্তুত করে দেওয়া হলো। গীতাবলী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল না স্থানাভাবে। অবশ্য তাঁর অনেকগুলি গান বিভিন্ন অধ্যায়ে পূর্ণত প্রকাশ পেয়েছে। নানা বিশিষ্ট সঙ্গীতের রচয়িতাদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে যথাস্থানে, প্রাসঙ্গিকভাবে। সেজন্যে বর্তমান অধ্যায়ের তালিকায় পুনরায় রচনাকারদের নাম লিপিবদ্ধ হলো না।

এই তালিকা প্রস্তুত হয়েছে প্রধানত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থাবলী, 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ', 'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি', 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিকথা' (হরিহর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত), 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা', 'প্রেমানন্দের পত্রাবলী', 'শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান', প্রভৃতি পুস্তকের সূত্রে। স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতিকথা', কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'আত্মচরিত', 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা ইত্যাদির সাহায্যেও কোনো কোনো গানের কথা জানা গেছে।

বর্ণানুক্রমিক ভাবে তাঁর সমস্ত গীতাবলীকে একটি মাত্র তালিকা-ভুক্ত করা হলো না একটি কারণে। অনেকগুলি গান ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় ছিল। একাধিকবার তিনি গেয়েছেন সেই সব গান। সেগুলিকে প্রথম লিপিবদ্ধ করা হলো, যতবার গেয়েছেন সেই অনুসারে। এমন গানের সংখ্যা ৫০টি। তাদের প্রথমে স্থান দেওয়া হলো। যেমন—এই তালিকার প্রথম দুটি গান ('যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝুরে' এবং 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়') শ্রীরামকৃষ্ণ গেয়েছেন আটদিন বা আটবার। তৃতীয় গানটি অর্থাৎ 'ডুব, ডুব ডুব, রূপসাগরে আমার মন' তাঁর সাতবার বা সাত-দিনে গাইবার কথা জানা গেছে। 'মজলো আমার মন ভ্রমরা' গানখানি গেয়েছেন ছ'বার। এমনিভাবে, 'কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন', 'আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে মা', 'শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুঁড়িখান উড়িতেছিল' ও 'এবার

আমি ভালো ভেবেছি' তাঁর পাঁচদিন গাইবার কথা জানা যায়। চারবার বা চারদিন গেয়েছিলেন—'গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পরম দয়াল হে প্রভু', 'শ্যামাধন কি সবাই পায়', 'আমি ওই খেদে খেদ করি (শ্যামা)', 'অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি', 'গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরনা', 'হলাম যার জন্যে পাগল', 'শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দ মগনা', 'আমার অঙ্গ কেন গৌর হলো।' তাঁর তিনদিন গাইবার কথা জানা গেছে এই গান কথানি—'সুরাপান করিনা আমি সুধা খাই জয় কালী বলে', 'আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাকো কারু ঘরে', 'আয় মন বেড়াতে যাবি কালী কল্পতরু মূলে চার ফল কুড়ায়ে পাবি', 'আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই', 'গৌর চাহে বৃন্দাবন পানে আর ধারা বহে দু নয়নে', 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে', 'যশোদা নাচাতো শ্যামা বলে নীলমণি', 'কথা বলতে ডরাই না বলতেও ডরাই।' বাকি গানগুলি দুবার গেয়েছেন বলে প্রকাশ। প্রথম ৫০টি গান এই ক্রম অনুসারে তালিকা-বদ্ধ করা হয়েছে।
তারপর ৫১ সংখ্যক থেকে ১৮১ পর্যন্ত যে ১৩১টি গান, শ্রীরামকৃষ্ণের একবার গাইবাব উল্লেখ পাওয়া গেছে সেই গীতাবলী।
এই হিসাবে বর্তমান তালিকার দুটি বিভাগ দ্রষ্টব্য। প্রথমত শ্রীরামকৃষ্ণ যে গীতাবলী একাধিকবার গেয়েছেন :—

(১) যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝুরে তারা তারা দুভাই এসেছে রে
(২) গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়
(৩) ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন
(৪) মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে
(৫) কে জানে কালী কেমন ষড়দর্শনে না পায় দরশন
(৬) আমি দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি
(৭) শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুঁড়িখান উড়িতেছিল
(৮) এবার আমি ভাল ভেবেছি, ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি
(৯) গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পরম দয়াল হে প্রভু
(১০) অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
(১১) শ্যামাধন কি সবাই পায়
(১২) আমি ওই খেদে খেদ করি (শ্যামা)
(১৩) গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোর না
(১৪) শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দ মগনা
(১৫) হলাম যার জন্তে পাগল

(১৬) আমার অঙ্গ কেন গৌর হল

(১৭) গৌর চাহে বৃন্দাবন পানে আর ধারা বহে দু নয়নে

(১৮) সুরা পান করিনা আমি সুধা খাই জয় কালী বলে

(১৯) আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাকো কারু ঘরে

(২০) আমি মুক্তি দিতে কাতর নই শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই

(২১) আয় মন বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতরু মূলে রে মন

(২২' যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে

(২৩) যশোদা নাচতো শ্যামা বলে নীলমণি

(২৪) কথা বল্‌তে ভরাই না বলতেও ভরাই পাছে হারাই হারাই

(২৫) কখন্ কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা

(২৬) এবার কালী তোমায় খাব

(২৭) বল রে বল শ্রীদুর্গানাম (ওরে আমার মন রে)

(২৮) এ কি বিকার শঙ্করী, কৃপা চরণ-তরী

(২৯) মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল

(৩০) নদে টল্‌মল্ টল্‌মল্ করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে

(৩১) সদানন্দময়ী কালী (মহাকালের মনোমোহিনী)

(৩২) পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী

(৩৩) ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়

(৩৪) ভাবিলে ভাবের উদয় হয়

(৩৫) শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই

(৩৬) শ্যামা মা কি কল করেছে কালী মা কি কল করেছে

(৩৭) তার তারিণী এবার ত্বরিত করিয়ে

(৩৮) আর ভুলালে ভুল্‌ব না মা দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ

(৩৯) দরবেশ দাঁড়ারে, সাধের করওয়া কিস্তিধারী

(৪০) মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে

(৪১) মা কি আমার কালো রে

(৪২) শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুঁড়ি ভব সংসার আকাশ মাঝে

(৪৩) এই সংসারই মজার কুটি আমি খাই দাই আর মজা লুটি

(৪৪) সেদিন কবে বা হবে

(৪৫) মন রে কৃষি কাজ জান না

(৪৬) এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে

(৪৭) ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে
(৪৮) এসব ক্ষ্যাপা মেয়ের খেলা
(৪৯) সহজ মানুষ না হলে সহজকে যায় না চেনা
(৫০) ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী

শ্রীরামকৃষ্ণের একবার গাওয়া গান :—

(১) মা কি এমনি মায়ের মেয়ে
(২) মা কি শুধুই শিবের সতী
(৩) কালী কে জানে তোমায় মা
(৪) এসেছেন এক ভাবের ফকির
(৫) সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
(৬) ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে
(৭) চিন্ময় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন
(৮) আমার কি ফলের অভাব
(৯) বাঁশি বাজিল ওই বিপিনে
(১০) আমায় দে মা পাগল করে
(১১) রাই বলিলে বলিতে পারে
(১২) সখি সে বন কত দূর
(১৩) ভবদারা ভয়হারা নাম শুনেছি তোমার
(১৪) তারিতে হবে মা তারা হয়েছি শরণাগত
(১৫) ভবে আশা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম
(১৬) প্রেমধন বিলায় গোরা রায়
(১৭) কৌপীন দাও কাঙাল বেশে ব্রজে যাই হে ভারতী
(১৮) গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়
(১৯) দেখ'সে আয় গৌরবরণ রূপখানি (গো সজনী)
(২০) ভুবনরঞ্জন রূপ নদে গৌর কে আনিল রে
(২১) মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা
(২২) তোদের খ্যাপার হাট বাজার মা (তারা)
(২৩) গিরি ! গণেশ আমার শুভঙ্করী
(২৪) দেখে এলাম এক নবীন রাখাল
(২৫) আমার মা ত্বং হি তারা
(২৬) গোলেমালে মাল রয়েছে, গোল ছেড়ে মাল বেছে নাও

(২৭) মন চলে যাই, আর কাজ নাই, তারার ও তালুকে রে
(২৮) মায়ে পোয়ে ছুটো মনের কথা কই
(২৯) শমন আসবার পথ ঘুচেছে, আমার মনের সন্দ গেছে
(৩০) ভাব হবে বৈকি রে (ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের)
(৩১) ভাব কি ভেবে পরাণ গেল
(৩২) পাড়ার লোকে গোল করে মা
(৩৩) শ্যামা তুমি পরাণের পরাণ
(৩৪) ঘরে যাবই না গো ! (সঙ্গিনীয়া) যে ঘরে কৃষ্ণনামটি করা দায়
(৩৫) সেদিন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে
(৩৬) হরিনাম নিস রে জীব যদি সুখে থাকবি
(৩৭) ধরো না ধরো না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে
(৩৮) চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে
(৩৯) ডুব দে রে মন কালী বলে
(৪০) দোষ কারু নয় গো মা আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা
(৪১) জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে
(৪২) মা তুমিই ব্রজের কাত্যায়নী
(৪৩) শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার
(৪৪) জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার প্রাণ যায়
(৪৫) হরিবে লাগি লহ রে ভাই
(৪৬) তাই তোমাকে শুধাই কালী
(৪৭) যে ভাব লাগি পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে
(৪৮) আমার গৌর নাচে
(৪৯) উড়িষ্যা জগন্নাথ ভজ বিরাজ জী
(৫০) মা আমি কি আটাশে ছেলে
(৫১) আমার গৌর রতন
(৫২) কে হরিবোল্ হরিবোল্ বলিয়ে যায়
(৫৩) অমূল্যধন পাবি রে মন হলে খাঁটি
(৫৪) বাঁচলাম সখি শুনি কৃষ্ণনাম
(৫৫) নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার
(৫৬) আমার গোরার সঙ্গী হয়েও ভাব বুঝতে নারলুম রে
(৫৭) কহে শিখরী, জামাই নাই ভিখারী

(৫৮) আমায় জাতি গিয়েছে, ছুঁয়োনা রে শমন
(৫৯) বড় বিপদ হল ওমা ব্রহ্মময়ী
(৬০) শিবের তুল্য জামাই আছে কার
(৬১) যখন যে রূপে কালী রাখিবে আমারে
(৬২) মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর কে আচারে
(৬৩) কবে সমাধি হব শ্যামা চরণে
(৬৪) যিনি মহারাজা বিশ্ব যার প্রজা
(৬৫) কে জানে তোমার মায়া ওহে শ্রীহরি
(৬৬) এই বিশ্ব মাঝে যেখানে যা সাজে
(৬৭) আমি আর ধন চাইনে, কেবল চরণের ভিখারী হে
(৬৮) বিফলে দিন যায় রে বীণে শ্রীহরির চরণ বিনে
(৬৯) জীবন-বল্লভ তুমি (হরি) হে দীন-শরণ
(৭০) ও হাটে বিকোয় না সুতো, বিকোয় নন্দরাণীর সুত
(৭১) কার ভাবে গৌর বেশে মজালে হে প্রাণ
(৭২) কে কানাই নাম ঘুচাল তোর (ওহে ব্রজের মাখন চোর)
(৭৩) যার দুঃখ সেই জানে, পর কি জানে পরের দায়
(৭৪) এসে ঠেকেছি যে দায় সে দায় কব কায়
(৭৫) রাধে গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ বল শ্রীরাধে গোবিন্দ বল
(৭৬) প্রেমের লোকের স্বভাব স্বতন্ত্র
(৭৭) কেন মা তোর পাগলীর বেশ
(৭৮) ক্ষেপার হাট বাজার মা তোদের, ক্ষেপার হাট বাজার
(৭৯) মেরা রাম্‌কো না চিনা হ্যায়, দেল্‌, চিনা হ্যায় তুম্‌ ক্যারে
(৮০) সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরায়ী
(৮১) রাম ভজা সেই জিয়া রে জগ মে
(৮২) মেরা রাম বিনা কোই নাহি রে তারণওয়ালা
(৮৩) মন বেচারির কি দোষ আছে
(৮৪) সেবা বন্দি আওর অধীন্‌তা
(৮৫) কেন নদে ছেড়ে সোনার গৌর দণ্ডধারী হবি
(৮৬) ওমা কাঁদছে কে তোর ধন বিহনে
(৮৭) আজ ফাগ রণে, দেখি তুমি হারো কি আমি হারি
(৮৮) আমার ভূষণের কি বাকি আছে রে

(৮৯) জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী, তুমি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী
(৯০) সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে
(৯১) আর কি সাজাবি আমায়
(৯২) দিল্ রামকো নাহি জানা হৈ
(৯৩) বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের
(৯৪) কে রঙ্গে নাচিছে বামা তিমিরবরণী
(৯৫) সুন্দর তোমারি নাম দীনশরণ হে
(৯৬) কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল্‌না তাই
(৯৭) কেশব কুরু করুণা দীনে
(৯৮) এস মা এস মা ও হৃদয়-রমা
(৯৯) আমার কাজ কি মা সামান্য ধনে
(১০০) কত ভালবাস গো মানব সন্তানে
(১০১) কোন্ হিসাবে হর হৃদে দাঁড়িয়েছ মা
(১০২) রাধার দশম দশা হেরে ব্যাকুল অন্তরে
(১০৩) মন কোরনা কাজে হেলা
(১০৪) দে দে দে আমায় মাধব দে
(১০৫) চল যাই ভার লয়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজা হবে
(১০৬) আমার ভক্তি যেবা পায়, সে যে সেবা পায়
(১০৭) এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে
(১০৮) দে দে দে বাঁশি দে
(১০৯) হে নাথ তুমি সর্বস্ব আমার
(১১০) হৃদি-বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি
(১১১) সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদয় মন্দিরে
(১১২) গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়
(১১৩) আনন্দ বদনে বল মধুর ব্রহ্ম নাম
(১১৪) নাচিছে রণরঙ্গিণী নব জলধর বরণী
(১১৫) তুমি দয়াময় পতিতপাবন
(১১৬) ও মন কালী বল না দিন রবে না
(১১৭) সুরগণ শরণাপন্ন শুন গো মা শম্ভুদারা
(১১৮) এখন যা কর হে ভগবান
(১১৯) একি অপরূপ ওহে বিশ্বরূপ এমন রূপ নাই ত্রিজগতে

(১২০) আমি আছি মা তারিণী ঋণী তব পায়

(১২১) গা তোল গা তোল উমা, মঙ্গল আরতি করি

(১২২) ও যার মায়ের বাস রে শ্মশানে

(১২৩) সুখের বাসনা কর আর কদিন

(১২৪) দুর্গা নাম জপ সদা রসনা আমার

(১২৫) শঙ্কর উরে কে বিহরে বামা রঙ্গিণী

(১২৬) কেন এমন বেশে দয়াময়

(১২৭) শুনেছি সেই তারকব্রহ্ম মানুষ নয় রাম জটাধারী

(১২৮) কালো বেড়াল কে পুষেছে পাড়াতে, আমায় ধরে দে গো ললিতে

(১২৯) রণে নেমেছে রে কার বামা ও কে ও

(১৩০) রাই বলিলে বলিতে পারে

(১৩১) জয় শচীনন্দন গৌর গুণাকর

দশম অধ্যায়

সঙ্গীতের ভাবুক শ্রীরামকৃষ্ণ

'রামপ্রসাদ গানে সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়।'

প্রিয় গীত রচনাকার রামপ্রসাদের গানের কথায়, সঙ্গীত সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের এই এক চূড়ান্ত মন্তব্য। গান-ক্রিয়াকে এমন গভীর ভাবে অনুধাবন করতে, এমন মর্যাদা দিতে কজন সিদ্ধ কিংবা ব্যবসায়ী সঙ্গীতজ্ঞ পারেন? সঙ্গীত যাঁদের জীবনের একান্ত অবলম্বন তাঁরাও কি তাকে এত উচ্চে স্থান দিতে সক্ষম?

শ্রীঠাকুর বার বার বলেছেন এবং স্বীয় লোকোত্তর জীবনের দৃষ্টান্তে প্রদর্শন করেছেন যে, ঈশ্বরলাভই মানব জন্মের পরম লক্ষ্য। ভগবানকে জানা-ই জীবনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। যাঁর ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার ঘটেছে, তিনিই পূর্ণজ্ঞানী।

সুতরাং 'ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়' এই উক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতকে চরম গৌরব দান করেছেন। তিনি স্বয়ং যে তন্ময়-চিত্তে আকুল প্রাণে গান গাইতেন তার তাৎপর্যও এ প্রসঙ্গে অনুধাবনীয়। সেই সঙ্গে, উক্ত অভিমতে, সিদ্ধ গায়ন গুণীকে শ্রেষ্ঠ সাধকদের সমগোত্রে আসন দিয়েছেন তিনি।

পরম ব্রহ্ম রস-স্বরূপ। সর্ব রসের মূল উৎস। তাঁকে অবগত হলে, তাঁর দর্শন লাভ করলে সাধন-সিদ্ধ হন যোগীরা, তপস্বীরা, সাধকরা। যথার্থ সঙ্গীত শিল্পীকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের তুল্য সম্মানে ভূষিত করেছেন। অন্যত্রও তিনি তাঁর প্রিয় গীত-রচয়িতাকে 'সিদ্ধ' বলেছেন, 'রামপ্রসাদ গানে সিদ্ধ, তাই তাঁর গান ভাল লাগে।'

তৌর্যত্রিক সাধকদের সম্পর্কে তাঁর এমনি ধরনের আরো নানা মন্তব্য বিদ্যমান। যথা —'যদি কেউ গাইতে, বাজাতে, নাচতে কি কোন একটা বিদ্যাতে ভাল হয়, সে যদি চেষ্টা করে, শীঘ্রই ঈশ্বর লাভ করতে পারে।'

একদিন দক্ষিণেশ্বরে রামচন্দ্র দত্ত আনীত এক কলাবন্তের গান শুনে সুপ্রীত শ্রীরামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট বক্তব্যও স্মরণযোগ্য: 'ওস্তাদটি বেশ গাহিয়াছিলেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁকে বলিতেছেন…'যে মানুষে একটি বড় গুণ আছে, যেমন সঙ্গীত বিদ্যা, তাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে বিশেষরূপে।'

সেকালের 'শিক্ষিত সমাজেও 'সঙ্গীতবিদ্যা'কে 'একটি বড় গুণ' বলে অভিহিত করা এক দুর্লভ দৃষ্টান্ত, স্বীকার করতে হয়।

নরেন্দ্রনাথ যে সুনিপুণ গায়ক, সঙ্গীত যন্ত্রের বাদক, এটি তাঁর গুণাবলীর মধ্যে বিশিষ্ট

জ্ঞান করতেন শ্রীঠাকুর। এজন্যে প্রিয় শিষ্যের প্রশংসায় তিনি সানন্দে বলতেন, 'একাধারে নরেন্দ্রের কত গুণ। গাইতে বাজাতে, লেখাপড়ায়।'

অন্য দিনেও তাঁকে বলতে শোনা গেছে, 'দেখো, নরেন্দ্র গাইতে বাজাতে, পড়াশোনায় সব তাতেই ভালো।'

এইভাবে লেখাপড়া বা বিদ্যাচর্চার তুল্য মূল্য দিয়েছেন সঙ্গীতকে।

যেমন সপ্রশংস উল্লেখে তেমনি সঙ্গীতে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টিও প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে কথার মধ্যে, নানা দিনে। যে কোনো প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সাঙ্গীতিক পরিভাষা প্রয়োগ করতেন সাবলীল ভাবে।

যেমন তাঁর সপ্তস্বরের সেই উপাদেয় উপমাটি। সেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরের পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই 'ভক্তের আমি' কি একেবারে যায় না?'

শ্রীরামকৃষ্ণের তাৎক্ষণিক উত্তর, 'ও 'আমি' এক একবার যায়। তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে সমাধিস্থ হয়। আমারও যায়। কিন্তু বরাবর নয়। সা রে গা মা পা ধা নি—কিন্তু 'নি'-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না; আবার নীচের গ্রামে নামতে হয়।'

এখানে 'গ্রাম' অবশ্য স্বর অর্থে ধর্তব্য। আসল কথাটি হলো—সাত স্বরের যোগে গঠিত একটি গ্রামের উচ্চতম স্বর : 'নি'। গায়ক সেই স্বরে বা সুরে অধিককাল স্থিত হতে পারেন না, অবতরণ করতে হয় নিম্নতর স্বরে। তেমনি সাধক বা যোগী সমধিক কাল সমাধি-ভূমিতে অবস্থান করতে অসমর্থ হন।

এমনি সাঙ্গীতিক উপমা তিনি ব্যবহার করতেন কথায় কথায়। উপযুক্ত প্রসঙ্গে অনায়াস পটুত্বে। তার কয়েকটি নিদর্শন এখানে দেওয়া হলো।

সেদিন তীব্র বৈরাগ্যের বিষয়ে ভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ঠাকুর বলছেন, 'সন্ধ্যাদি কত দিন? যত দিন না তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়—তাঁর নাম করতে করতে চক্ষের জল যতদিন না পড়ে—তার শরীর রোমাঞ্চ যতদিন না হয়।...তারপর একটি প্রসাদী গানের কলি গাইলেন—'রামপ্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি'...। আবার বলছেন, 'যখন ফল হয় তখন ফুল ঝরে যায়। যখন ভক্তি হয়, তখন ঈশ্বর লাভ হয় তখন সন্ধ্যাদি কর্ম চলে যায়।' অবশেষে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি ওরকম করে ঢিমে তেতালা বাজালে চলবেনা। তীব্র বৈরাগ্য দরকার। ১৪ মাসে এক বৎসর করলে কি হয়? উঠে পড়ে লাগো। কোমর বাঁধো।'

'ঢিমে তেতালা' অর্থাৎ নিবদ্ধ সঙ্গীতের বিলম্বিত লয়ের তাল বিশেষ। নামেই স্বপ্রকাশ, এটি ঢিমা চাল বা ছন্দের তাল। শ্রীরামকৃষ্ণ সাঙ্গীতিক উপমায় বললেন যে, ধীর লয়ে বা গতিতে নয়, দ্রুত গতিতে বৈরাগ্য আসা চাই। তবেই ঈশ্বর লাভ

হবে।'

তালের উপমানে তিনি বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করেছেন আরো নানা প্রসঙ্গে। যেমন একদিন বলেন নন্দনবাগানে কাশীশ্বর মিত্রের ভবনে, ব্রাহ্ম সম্মিলন উৎসবে। সেদিন নৃত্যের সুসংবদ্ধ তালে পদবিক্ষেপের উপমা শ্রীঠাকুরের: 'যার ঠিক বিশ্বাস—ঈশ্বরই কর্তা আর আমি অকর্তা—তার পাপ কার্য হয় না। যে নাচতে ঠিক শিখেছে তার বেতালে পা পড়েনা।'

এই অনুপম উপমাটির ব্যাখ্যা বাহুল্য।

ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতিতে তালের যে একটি মুখ্য স্থান আছে, তাল ভঙ্গকারী যে অপটু শিল্পী, এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ত্রুটিপূর্ণ মনে করতেন বেতালা হওয়াকে। সঠিক তালের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তাই একদিন নির্ভুল তালের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেন কোনো কোনো ভক্তদের, শ্যামপুকুর বাড়িতে। আবার রসিকতাও করেন 'বেতালসিদ্ধ' অভিধায়:—

'বৈঠকখানা ঘরে ভক্তেরা কেহ কেহ গান গাহিতেছিলেন। ঠাকুর যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন, 'তোমরা গান গাচ্ছিলে, তাল হয় না কেন? কে একজন বেতালসিদ্ধ ছিল—এ তাই।' সকলের হাস্য।'...

(১৮৮৫, অক্টোবর ১৮)

তাঁর অমন প্রিয় গৃহী শিষ্য রামচন্দ্র দত্ত। কিন্তু তিনিও যে তালে কাঁচা ছিলেন, তা লক্ষ্য এবং উল্লেখ করতেও পরাঙ্মুখ হননি ঠাকুর: 'তারপর রাম খোল বাজাবে—আর আমরা নাচবো—রামের তালবোধ নাই।'

ঈশানচন্দ্রের গৃহে আরেকদিন (১৮৮৩, ডিসেম্বর ২৭) ঠাকুর বললেন, মনোহারী ভাষায়—'যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করেছে, যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে কিন্তু পাপ করতে পারে না। সাধা লোকের বেতালে পা পড়ে না। যার সাধা গলা তার সুরেতে সা রে গা মা-ই এসে পড়ে।'

অর্থাৎ যিনি বিধিসম্মত সঙ্গীত-শিক্ষা পেয়েছেন, তিনি নৃত্যকালে সঠিক তালেই পদক্ষেপ করবেন, তাঁর কণ্ঠে সঠিক সার্গমই শোনা যাবে। বেসুরো বেতালা হতে পারেন না তিনি। যিনি সাধন-সিদ্ধ হয়েছেন, ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে পাপ কাজ অসম্ভব।

আরেকভাবেও তিনি সার্গমের উদাহরণ দিয়েছেন—'সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবেন না। সাধারণ লোকে তা পারে না। সা রে গা মা পা ধা নি। নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না।' (১৮৮৪, মার্চ ২৩)

যেমন সহজানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণের গানের উৎসার, তেমনি অবলীলায় সাঙ্গীতিক পরি-

ভাষায় অতি দুরূহ অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা।

'মা আমাকে শুকনো সাধু করিসনি, রসে বশে রাখিস।'

জগজ্জননী তাঁর এই প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। তাই কোনো রস ও ভাবের অভাব ছিল না ঠাকুরের।

শ্রীমা সারদামণির ভাষায় যেমন 'ঠাকুর গানে ভাসতেন', তেমনি সঙ্গীত-বিষয়ক উপমা প্রয়োগ করতেন কথায় কথায়। সঙ্গীতের কত বিষয়েই যে তাঁর অন্তরঙ্গতা, তা বিস্ময়ের বিষয়। গানের, তালের, সুরের, স্বরগ্রামের, এমন কি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উদাহরণ যোগেও একেকটি গূঢ় তত্ত্ব ঠাকুর বুঝিয়ে দিয়েছেন।

একদিন হিন্দু আর ব্রাহ্ম দুয়ের পার্থক্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলো তাঁকে।

সদা সপ্রতিভ, স্পষ্টবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ তখনি উত্তর দিলেন, 'তফাৎ আর কি? একজন শানাইয়ের পোঁ ধরে থাকে আর একজন তারই ভিতর 'রাধা আমার মান করেছে' ইত্যাদি রঙ্‌ পরঙ তুলে নেয়। ব্রাহ্মেরা নিরাকার ভোঁ ধরে বসে আছে। আর হিন্দুরা রঙ্‌ পরঙ্‌ তুলে নিচ্ছে।'

শানাই বাদনের অনুরাগী, অভিনিবিষ্ট, রসগ্রাহী, শ্রোতা শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই শানাই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক এমন চমৎকার উপমাটি দিয়েছেন। মূল শানাইবাদক তো বিপুল বৈচিত্র্যময় রাগরূপ উদ্‌ঘাটিত করছেন সপ্তস্বরায়। তাদের বিভিন্ন বিন্যাসে, ঐশ্বর্যপূর্ণ রাগসঙ্গীতে শ্রোতাদের অন্তর পরিপ্লুত। কিন্তু সেই শিল্পীর সহযোগী বাদক কেবল 'পো' ধরে আছেন অর্থাৎ একটিমাত্র স্থায়ী স্বর নিয়েই রয়েছেন। সেই 'ভোঁ' ধরা যেন ব্রাহ্মদের একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মেব ধারণা করা। আর যে শানাইয়ে বহু বিচিত্র সুরের রাগ রাগিণীর সুরধুনী, তা হিন্দু-ধর্মাশ্রিতদের ভগবানকে নানাভাবে উপাসনার তুল্য। ঠাকুরেরই সেই সুপরিচিত অনুরূপ বাক্যটি এখানে পুনরুল্লেখ করা যায়: 'আমি একঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচরকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোলে, কখনো ঝালে, কখনো অম্বলে, কখনো বা ভাজায়। আমি কখনো পুজো, কখনো জপ, কখনো বা ধ্যান, কখনো বা তাঁর নাম গুণগান করি, কখনো তাঁর নাম করে নাচি।'

আরেকদিন শানাইয়ের কথায় এমনিভাবে তিনি বলেছিলেন ব্রাহ্মনেতা স্বয়ং কেশব-চন্দ্রকেই। দক্ষিণেশ্বরে, ১৮৮১ জানুয়ারি মাসে।

'কালীবাড়ির নহবতে বাজনা শুনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশব প্রভৃতির প্রতি)—দেখলে কেমন সুন্দর বাজনা। একজন কেবল পোঁ করছে, আর একজন নানা সুরের লহরী তুলে কত রাগ-রাগিণীর আলাপ করছে। আমারও ওই ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে শুধু কেন পোঁ করব—কেন শুধু সোহং সোহং করব? আমি সাত ফোকরে নানা রাগ রাগিণী বাজাব। শুধু

ব্রহ্ম ব্রহ্ম কেন করব। শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য মধুর সব ভাবে তাঁকে ডাকব—আনন্দ করব, বিলাস করব।'

কেশব অবাক হইয়া কথাগুলি শুনিতেছেন। আর বলিতেছেন, জ্ঞান ও ভক্তির এরূপ আশ্চর্য, সুন্দর ব্যাখ্যা কখনও শুনি নাই।'

শুধু জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব ব্যাখ্যা নয়। শানাই বাদনের অপরূপ উদাহরণে ঈশ্বর উপাসনার এক উদারতম, সর্বজনবোধ্য উপায়ের কথাও। নিরাকার উপাসনা ও সাকার উপাসনা—যেন সহকারী বাদকের এক স্বরে স্থিতি ও মূল শিল্পীর বাদ্যবিচিত্র্য। তবে কোনোটিই মিথ্যা বা ভুল নয়। সমদর্শী শ্রীরামকৃষ্ণ এমনি প্রাঞ্জলভাবে আরো একবার বুঝিয়েছেন—'আকার নিরাকার দুই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জান? যেমন রসুনচৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে—তাঁর বাঁশির সাত ফোকর সত্ত্বেও। কিন্তু আর একজন দেখ কত রাগ-রাগিণী বাজায়। তেমনি সাকারবাদীরা দেখ ঈশ্বরকে কত ভাবে সম্ভোগ করে। শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য মধুর—নানা ভাবে।'

সঙ্গত যন্ত্রের উপমাতেও ঠাকুর অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ করেছেন। যেমন পাখোয়াজ বাজনা তথা সাধনক্রিয়ার কথা। পাখোয়াজের (বা তবলার) বোল্ আবৃত্তি করা সহজ। কিন্তু সেগুলি যন্ত্রে যথাযথ বাজানো রীতিমত অভ্যাস সাপেক্ষ। তেমনি ধর্ম বিষয়ে মাত্র বক্তৃতা ফলপ্রসূ নয়। প্রয়োজন হলো বিধিসম্মত তপশ্চর্যা। তাই তাঁর আশ্চর্য সরল কিন্তু অকাট্য যুক্তির উপমা: 'পাখোয়াজের বোল্ মুখে বললে কি হবে, হাতে আনা বড়ই কঠিন। শুধু লেকচার দিলে কি হবে; তপস্যা চাই, তবে ধারণা হবে।'

গানের সঙ্গে সঙ্গতের প্রয়োজন কতখানি, সে সম্পর্কে তিনি রীতিমত অবহিত ছিলেন। ধ্রুপদের সঙ্গে যেমন পাখোয়াজ, খেয়ালের সঙ্গে তবলা, তেমনি কীর্তনের সঙ্গে খোল্ বাদন—সঙ্গীতক্রিয়াকে সম্পূর্ণাঙ্গ, রসসমৃদ্ধ, সার্থক করে। তাই একদিন কীর্তন গানের সঙ্গে খোল্বাদক বা 'খুলি' না থাকায় মন্তব্য করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্র, শ্রীম. প্রমুখের কীর্তন ও সঙ্গে তাঁর নিজের নৃত্য প্রসঙ্গে—'গান হইয়া গেলে ঠাকুর মাস্টারকে সহাস্যে বলিতেছেন, 'বেশ খুলি হতো, তাহলে আরো জমাট হতো। তাক তাক তা ধিনা, দাক দাক দা ধিনা এই সব বোল্ বাজাবে।'

ভাব-প্রধান তথা বাণী-নির্ভর গান যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়, তেমনি কথা-বর্জিত বিশুদ্ধ সঙ্গীতেরও তিনি গুণগ্রাহী শ্রোতা। যেমন, একদিন দক্ষিণেশ্বরে আগত কোন্নগরের গায়কের কালোয়াতী গান ও আলাপ শুনিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন।...গায়ক রাগ-রাগিণী আলাপ করিয়া গাহিতেছেন...শ্রীরামকৃষ্ণ (আলাপ শুনিয়া)—বাবু এতেও আনন্দ হয় বাবু।'

তেমনি বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রসঙ্গীত অর্থাৎ নিছক সঙ্গীতেরও রসগ্রাহিতা তাঁর ছিল।

বারাণসীতে বীণকার মহেশচন্দ্র সরকারের বাজনার আসরে পাওয়া গেছে তার এক পরিচয়। আবার একদিন উত্তর কলকাতায়, গণুর মার বাড়িতে বেহালা ইত্যাদি শুনেও ঠাকুর পুলকিত হয়েছেন। সেদিন তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে তাঁর প্রীতির জন্যে একদলের ঐকতান বাদন ও গানের ব্যবস্থা করা হয়। তার বিবরণ দিয়েছেন শ্রীম.। ছেলেদের গীতবাদ্য শোনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'আহা কি গান। কেমন বেহালা। কেমন বাজনা।'

'এইবার কেবল কনসার্ট বাজনা হইতে লাগিল। বাজনার পর ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন—বা! কি চমৎকার।'…

'একটি ছোকরাকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, এঁর সব (রকম বাজনা) জানা আছে।'

অর্থাৎ সেই সব্যসাচী বাদককে এজন্যে প্রশংসা করছেন ঠাকুর, তাঁর গুণ হিসেবে। গানের নানা ধরন ধারণ সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন, বোঝা যায়। টপ্পা যে বিষয়বস্তুতে প্রণয় সঙ্গীত, তরল ভাবের আকর্ষণে যে সচরাচর তা গাওয়া হয়ে থাকে, তাও জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সাজ-সজ্জার বাহার সম্বন্ধে সতর্ক করে তাই তিনি একদিন বলেন, 'খুব সাবধানে থাকতে হয়, এমন কি কাপড-চোপডেও অহংকার হয়। পিলে রোগী দেখিছি কালাপেড়ে কাপড় পরেছে, অমনি নিধুবাবুর টপ্পা গাইছে।'

নানা সঙ্গীত-যন্ত্রের বিষয়েও কত যে তিনি জানতেন, ভাবলে আশ্চর্য বোধহয়। গানের সহযোগী তানপুরার তম্বুরাটি আসল এবং সেটি লাউয়ের বহির্ভাগেরই বিশিষ্ট বিশুদ্ধ সংস্করণ। এ বিষয়েও তাঁর ধারণা ছিল। তাই তাঁর মন্তব্য শোনা যায় এ বিষয়ে : 'লাউয়ের খুব ডোল হলে তানপুরা ভালো হয়—বেশ বাজে।'

এমনি বিভিন্ন মন্তব্যাদি থেকে পাওয়া যায় সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সামূহিক পরিচয়। তৌর্যত্রিকে কত প্রকারে স্বভাবজ জ্ঞান, ভাবুকতা, অন্তর্দৃষ্টি, নানা গানের রীতিনীতিতে অবগতি, বিভিন্ন যন্ত্র বাদন অনুষ্ঠানে সানুরাগ আগ্রহ, সুর ও তাল সম্পর্কে সহজ কিন্তু সুষম ধারণা যে তাঁর ছিল। সেই সঙ্গে স্মরণীয়, কণ্ঠ সাধনের উপায় ও সুকণ্ঠের বিশেষত্বাদি বিষয়েও তাঁর ভাষণের কথা মনস্বী নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিবৃতি অনুসারে : 'After the song he gave a luminous exposition how the voice should be trained for singing and the characteristies of a good voice.

সঙ্গীতের কোনো বিভাগেই অনবহিত ছিলেন না পূর্ণজ্ঞানী শ্রীঠাকুর।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম—পঞ্চম ভাগ—শ্রীম.।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ।

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—রামচন্দ্র দত্ত।

৫। শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন।

৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব—শশিভূষণ ঘোষ।

৭। শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ—সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত।

৮। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা—অমৃতলাল বসু।

৯। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিকথা—হরিহর চট্টোপাধ্যায়।

১০। শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ—কমলকৃষ্ণ মিত্র।

১১। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি—কমলকৃষ্ণ মিত্র

১২। সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস—সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩। আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ।

১৪। স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ।

১৫। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী-প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড —মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৬। স্বামী ব্রহ্মানন্দ—উদ্বোধন কার্যালয়।

১৭। বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

১৮। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৯। স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান—

২০। অজাতশত্রু শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান—

২১। শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর পত্রাবলী—উদ্বোধন।

২২। মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ।

২৩। স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ।

২৪। মাস্টার মশায়ের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
২৫। শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়।
২৬। শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
২৭। স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—উদ্বোধন কার্যালয়।
২৮। শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—বিমানবিহারী মজুমদার।
২৯। গিরিশচন্দ্র—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
৩০। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, প্রথম, দ্বিতীয় খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ।
৩১। গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত।
৩২। ভারতের সাধিকা, প্রথম ভাগ—শঙ্করনাথ রায়।
৩৩। শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ।
৩৪। আত্মচরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র।
৩৫। বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীতচর্চা—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।
৩৬। বিষ্ণুপুর ঘরাণা—
৩৭। Reminiscences and Recollections—Nagendro Nath Gupta
৩৮। Chaitanya—Dilip Kumar Mukhopadhyay